ঈশ্বর সন্ধানে ভারত

ঈশ্বর সন্ধানে ভারত

নিগূঢ়ানন্দ

নবপত্র প্রকাশন/কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

- প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৬৩
- প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
  নবপত্র প্রকাশন
  ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০ ০৭৩
- মুদ্রক ঃ গুপ্ত প্রেস
  বেনিয়াটোলা লেন/কলিকাতা-৭০০ ০০৯
- লেজার কম্পোজ ঃ জয়া এন্টারপ্রাইজ ১ ঠাকুরপুকুর রোড
  কলিকাতা-৭০০ ০৬৩
- প্রচ্ছদ ঃ মদন সরকার

ভূমিকা

ঈশ্বর সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসা মানুষের মনে তার চেতনার প্রথম উন্মেষ থেকে। প্রত্যেক ধর্মের অনুসরণকারীরাই দাবি করেন যে, তাঁদের ধর্মপথ ঈশ্বরের প্রকৃত সন্ধান দিয়েছে। এবং একমাত্র তাঁরাই ঈশ্বরের স্বরূপ যথার্থ অনুধাবন করেছেন।

সনাতন ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ। আধ্যাত্মিকতা এদেশের আকাশে-বাতাসে। অসংখ্য সাধুসন্ন্যাসী মঠমন্দিরে ভরা এ-দেশ। এ-দেশের মানুষের বিশ্বাস তাঁদের চাইতে আর কেউ যথার্থভাবে ঈশ্বর-স্বরূপ অনুধাবন করেননি। সেজন্য ধর্মগ্রন্থের এ-দেশে অভাব নেই, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেরও অভাব নেই। এবং অন্যান্য দেশের মতই ঈশ্বর সম্পর্কিত বিশ্বাস অলৌকিকত্বের মধ্যেই বেশী ধরা দিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান-চেতন মানুষ অলৌকিকত্বকে বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা ধরতে পারে না এবং সেই কারণেই ধর্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের মনে বিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়।

কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষে আমাদের মহামনীষীদের মনে ঈশ্বর বা সত্য সম্পর্কিত যে অনুভব, তা কখনও অলৌকিক হেঁয়ালী নয়। বিচার, বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের পথেই তা লোকোত্তর শাশ্বত সত্যের সন্ধান দিয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের অঙ্গুলীহেলন ভারতবর্ষের সেই সত্যানুভূতিকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে।

ভারতবর্ষের ঈশ্বর সাধনা অলৌকিক কিছু নয়। তা এ-লোক থেকেই সাধনা দ্বারা লব্ধ অতিলৌকিক ; বিজ্ঞানসম্মত। ভারত-আত্মার স্বরূপ বুঝতে হলে তাই অলৌকিক গাল-গল্পের পথ এড়িয়ে সঠিক পথে তার স্বরূপ সন্ধান করতে হবে। আমাদের এই বর্তমান গ্রন্থে তাই অলৌকিকের ছড়াছড়ি কিছু নেই। উচ্চকোটী ভারতীয় কবি ও দার্শনিক অনুভূতি যেভাবে সত্যের সন্ধান লাভ করেছিল—আছে তারই বিচার-বিশ্লেষণমূলক আলোচনা। এই আলোচনাতে যেমন বহু বিদগ্ধ লেখকের গ্রন্থ-সাহায্য নেওয়া হয়েছে তেমনই নেওয়া হয়েছে লেখকের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নির্দেশ, কারণ বর্তমান এই গ্রন্থ-লেখকের ধারণা, পরমসত্য যুক্তি-তর্ক-বিজ্ঞানের পথ ধরেই এ-সকলেরও উর্ধে এবং একই সঙ্গে এ-সকল কিছুর মধ্যেও। ভূমিকায় এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন—কারণ লেখকের সেই বিশ্বাস এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে বিরাজমান। লেখকের চিন্তা এবং অনুভব লেখকেরই মত অপরের হৃদয়ে অনুরণন সৃষ্টি করতে পারলে, এই ক্ষুদ্র প্রয়াস তার যথার্থ পুরস্কার লাভ করবে।

নবপত্র প্রকাশিত এই লেখকের

দেবদেবীর উৎস সন্ধানে

আত্মা মৃত্যু স্বর্গ ও নরক

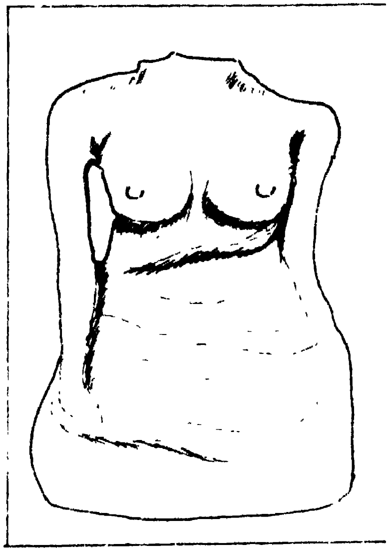
চলমন বৃন্দাবন

The Revealed Mystry of the world Devine

পরলোকগতা জননী
স্নেহলতা সরকারের পুণ্য স্মৃতি
স্মরণে

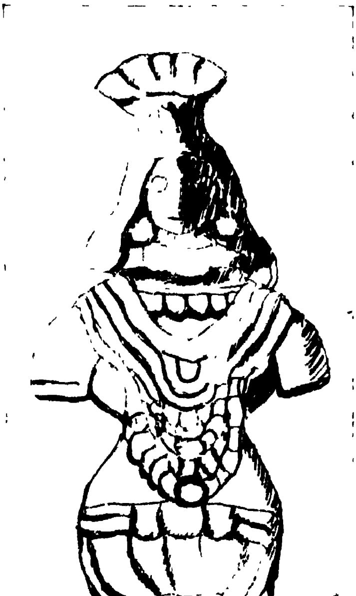


১১



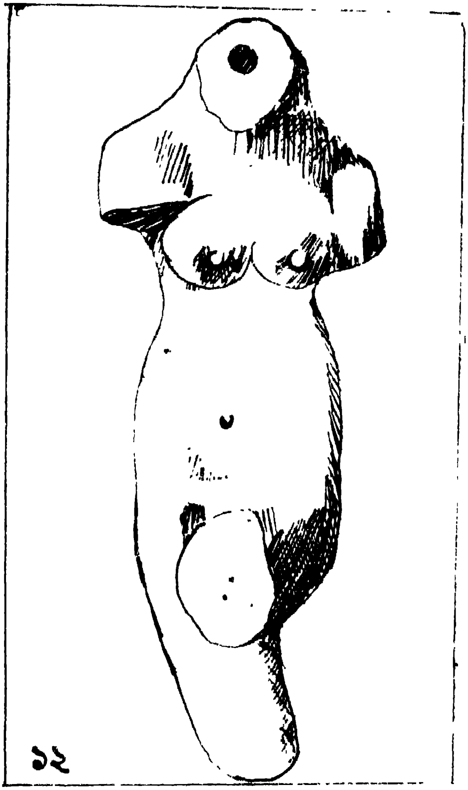
৫

১০ক



২

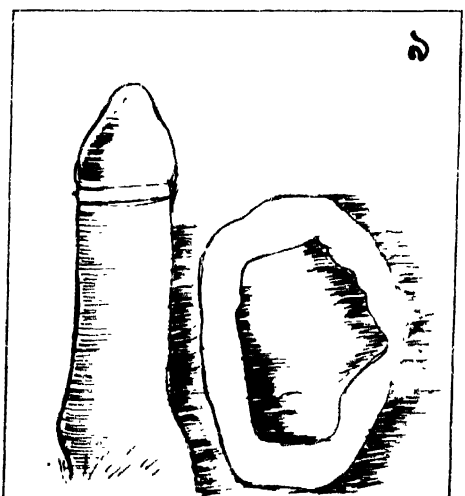




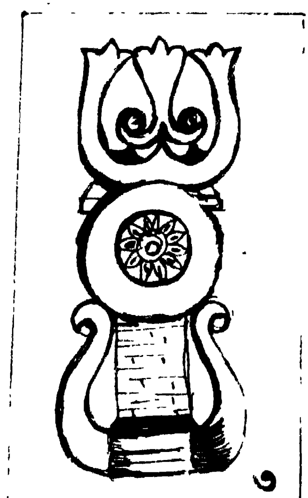
১২



১০ক



৯



৭

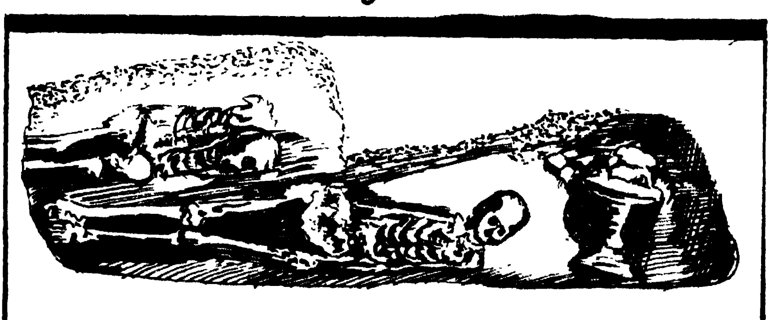


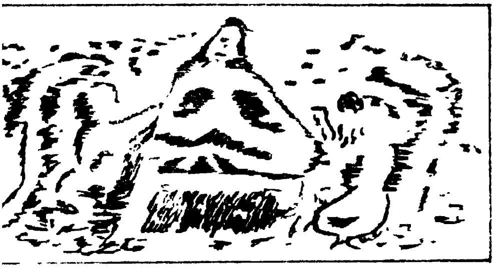
৬

৪-খ



৮



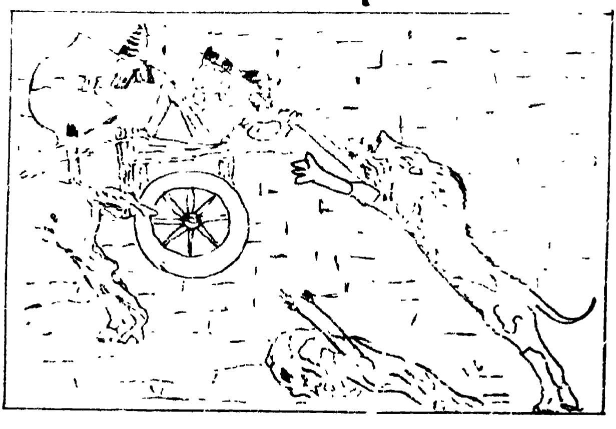


৪ক



৬

৭



ঈশ্বর সন্ধানে অনার্য ভারতঃ হরপ্পা সংস্কৃতি

ধর্ম জিনিসটা কি? যিনি ভাল ব্যাকরণ জানেন, তিনি হয়তো সঙ্গে সঙ্গে শব্দের মূলে চলে গিয়ে এর ব্যাকরণসম্মত ব্যাখ্যা করবেন। হয়তো বলবেন, ধর্ম হচ্ছে তাই যা ধারণ করে রাখে। ধৃ ধাতু...ইত্যাদি। কিন্তু না। আমি সে ধরনের কোন পাণ্ডিত্যের এখানে অবতারণা করতে চাইনি—একদিন নবদ্বীপের নৈয়ায়িকেরা যেমন করতেন। এবং এ-কথা নিশ্চয়ই গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে, ধর্ম বলতে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে যে একটা ব্যাখ্যাতীত অনুরণন জাগে (ঈশ্বরপ্রতিম নানা চিত্রকল্প, দেবদেবীর মূর্তি, রামায়ন-মহাভারত, বেদ-বেদান্ত, উপনিষৎ, কোরাণ, বাইবেল, আত্মা-পরমাত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্মন এই সব আর কি) এবং এই যে অনুরণন যাকে ব্যাখ্যা করে আমরা বোঝাতে পারি না, অথচ গভীরভাবে অনুভব করি, অর্থাৎ এই অনুরণন, যাকে আমরা ধর্ম বলে ভাবি। আমি হলপ করে বলতে পারি—নস্য টানা টিকিধারী কোনো টোলের মহামহোপাধ্যায় ইত্যাদির পক্ষে বার বছর ব্যাকরণ অধ্যায়ন করেও তার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা সম্ভব নয়। বস্তুত আমি বিশ্বাস করি, ধর্ম এমন একটা জিনিস যার শাঁস পাণ্ডিত্যের দাঁত দিয়ে খোলা ভেঙে বের করা সম্ভব নয়, এবং যারা ধর্মের ব্যাকরণগত অর্থ জানেন, তারা অবধারিত রূপেই ধর্মের মূল সত্য সম্পর্কে অজ্ঞান। সুতরাং পণ্ডিতদের সেই ধর্ম নয়, আমি বলতে চাই সেই ধর্মের কথা, যে ধর্মের আবির্ভাব আদিম মানুষের সরল দর্শনের মূল সত্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা থেকে—সেই প্রথম এবং চিরকালের প্রশ্ন, কোথা থেকে? কেন? কে? এবং কোথায়?

ধারণা করবার চেষ্টা করুন না সেই প্রথম মানুষের কথা, যে অকস্মাৎ একদিন এই পৃথিবীর চতুর্দিকে তাকিয়ে শুধুমাত্র দেখেই শেষ করল না, সঙ্গে সঙ্গে একটু চিন্তাও করল। চিন্তা করল—হঠাৎ প্রথম যেদিন দেখল তার জন্মদাতা পিতা অকস্মাৎ চোখ বুজলেন, শরীরটা আর নড়ল না, চড়ল না। তারপর পচে গেল, ফুলে উঠল, গন্ধ বেরুল এবং তারপর এমনি করেই গেলেন তার গর্ভধারিণী জননীও। এই তখনই সে চিন্তা করল বোধহয়, কোথায় গেলেন এরা? এসেছিলেনই বা কোথা থেকে। এবং এই অনুসন্ধিৎসা থেকেই কি এমন একটা ধারণার জন্ম নয়, দুচোখে যা দেখা যায়, দুহাতে যা ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, তার অস্তিত্ব এর বাইরে? এবং সেই থেকেই কি স্বর্গ জাতীয় একটা কল্পনা এবং ঈশ্বর......

হ্যাঁ, আমি সেই অকৃত্রিম হৃদয়ের প্রশ্নজাত অবস্থাটার কথাই বলছি, যা নাকি ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি সেই আবহাওয়াটা তৈরি করেছে পৃথিবীতে এবং যে আবহাওয়া থেকে অজ্ঞাত এক ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের কল্পনা। যুগে যুগে সেই কল্পনার ধারাটা স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং এইভাবে আজো চলে আসছে। কিন্তু সত্যই কি সেই অজ্ঞাত উৎস সম্পর্কিত কল্পনা, শুধুমাত্র কল্পনাই, না কল্পনার পথে এসেছে সত্য, মানুষের অনুসন্ধিৎসার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি?

সেটা যদি জানতে হয়, তাহলে ধরুন আমাদের তো সেই গিয়ে অনেকটা দূর পিছিয়ে যেতে হবে, তাই না? সেই আদিম মানুষের হৃদয়

সঞ্জাত চিরকালীন প্রশ্নের উৎসকাল পর্যন্ত! সমস্ত পৃথিবীটাকে যদি ধরি তাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। বরং আসুন না আমাদের নিজেদের দেশটা থেকেই আরম্ভ করি? আমাদের দেশে এটাতো প্রায় অটল বিশ্বাস যে, ধর্ম যদি সত্যি সত্যি কোথাও থেকে থাকে তবে তা এদেশেই আছে—যাকে বলে কিনা সনাতন ধর্ম, যে ধর্ম আদি, অকৃত্রিম এবং অনিঃশেষ! এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত সরাসরি অভিজ্ঞতার কোনো বলিষ্ঠ দাবি যদি কোন দেশ করতে পারে, তবে সেটাও আমাদেরই দেশ। এখানেই কি সরাসরি দাবি করা হয় নি যে, বেদ ভগবানের মুখ—নিসৃত? এখানেই কি বলিষ্ঠভাবে ঈশ্বর সম্পর্কে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়নি উপনিষদে? এখানেই কি যাজ্ঞবল্ক্ বলেন নি—আমি জানি তাঁকে? এখানেই কি শঙ্করাচার্য অদ্বৈত ব্রহ্মের স্বরূপ বলবার চেষ্টা করেন নি? এখানেই কি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সহজ এবং সরল ভাষায় সন্দেহাতীতভাবে বলেন নি, আমি দেখেছি তাঁকে? এত সাধু সন্তই বা অন্য কোন্ দেশে আছে, বলুন? এত অলৌকিক ক্ষমতাই বা অন্য কোন্ দেশে কে দেখিয়েছেন? সুতরাং ঈশ্বরের সন্ধানে যদি যাত্রা শুরু করা যায়, নিজের দেশ থেকেই সেটা আরম্ভ করা যাক না?

না, না, সঙ্গে সঙ্গেই আপনি ভাবতে বসে যাবেন না যে, যে বৈদিক সভ্যতার চৌহদ্দির মধ্যে আমাদের যে ধর্ম—সেই বেদের যুগ থেকেই আপনাকে যাত্রা শুরু করতে বলব। ধর্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কিত কল্পনা কোনো একটা বিশেষ সভ্যতা বা ঐতিহ্যের একচেটিয়া ব্যাপার নয়। বেদের আগেও এ দেশে—যে মানুষ, তাঁরা যে শুধু জন্মেছেন, আহার-বিহার আর মৈথুন করেছেন এবং মৃত্যুর মধ্যেই জীবনের পরিসমাপ্তি টেনেছেন, তাই তো নয়! তাদের মধ্যেও তো চিরকালের এই প্রশ্নটা তুমুল অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করেছিল বৈদিক মানুষেরই মতো? সেই ধরুন, প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষদের রেখে যাওয়া এমন কোনো নিদর্শন কি আমাদের হস্তগত হয় নি যা দেখে বলা যায় ভারতের প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষেরা এইভাবে ধর্ম নিয়ে বা ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করতেন? তাঁরা যে এ নিয়ে ভাবেন নি—বা কোনো বিশেষ একটা বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করেন নি তা নিঃসংশয়ে বলা যায় কি? যদি তেমন মনেও হয় তবু নব্যপ্রস্তর যুগের শেষে, ধাতু যুগের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই, এ-দেশে এমন এক সভ্যতার পরিচয় আমরা পাই—যার মধ্যে ধরুন গিয়ে এমন কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, যা দেখে কল্পনা করতে কষ্ট হয় না যে, জন্ম নিয়ে, জীবন নিয়ে এবং মৃত্যু নিয়ে তাঁরা চিন্তা করেছেন এবং ধর্ম বলতে যা আমরা বুঝতে চাই, সেই ধরনের একটা ধর্ম-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেছেন। আপনার মনে বোধহয় সংশয় দেখা দিচ্ছে যে, বেদের আগে আবার ধর্ম ছিল নাকি এ-দেশে! শুনলে আশ্চর্য হবেন যে, ছিল! এবং সেই ধর্মের ধারা আজও চলে আসছে আমাদেরই মধ্যে দিয়ে। এবং আমরা যত না অনুসরণ করি বৈদিক রীতিনীতি, তার চাইতেও বেশী প্লাবিত সেই প্রাক বৈদিক ভাবধারাতেই।

অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে চাচ্ছেন তো আমার দিকে, সেটা আবার কোথাকার ধর্ম? আর সে ধর্মটাই বা কি? জবাব হল এই যে, সেটা আমাদের

এই দেশেরই ধর্ম, আর সেই ধর্মের স্বরূপ জানা যাচ্ছে আমাদের সেই মহাপ্রাচীন পূর্বপুরুষদের ফেলে যাওয়া বহু নিদর্শনের মধ্যে। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছেন যে, আমি বলছি মহেন-জো-দড়ো, হরপ্পাতে প্রাচীন ভারতের ধর্ম বিশ্বাসের যে-সকল নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, তারই কথা?

হ্যাঁ, আমি হরপ্পা সংস্কৃতি থেকেই আরম্ভ করছি। হরপ্পা সম্ভবত মহেন-জো-দড়ো-ধরনের সভ্যতার একটা শাখা—off-shoot মাত্র।[১] অবশ্য মহেন-জো-দড়োর ক্ষেত্রে সবটা ব্যাপারই আমাদের অনুমান করে নিতে হবে। তা-ছাড়া উপায়ই বা কি বলুন? মহেন-জো-দড়োর বর্ণমালার যথার্থ স্বরূপ আজও যে আমরা উদ্ধার করতে পারি নি! আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, অনুমানে সত্যতা কোথায়? কিন্তু আমি বলব অনুমানের উপরই মানুষের জীবনের বিরাট এক অংশ এযাবৎকাল চলে এসেছে। বেদ যে ভগবানের মুখনিসৃত এর কোন প্রমাণ আপনার হাতে আছে? এ ক্ষেত্রে আপনি অনুমান না করেও বিশ্বাস করেন। এই যে ধরুন বাংলার শারদোৎসব—দুর্গাপূজা, ঐ যে দশভূজা মা, তাঁর সম্পর্কে অনেক গল্পকথা আছে বটে, তাঁকে কেন্দ্র করে দু-একটা শাস্ত্রগ্রন্থও আছে, কিন্তু সেই শাস্ত্রগ্রন্থের রচয়িতারা যে অনুমানে এমন সব গল্প ফাঁদেন নি, আপনি তা হলপ করে বলতে পারেন? ধরুন না সেই চণ্ডী সম্পর্কিত ব্যাখ্যা, সত্যদেবের ব্যাখ্যাই ধরুন না,—দেবীর হাতে নিহত অসুর আর কেউ নয়, সে আমাদেরই অহংবোধ। তাই তাকে স্থলে নয়, জলে নয়, অন্তরীক্ষে হত্যা করতে হয়, যাতে সে কোথায় পায়ের নিচে মাটি পেয়ে বলতে না পারে, এই 'আমি'। এ ব্যাখ্যাও তো আপনারা গ্রহণ করেন। এই যে দুর্গাপ্রতিমা, তা দেখে আপনারা বোঝেন কি? যে মন অবিশ্বাস্য বিশ্বাসের তেলে হাবুডুবু খায়—তার কাছে শোধনের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে মন সব কিছুকেই বিচার করে নেয়, সঙ্গে সঙ্গেই সে সব কিছুর একটা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তবে ছাড়ে। বিশ্লেষণী মন একটা মূর্তিকে—তা সে নির্ভেজাল শিল্পের ক্ষেত্রেই হোক, আর ধর্মের ক্ষেত্রেই হোক, বিশ্লেষণ না করে তার মূল্য কখনই নিরূপণ করে না। পিকাসোর একটা ছবি বুঝতে গেলে বিশ্লেষেণী মন থাকলে তবেই তাকে বোঝা যায়, তার সত্যতা আবিষ্কৃত হয়। অনেক সময় শিল্পীর কাছে পর্যন্ত যে অর্থ অজ্ঞাত, বিশ্লষণী মনের কাছে তা ধরা পড়ে। তেমনি পূজার বেদীতে যে মূর্তিকেই আমরা প্রতিষ্ঠিত করি না কেন—বিশ্লেষণ দ্বারা তার যথার্থ বা Significance ধরা না পড়লে সবটাই একটা কুসংস্কার, এবং অর্থহীন ব্যাপার। এক্ষেত্রে অনুমান একটা বিরাট হাতিয়ার।

হ্যাঁ, যে দুর্গা প্রতিমার কথা বলছিলাম, কয়জন তাঁর অন্তরালে একটা নির্বিকার শিবের মূর্তি দেখেন বলুন তো? আসল সত্য যে 'দশপ্রহরণধরিণীমে'র অন্তরালের ঐ শিব, বিশ্লেষণী মন ছাড়া কয়জনই তা বোঝে বলুন? আর কয়জনই বা বোঝে দুর্গার আশে-পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতী,

১ অবশ্য বর্তমান কালে সিন্ধুসভ্যতাকে মূলত হরপ্পা সংস্কৃতি বলেই উল্লেখ করা হয়। কারণ, এখানেই সিন্ধুসভ্যতার নমুনা বেশী পাওয়া গেছে। অনেকে মনে করেন এই হরপ্পাই ঋগ্বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখিত হরিয়ুপিয়া।

কার্তিক-গণেশ ইত্যাদির অর্থ? আর প্রত্যেকটা দেবদেবীর ঐ যে একটা করে বাহন বা অনুসরণকারী আছে, তারই বা মানে কি?

আমি আপনি কাঁলীবাড়ি যাই, মা কাঁলীকে প্রণাম করি। কিন্তু শিবের বুকে দাঁড়ানো ঐ মূর্তির অর্থ কয়জনে জানি? হাতের ঐ নরমুণ্ডের এবং গলার মালার প্রত্যেকটি মাথারই একটা করে গূঢ় অর্থ আছে। তান্ত্রিকেরা সেটা জানেন। তা ছাড়া এই সমগ্র মূর্তির একটা তত্ত্বগত ব্যাখ্যাও আছে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে। তান্ত্রিকের ভাবনা আর চিন্তাবিদের চিন্তা সবই তো একটা অনুমান বা অনুভব মাত্র। এ-সব যদি আপনারা মেনে নিতে পারেন, তাহলে হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া অসংখ্য মূর্তি আর প্রতীক দেখে যদি আমরা পুরনো ভারতবর্ষের ধর্মচর্চা সম্পর্কে একটা অনুমান করে নিই, সেটাই বা গ্রাহ্য হবে না কেন।

আশ্চর্য হবেন, বুঝলেন—যদি সেই প্রাক-বৈদিকযুগের ভারতবর্ষের ফেলে যাওয়া প্রতীকের মধ্যে তার ধর্মচর্চার আভাস পান, তাহলে সত্যিই আশ্চর্য হবেন। যদিও তার রেখে যাওয়া লিপিমালা মূক, মুখ খোলে না, তবুও রেখে যাওয়া প্রতীকগুলি (নানা মূর্তি, সীলমোহর, জলাশয়, বড় বড় গৃহ ইত্যাদি) দারুণ মুখর। আসুন, একে একে সেই মুখর প্রতীকগুলির সাক্ষ্য গ্রহণ করি মহাপ্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম সম্পর্কিত একটা ধারণা লাভের জন্য। হয়তো বা মাঝে মাঝে চমকেই যাবেন মহেন-জো-দড়োর ভারতের সঙ্গে বৈদিক ভারতের, বিশেষ করে বৈদিক সভ্যতাভুক্ত বিদ্রোহী ভারতের চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে। তখন হয়তো নতুন করে আবার ভাবতে শুরু করবেন। কিন্তু সে কথা এখন থাক। বরং আসুন—হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর সেই পুরনো চিত্রশালায় একবার প্রবেশ করা যাক।

শুধুই বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাস দেখেছেন? না মহাবিদ্যালয়েরও? কিংবা তারও, তারও উপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের? সে যাই হোক না কেন, যে-কোনো একটা মোটাসোটা ধরনের বইয়ের পাতা খুলে ধরুন,—তাহলেই এমন সব চিত্র চোখে পড়বে—যার দিকে একটু অভিনিবেশ সহকারে তাকালেই বহু দুরবগহ অর্থ আপনার কাছে ধরা পড়বে।

এমন সব অসংখ্য প্রতীক আপনি হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োতে পাবেন, যা দেখে আপনার মনে হবে-সেখানকার লোকেরা সর্পের পূজা, বৃক্ষ বন্দনা, পশু পূজা ইত্যাদী করত। কিন্তু সে-সব নিয়ে খুব একটা আলোচনা আমি করব না, কারণ এ-সব হয়তো কোন সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম চিন্তার সঙ্গে জড়িত নয়, যে-চিন্তা মূল সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত দিতে পারে, উৎস সম্পর্কে, ঈশ্বর সম্পর্কে। আপনার কি মনে হয়? এবং সবারই কি এই রকম মনে হয় না যে, এ-সব মানুষের মনের আদিম স্তরের একটা ভাবনামাত্র? যখন আদিম একটা মানুষ সর্পাঘাতে আর একটা মানুষের মৃত্যু দেখল, এবং তার সকল প্রকার কলাকৌশল প্রয়োগ করেও তাকে আর বাঁচাতে পারল না, তখনই সে ভাবল-এক অপরিসীম ক্ষমতা রয়েছে সর্পের মধ্যে, যাকে বাহুবলে জয় করা যাবে না। করা যাবে না। আত্মসমর্পণ করে তার করুণা কুড়াতে পারলে তবেই মুক্তি এই বিপদ থেকে। সেই থেকেই কি ধরুন সর্পপূজা ধরনের

পূজার উৎপত্তি হয়নি?[১] গরু উপকারী জন্তু। মানুষের উপরে যেমন এক অদৃশ্য নিয়তি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই গরুর উপরও আছে এক অদৃশ্য গো-নিয়তির যে হয়তো তাকেও নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের নিয়তি বা ভগবান যেমন মনুষ্যাকৃতির বাইরে যেতে পারেননি—(শুধু অতীন্দ্রিয়তার নামে তাঁর হস্তপদের সংখ্যা নানাক্ষেত্রে, বিশেষ করে মহাশক্তিধর দেবতাদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে এই মাত্র) তেমনি গো-দেবতাও নিশ্চয়ই গো-আকৃতিব বাইরে নয়! তাকে প্রসন্ন করে আত্মস্বার্থ সিদ্ধির আশায় মানুষ হয়তো—গো-পূজার প্রচলন করেছে।[২] এমনি করেই, কখনও ভয়, কখনও আত্মস্বার্থের প্রয়োজনে মানুষ এই সব নানাবিধ পূজা করেছে। অবশ্য এরই পশ্চাতে উপস্থিত থাকতে পারে মহা উচ্চকোটির আর এক ধারণা—যে ধারণা বিশ্বের সর্বত্র একই সুবিশাল প্রাণেরপ্রসার লক্ষ্য করে একাত্মবোধে নত হয় সকলেরই কাছে, সব কিছুকেই শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে আপন জ্ঞানে।

মানব সমাজের প্রথম পর্বে যখন সমাজ ছিল না, ছিল পশু জগতেরই এক একটা গোষ্ঠিমাত্র, তখন পিতা নয় মাতাই ছিল নামগোত্রহীন সন্তানদের ভরসা। তাই প্রথম মানুষের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল মা। মায়ের পূজার প্রচলন এইভাবেই। মা—যে মা জন্ম দেন, স্তন্য দেন এবং স্নেহ দ্বারা লালন পালন করেন, মনুষ্যরূপিণী মায়ের মত আর এক মাও এমনি জন্ম দেন, লালন পালন করেন—তার নাম ধরিত্রী। মা স্তন্য দেন, ধরিত্রী অন্ন দেন। সুতরাং মনুষ্যমা এবং ধরিত্রী মা মিলে গিয়ে হল অদ্ভুত এক মাতৃমূর্তি যা সুপ্রাচীনকালে সর্বত্রই প্রায় পূজা পেয়ে এসেছে। এমনি কত অসংখ্য পূজ্য পূজনীয়া আছেন, সে-সবের উল্লেখ করে এখানে লাভ নেই। ঈশ্বর সন্ধানে কুসংস্কারের তো কোন মূল্য নেই! কিন্তু মূল্য আসে তখনই যখন এই সীমিত সব মূর্তির মধ্যে মানুষের অপূর্ব এক বিশ্লেষণী মন মহামূল্যবান দর্শন সৃষ্টি করে; সীমিতকে অসীম করে, মৃতকে অমৃত। আমাদের লক্ষ্য সেই অসীম, অমৃত। হরপ্পা-মহেন্জো-দড়োর মানুষ কি সেই অমৃতের সন্ধান বিন্দুমাত্রও লাভ করতে পেরেছিল?

আসুন না, একটা বিশেষ ধরনের মূর্তি নিয়েই আরম্ভ করা যাক! দেখা যাক, সেখানে কোন উচ্চাঙ্গ মানসিকতার সন্ধান পাওয়া যায় কি না, যা দেখে অনুমান করা যেতে পারে যে, হরপ্পা সভ্যতা মানুষের পক্ষেও উৎস সম্পর্কিত, অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বর সম্পর্কিত কল্পনা অসম্ভব ছিল না। আচ্ছা, ১নং চিত্রটির দিকে তাকিয়ে দেখুন[১]।— পশু পরিবৃত হয়ে যিনি বসে আছেন, তাঁর বসার ভঙ্গীটি কেমন? ঠিক যোগাসনে যেমন করে বসেন

(১) কিন্তু ভারতবর্ষ যে সেই সিন্ধুসভ্যতার সময় থেকেই কুলকুণ্ডলিনীকে সর্প বলে ধরে নিয়ে পূজে করেনি একথাও বলা যায় না। কারণ, সেই কালেই সিন্ধু সভ্যতাতে তন্ত্রসাধনা প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে।

(২) সমকালীন মেসোপোটেমিয় সভ্যতাতে বৃষ ছিল মহান দেবতা। সিন্ধু অঞ্চলের সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার নিকট সম্পর্ক ছিল। সেখান থেকেই যে গো সাধনার ধারা ভারতে আসেনি তা বলা যায় না। সিন্ধু অঞ্চলে এই কারণেই হয়তো সীলমোহরে কুঁজওয়ালা ষাঁড়ের ছড়াছড়ি। এবং এখানকার পশুপতির সঙ্গেও তার হয়তো নিবিড় যোগ ছিল। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে হয়তো আজও শিবের সঙ্গে ষণ্ডের নিবিড় যোগ দেখা যায়।

সাধকেরা, তেমনভাবেই নয় কি? ঠিক এমনি ভঙ্গিতেই কি মহাযোগী মহেশ্বরের কোন চিত্র বা মূর্তি দেখেন নি? আর ঠিক এমনি করেই কি গৌতম বুদ্ধকে ধ্যানরত অবস্থায় দেখতে পাননি? ভারতীয় যোগশাস্ত্রে কি এমনি ভঙ্গীর সবিশেষ একটা মূল্য নেই? পতঞ্জলি যে যোগের বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের জন্য যে রাজযোগের ব্যবস্থা হয়েছে এই যোগাসনের ভঙ্গীকে কি সেই পর্যায়ে ফেলা যায় না? যোগাসনে উপবিষ্ট এই উর্দ্ধমেঢ্য, ত্রিবদন (হয়তো চতুর্বদন। যে বদন দেখা যাচ্ছে না) যোগীপুরুষ বসে আছেন পশুবৃত অবস্থায়, সম্ভবত পিপল পত্রের নিচে।

এই যোগ কেন? মনঃসংযোগের জন্য। কেন মনঃসংযোগ? অনন্তের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্যই কি এই মনঃসংযোগ নয়? বলবেন, অমিতাভ বুদ্ধের নেত্রে যে নির্বাণের প্রশান্তি, মহাযোগী শিবের স্তিমিত নেত্রে যে ব্রহ্মানন্দের স্বাদ, তা নেই এই মূর্তিতে। কিন্তু সেই অর্ধ নিমীলিত নতনেত্রের কল্পনাও কিন্তু হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োতে উপস্থিত নেই? হয়তো এই মূর্তিতে তাঁর সেই নেত্র পরিস্ফুট নয়, কিন্তু হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর কল্পনাতে সে মূর্তিরও অভাব ছিল না। তাহলে আসুন না, নিচের আর একটা ভিন্ন মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখুনঃ ঐ যে পুরোহিত ভাবের পোশাক পরা একটি মূর্তি—(২ নং চিত্র দেখুন) দক্ষিণ বাহু অনাবৃত, বাম বাহু আচ্ছাদিত করে বাম স্কন্ধের উপর ত্রিপত্রের নক্সাকাটা শাল—তাঁর আশ্চর্য অর্ধনিমীলিত চোখ দুটি লক্ষ্য করে দেখেছেন? যাকে বলে ধ্যাননেত্র ঠিক তাই। এবং একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন—স্তিমিত দৃষ্টি নিবদ্ধ নাসিকাগ্রের দিকে। ঠিক এই দৃষ্টিই শিবের চোখে, এই দৃষ্টিই বুদ্ধের চোখে—আর ঠিক দক্ষিণ বাহু অনাবৃত রেখে এমনই পোশাকে অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষুকের চিত্র আপনার কাছে নিশ্চযই অপরিচিত নয়! এই যে যোগভঙ্গী, আর এই যে দৃষ্টি, এ দেখেও কি মনে হয় যে, অধ্যাত্ম চেতনাব উচ্চমার্গে হরপ্পা- মহেন-জো-দড়োর মানুষেরা ভ্রমণ করতে পারেনি কখনও? যদি এমন কথাই বলি যে, বৈদিক ভারতের যোগ সাধনা বা অধ্যাত্ম সাধনা মহেন-জো-দড়োরই উত্তর-সাধনা হিসাবে দেখা দিয়েছে এদেশে, তাহলে কি মিথ্যে বলা হবে?

হাঁ ব্যতিক্রম কিছু আছে বই কি! অমন উল্টো করে আচড়ানো মাথার মধ্যখানে সিঁথি কোন ভারতীয় আর্য পুরোহিতের নেই। অমন সীমিত গোঁপ আর শ্মশ্রুও নেই। বৌদ্ধদের আছে মুণ্ডিত মস্তক, হিন্দু সন্ন্যাসীদের জটাজুট, পুরোহিতদের টিকি, ইত্যাদি। ফিতে দিয়ে অমন করে মাথা বাঁধাও নেই কারো। এর তবে অর্থ কি?

হয়তো কোন গূঢ় অর্থ আছে যা আমরা জানি না। হয়তো সেই গূঢ় অর্থের তাৎপর্য আজও ভারতবর্ষ ধরতে পারেনি। সবই তো একটা ইঙ্গিত, symbol। অতীন্দ্রিয় জগত তো একটা symbol-এর মধ্য দিয়েই আমাদের কাছে প্রকাশিত। অধরাকে তো প্রতীকের মাধ্যম ছাড়া কখনই ধরা যায় না। তাইতো মন্ত্রের মধ্যে গুহ্য শব্দের অবতারণা।

(১) ছবিগুলি গ্রন্থের প্রথমে দেওয়া আছে।

ঐ যে যোগাসনে উপবিষ্ট মূর্তি, তাঁর শিরস্ত্রাণ লক্ষ্য করুন ঃ বাঁকানো শিঙের মধ্যিখানে উঠেছে একটা উচ্চ উৎক্ষেপ। একে কি নিতান্তই একটা খেয়াল খুশি বলে বর্ণনা করবেন? না, ঠিক তা নয়। এরও একটা তাৎপর্য আছে।

আর একটু কষ্ট করুন না। আর একটা চিত্র লক্ষ্য করুন। বৌদ্ধ-শিল্পের নমুনা সাঁচী-স্তূপের এই উত্তর-তোরণটি দেখুন (৩নং চিত্র)—তোরণের শীর্ষদেশে বৌদ্ধ মুকুট, ঠিক ঐ যোগাসনে উপবিষ্ট ধ্যানী-পশুপতির মস্তকের মুকুটের মত। বৌদ্ধদের এই মুকুটের গূঢ়ার্থ হল ত্রিরত্ন, অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ। তাহলে এই পশুপতির শিরস্ত্রাণেও যে গূঢ়ার্থ নেই তা বলা যায় না।[১]

আর তাছাড়া এই যোগাসনে উপবিষ্ট ভঙ্গীটি আকস্মিক কোন শিল্প নয়। এই ভঙ্গী অত্যন্ত পরিচিত ছিল হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর মানুষের কাছে। তার প্রমাণস্বরূপ আরও দুটো চিত্র দেখুন (৪নং ও ৫নং চিত্র)।—যোগাসনে উপবিষ্ট এক যোগী-পুরুষকে পূজো করছে সর্প-ছত্রতলে ভক্তিনম্রভাবে উপবিষ্ট দুটি মানুষ। আবার দেখুন—মস্তকহীন ঐ প্রস্তর মূর্তিটিকে। আর ঠিক এরই পাশাপাশি যোগাসনে উপবিষ্ট লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মূর্তিটি কল্পনা করুন, অপূর্ব একটা সাদৃশ্য পান না? এর পরেও কি মনে হতে পারে যে, হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত সব মূর্তিই একটা অসভ্য বর্বর মানসিকতার প্রকাশ মাত্র?

না, না, আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এক মহান অধ্যাত্ম সাধনার পর্যায়ে পৌঁছেছিল হরপ্পা-মহেন-জো-দড়ো, যার গূঢ়ার্থ আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। বৃক্ষ পূজার নমুনা দেখে হয় তে বলবেন অসংস্কৃত অসভ্যতা ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। তাহলে একটু বিচার করে দেখুন না, সাধনার ক্ষেত্রে বৃক্ষের কি অপরিসীম মূল্য ভারতবর্ষে। মহাযোগীরা বৃক্ষনিম্ন সার করেছেন। গৌতম বোধি লাভ করেছেন বৃক্ষের নিচে। আর ঠিক যে ধরনের বৃক্ষের নিচে গৌতমের বোধি লাভ হয়েছে ঠিক তেমনই এক বৃক্ষপত্র কি দেখতে পাচ্ছেন না হরপ্পা-সভ্যতাতে প্রাপ্ত মহাযোগীর মাথার উপর? ফিগট্রি অর্থাৎ যাকে বলে অশ্বত্থ গাছ কিংবা পিপল পাতার মত? বৃক্ষ ও অরণ্যের মূল্য অপরিসীম অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে। ইঁট কাঠ পাথরের মধ্যে পরব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়নি ভারতবর্ষের। জীবনের বানপ্রস্থ পর্বে অরণ্যেই লাভ হয়েছে উপনিষৎ। তপোবনই ভারতবর্ষের আদর্শ, রাজধানী নয়। সুতরাং বৃক্ষ একটা প্রতীক মাত্র। তার মধ্য দিয়ে বয়ে আসছে এক দূরবগহ অর্থ-যে অর্থ ধরবার মানসিকতা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই।

এত সব পশুচিত্রের প্রাধান্য কেন মহেন-জো-দড়োতে? তার মানে কি এই নয় যে, পশুজগতের প্রতি একটা বিশেষ রকমের শ্রদ্ধা ছিল মহেন-জো-দড়োর অধিবাসীদের মনে? যদি থাকেই বা তাহলে কি হেয় জ্ঞান করবার কোন হেতু আছে আমাদের সেই মহাপ্রাচীন পিতৃপুরুষদের? পশুর প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে অহিংসাবশত, সমস্ত প্রাণই এক মহাজীবনের প্রবাহে প্রবাহিত এই ধারণা থেকে, তাহলে সে তো অগৌরবের কিছু নয়!

(১) শৃঙ্গ দিব্যশক্তিরও প্রতীক, যে জন্য অসুরেরা শৃঙ্গযুক্ত মুকুট পরত! কে জানে, হয়তো এই তিনটি শৃঙ্গ সৎ + চিৎ + আনন্দ বা সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণেরও প্রতীক হতে পারে।

আপনি যদি হিন্দু হন, অবশ্যই হিন্দু অর্থে 'আর্য' এই রকম কিছু মনে করবেন না। অনার্য বিজ্ঞান ও ভাববাদের সঙ্গে আর্য উচ্চকোটি কল্পনা মিশ্রিত হয়ে ভারতে যে বিশেষ এক ধরনের সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে তারই নাম হিন্দু সংস্কৃতি। এবং এই সংস্কৃতিভুক্ত যে মানুষ তারাই হিন্দু। আর্য সাধনায় দেবদেবীর নাম থাকলেও কোন মূর্তি-কল্পনা নেই। উপনিষৎও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে আছে মূর্তি পূজা। সে মূর্তি একটা symbol মাত্র—যে symbol-এর অন্তরালে রয়েছে পরম ব্রহ্ম, সত্য। এই যে হিন্দুদের অসংখ্য প্রতিকী মূর্তি—তার মধ্যে কাকে আপনারা পশুহীন অবস্থায় দেখেছেন? শিবের সঙ্গে আছে বৃষ এবং সর্প। বিষ্ণুর সঙ্গে গরুড়। ব্রহ্মার সঙ্গে সিংহ, জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে সিংহ, কালীর সঙ্গে শিবা, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর হংস, কার্তিকের ময়ূর, গণেশের ইঁদুর। হিসেব করলে দেখবেন এমনিভাবে প্রত্যেকটি দেব-দেবীর সঙ্গেই পশুপাখি বা বৃক্ষের মধ্যে একটা না একটা জড়িত আছেই। মহানির্বাণের পথিক যে বুদ্ধ তাঁরও সঙ্গে আছে হস্তী, সর্প ইত্যাদি। বৌদ্ধ শিল্পে মানুষের চাইতে পশুর মূল্য কম নয়। অশোকস্তম্ভে তাই পশুমূর্তি আপন মাহাত্মে তাঁর বিজয় ঘোষণা করছে। ধর্মচক্রের উপরে ও নিচে পশুমূর্তি আজ তাই ভারতরাষ্ট্রের মুকুট স্বরূপ।[১]

না, না, পশুমূর্তিকে ঘৃণা করবার কিছু নেই। পশুর প্রতি শ্রদ্ধাবোধে মানুষকেও অবজ্ঞা করবার কিছু নেই। বিশ্বচৈতন্যের আলোতে সৃষ্টিরহস্য যখন ধরা পড়ে তখনই তো মানুষে পশুতে আর কোন তফাৎ থাকে না বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার কাছে। তখন অমিতাভ বুদ্ধের এক স্নিগ্ধ অহিংসা ফুটে উঠে মানুষের মধ্যে, যে অহিংসা-সাধনার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মুক্তি, মানুষের মুক্তি। তাহলে কি সেই মহা অহিংসারই পূজারী ছিলেন আমাদের মহাপ্রাচীন পিতৃপুরুষেরা?

আচ্ছা, আপনি কি গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে দেখেছেন হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি? বলুনতো, তাতে যত পেয়েছেন শিল্পের নমুনা, যত পেয়েছেন লিপি, তত কি যুদ্ধাস্ত্র বা যুদ্ধের দৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন? যুদ্ধাস্ত্রের এই উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতিই কি প্রমাণ করে না যে, হিংসা দিয়ে পরিবেশ তৈরি করেননি হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর মানুষেরা? এক অপরিসীম প্রেম ও ভালবাসার দ্বারাই মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা পৃথিবীতে? দেখুন না, খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে আসিরীয় শিল্পে পর্যন্ত হিংসার কী ভয়াবহ চিত্র (৭নং চিত্র দ্রষ্টব্য) দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সমগ্র হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর নিদর্শন সংগ্রহে এ ধরনের কোন মানসিকতার অভিব্যক্তি নেই সেখানে। শুধুমাত্র একটি চিত্রে দেখা যাচ্ছে (৮নং চিত্র) কোন এক শৃঙ্গবিশিষ্ট অর্ধবৃষ অর্ধমানব দেবতা একটি একশৃঙ্গী ব্যাঘ্রকে বশীভূত করছেন, কিন্তু হনন করছেন না।[১] এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হনন করে

(১) এই সব দেবদেবী হয়তো ভারতবর্ষের বিশেষ বিশেষ মানব গোষ্ঠীর আরাধ্য ছিল। পশুপাখি হয়তো ছিল তাদের অভিজ্ঞান (Totem)।

২) হয়তো ব্যাবিলনীয় গিলগামেশ মহাকাব্যের প্রভাবেই এই সীল মোহরে ভারতীয় গিলগামেশের আবির্ভাব ঘটেছে, যিনি কিংবদন্তীয় কোন প্রাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন।

পশুকূলকে নির্মুল না করে দৈবী শক্তির সাহায্যে তাকে বশীভূত করা হচ্ছে মাত্র। হিংসাশ্রয়ী পশুকে বশীভূত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে, ধ্বংস নয়। একথা হয়তো বলবেন, যে আর্য অধ্যাত্ম সাধনাতেও তো হিংসার আশ্রয় ছিল না প্রথম। যজ্ঞে কখনও পশুবলি দেওয়া হতো না এ কথা তো ঋগ্বেদেরই কোন এক ঋষি বলে গেছেন! পরবর্তীকালে আর্য অনার্য সংমিশ্রণে যখন হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি, তখনই বলিদান প্রথা প্রচলিত হয়েছে।[১] বিশ্বাস করি, আর্যরা অধ্যাত্ম সাধনায় প্রথম হিংসাশ্রয়ী ছিলেন না-বিশেষ করে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে। কিন্তু তাঁদের স্তোত্র যখন শত্রুনিধনকারী ইন্দ্রের বন্দনা করছে তখন একথা সপ্রমাণ যে, হিংসার উর্ধেও তাঁরা ছিলেন না। কিন্তু আমাদের সেই মহাপ্রাচীন পিতৃপুরুষ অর্থাৎ হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর অধিবাসীরা উন্মত্ত হিংসার কোন নিদর্শনই রেখে যান নি আমাদের কাছে। যে দু-একটি অস্ত্রের নমুনা পাওয়া গেছে তা নিতান্তই সাধারণ, কিছুটা কৃষিকর্মের জন্য, কিছুটা আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়তো। এর বাইরে নয়। সত্যি আশ্চর্য এক অহিংসার সাধনা! অথচ অহিংসার সেই পূজারী আমাদের সেই মহান পিতৃপুরুষদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন পুরধ্বংসকারী আর্যদেরই দেবতা ইন্দ্র, যিনি সেই থেকে পুরন্দর নামে পরিচিত এবং হবপ্পা বা হরিয়ুপিয়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই পাওয়া গেছে অস্ত্রে আহত মৃত ব্যক্তির সন্ধান।

জানেন এই মুহূর্তে আমার ভারতের উপর ইসলাম এবং গ্রীসের উপর তার প্রাধান্যের কথা মনে পড়ছে। দৈহিক শক্তিতে ইসলাম ভারতের উপর তার প্রাধান্য বিস্তার করলেও ভারতের সংস্কৃতি জয় করেছিল ইসলামকেই। তাইতো Titus বলেছেন, 'Hindusim has wrought a far greater change in Islam than Islam has wrought in Hinduism ' রোমও গ্রীসকে জয় করেছিল দৈহিক শক্তিতে, কিন্তু গ্রীস রোমকে জয় করেছিল তার সভ্যতার দ্বারা। হয়তো এ-কথাও কোনদিন বলা যাবে যে, হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর অনার্যদের আর্যরা জয় করেছিল দৈহিক শক্তিতে, কিন্তু আমাদের সেই মহাপ্রাচীন অনার্য পিতৃপুরুষেরা আর্যদের জয় করেছিলেন সভ্যতার বলে, আত্মিক চেতনার প্রাবল্যে। অনার্যরা দাস হয়েছিল আর্যদের দৈহিক শক্তির, আর্যরা হয়েছিল অনার্যদের আত্মিক শক্তির। তাইতো যে আর্যদের মূঢ় হিংসার বলি হয়েছিল অনার্যরা, তাদেরই যোগাসন আশ্রয় করে পরব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছে আর্যরা। যে শিশ্নদেবকে (৯নং চিত্র) ঘৃণা করে সুলতান মামুদের সোমনাথ লুণ্ঠনের মত অবস্থা করেছিল আর্যরা, তারাই সেই লিঙ্গমূর্তিকে পটে বসিয়েছে মহা সমারোহে। [* এই লিঙ্গ মূর্তি একক নয়। এর সঙ্গে আছে যোনি। লিঙ্গ ও যোনি নিয়েই আজ শিবলিঙ্গের পূজা আমাদের দেশে। এই লিঙ্গ ও যোনি কি সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির সমার্থবোধক নয়? আর তা যদি হয়, অনার্য এই হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর চিন্তা দার্শনিক মানসিকতায় কতদূর অগ্রসর হয়েছিল তারই কি প্রমাণ মেলে না? যে মাতৃদেবীর (১০ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) প্রাধান্য ছিল না আর্য চিন্তাতে, সেই মাতৃদেবীই শক্তিরূপা মা, জগদ্ধাত্রী, কালী, দুর্গা

(১) অবশ্য সিন্ধুসভ্যতাতেও পশুবলি দেওয়া হচ্ছে এমন চিত্র সীলমোহরে পাওয়া গেছে।

ইত্যাদি রূপে হিন্দুদের হৃদয় আশ্রয় করে শাশ্বত বেদী তৈরী করছে। যে বিশাল স্নানাগার ছিল সম্ভবত ধর্ম-স্নানেরই একটি কেন্দ্র মাত্র, তাই পরবর্তীকালে প্রত্যেকটি ভারতীয় দেবদেউলের পাশে সমুদ্রের প্রতীক হিসাবে পুকুর রূপে স্থান পেয়েছে অবধারিত রূপে। যে অহিংসাকে হিংসা বিধ্বংস করেছিল, সেই অহিংসাই আবার গৌতম বুদ্ধের মধ্য দিয়ে ফিরে এসেছে ভারতের দুয়ারে। সেই অহিংসাই ভারতের আজ মূল মন্ত্র। শিল্পের যে নৃত্য ভঙ্গী (১১ নং ও ১২ নং চিত্র) বিমূর্ত সত্যের দুয়ারে নিয়ে গিয়েছিল হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর মানুষকে দেবতা তুষ্টির নামে, সেই শিল্পই দেবদাসী রূপে হিন্দু মন্দিরে স্থান পেয়েছে ভারতবর্ষে [১] সেই নৃত্যই তালে তালে (১৩ নং চিত্র) হিন্দু ভারতকে করেছে উদ্ভাসিত। হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর পশুপতির শিরস্ত্রাণের প্রতীক, রূপ লাভ করেছে বৌদ্ধ ত্রিরত্নে (যারই পরিবর্তিত রূপ দেখা যায় পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্রে), শৈব সন্ন্যাসীর ত্রিশূলে। মহেন-জো-দড়োর লিপিতে আছে জ্ঞানযোগ, শ্রদ্ধবনত ভক্তিনম্র মানুষের ভঙ্গীতে আছে ভক্তিযোগ, ধর্মকেন্দ্রিক ভাস্কর্য ও নানা শিল্পে আছে কর্মযোগ। আর ধ্যাননেত্র যোগাসনে আছে রাজযোগ। হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর যে ভাস্কর্যশিল্পের কলাকৌশল, তাই আজ আধুনিক শিল্পে হৃদয়কে জয় করেছে আমাদের। মুক লিপি যদি মুখ খুলে তার দায়িত্ব পালন করত, না জানি কী হৃদয় রহস্যের গভীর দুয়ার আজ খুলে যেত আমাদের কাছে। হয়তো আর্য নয়, অনার্যের কণ্ঠেই আজ 'আত্মানং বিদ্ধি' এই বাণী শুনে সৎ+চিৎ+আনন্দ উপলব্ধি করতুম। কিন্তু তা হয়নি। কেন হয়নি? হয়নি কারণ, এই বর্বর শক্তি জগদ্দল পাথরের মত অকস্মাৎ বাইরে থেকে এসে তার বুকের উপর চেপে বসে স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল। তারপর এক ভিন্ন স্তরের সাধনা জগৎরহস্যের মূলের সন্ধান আরম্ভ করেছিল, ভিন্ন ধরনের আর এক পদ্ধতিতে—যাকে বলে বৈদিক পদ্ধতি। আদিম অনুসন্ধিৎসাকে আবার তাকে ঠেলে নিয়ে যেতে হয়েছে স্তরে স্তরে অলৌকিক এককত্বের পর্যায়ে। এবং আবার তাকে নেমে আসতে হয়েছে সেই প্রতীকেরই আশ্রয়ে—যাকে ছাড়া অবাঙ্‌মানসগোচরম-এর সন্ধান দেওয়া ভাষা বা শিল্পের পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নয়।

তাহলে এই সব দেখে শুনে আপনার কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে না কি যে, যোগাসনে মনোনিবেশ করে হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর অনার্যদের পক্ষেও সম্ভব হয়েছিল উপনিষদের ব্রহ্মস্বরূপ কল্পনা করা? দেখে কি এই মনে হয় না যে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ সহজ ধারণাগোচর নয় বলে এবং বুদ্ধি দ্বারা ও বিচার তাকে প্রচলিত ভাষার প্রকাশ করা যায় না বলে প্রতীককে গ্রহণ করতে হয় অলৌকিকের রূপরেখা হিসাবে? এবং ঐ যে সব অসংখ্য নির্বাক প্রতীক-পুতুল যা মূর্তির আকারে পড়ে আছে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে, তারা কোন এক অবাঙ্‌মানগোচর জগতেরই ইঙ্গিতবহ তোরণ মাত্র? আর সেই সব

---

(১) এর বেশী প্রাধান্য ছিল মেসোপোটেমিয়াতে বিশেষ করে ইশতার দেবীর মন্দিরে, যে

প্রতীকের একটা ব্যাখ্যা ছিল লিপির মধ্যে—যা আকস্মিক একটা আঘাতের ফলে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এবং সেই ধারাবাহিকতার সূত্র যারা ছিন্ন করেছিলেন তাঁরাই পরবর্তী কালে আবার সেই ছিন্ন ধারার মধ্যে প্রবাহ সৃষ্টির আপ্রাণ চেষ্টা করে কিছুটা তার অর্থ উদ্ধার করেছেন ?

আর্য অধ্যাত্ম চিন্তার সঙ্গে লিপি জড়িত ছিলনা প্রথম। অথচ কী উন্নত সভ্যতা ছিল হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর—যে সভ্যতা আপন অধ্যাত্ম চিন্তাকে শুধুমাত্র প্রতীকী রূপই দান করেনি, সংগে সংগে ভাষা দিয়েও তাকে বন্ধন করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে ভাষা আজ মূক! সে ভাষার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে গেলে অনুমানের হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। [১]

(১) ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয়দের ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষের যথার্থ অধ্যাত্ম সাধনার শুরু করেছিলেন আর্যরা। কিন্তু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কার করার পর এ ধারণা পাল্টে গেছে। আর্যদের বহু পূর্বেই ভারতবর্ষে অতি উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতার বাস্তব দিক যেমন উন্নত ছিল, তেমনই ছিল এর অধ্যাত্ম সাধনা।

সিন্ধু উপত্যকার খ্রীষ্ট পূর্ব তিন হাজার বছরের ইতিহাস কোন লেখা থেকে পাওয়া যায়নি। কারণ, তাদের লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তাদের অধ্যাত্ম চিন্তাধারার পরিচয়, তাদের যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া গেছে, তাই। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, তারা নানা দেবদেবীতে বিশ্বাস করত। এই সমস্ত দেবদেবীকে খুশি করার জন্য বলিদান প্রথাও ছিল। প্রকৃতির নানা জিনিসে অন্যান্য আদিবাসীর মত তারাও অতীন্দ্রিয় শক্তির পরিচয় পেয়েছিল। সেই জন্য তারা বৃক্ষপূজা করত যে রীতি অদ্যাবধি ভারতবর্ষের লোকধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে টিকে আছে। তারা জন্মান্তরে বিশ্বাস এবং আত্মার দেহান্তর গমনেও (Transmigration of soul) বিশ্বাসী ছিল। মাতৃরূপে উর্বরাশক্তির পূজাও যে তারা করত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। উর্ধ্বে বিস্তারিত পদদ্বয়ের মাঝখানে মাতৃমূর্তির যোনিদেশ বা নাভি থেকে শস্যচারা উঠছে এমন মূর্তিও পাওয়া গেছে। তাঁর দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুটি বাঘ। এছাড়া জন্তু-জানোয়ারেরও প্রচণ্ড প্রাধান্য রয়েছে এদের সীলমোহরে, যা দেখে মনে হয় যে, এই সব জন্তু-জানোয়ার তাদের অভিজ্ঞান হিসাবে হয়তো কাজ করত। হয়তো তারা নানা গোষ্ঠীর আদি প্রাণী হিসেবে মর্যাদা লাভ করত, কারণ প্রাচীন কালে নানা দেশেই মানবসমাজ পশুকুল থেকে এসেছে এই বিশ্বাস ছিল। বিবর্তনবাদ অবশ্য একথা অস্বীকার করছে না। তবে সে পশু মানব আকৃতি লাভের পরে অনেকটাই রূপান্তরিত হয়েছিল—যে রূপান্তর ছিল মনুষ্য আকৃতি তুল্য। এই পশুকুলের মধ্যে বৃষমূর্তির সীলমোহর বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। মেসোপোটেমীয়রা এই

(১) এর বেশী প্রাধান্য ছিল মেসোপোটেমিয়াতে বিশেষ করে ইশতার দেবীর মন্দিরে, যে দেবীকে বলা হত Heavenly Herlot.

বৃষকে সর্বোত্তম দেবতা বলে মনে করত। ভারতীয় যোগীরা চক্রভেদ করে যখন অনেক উর্ধ্ব সূক্ষ্ম পর্যায়কে মানসনেত্রে দেখতে পান তখন সেই সব পর্যায়েই পরমাত্মারূপ দর্পণে নানা জন্তু-জানোয়ারেরও মূর্তি দেখে থাকেন। তাঁদের ধারণা, এই সব মূর্তি সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্মতর তরঙ্গের রূপ বিশেষ। ময়ূর, নানা ধরনের পাখি, ঘোড়া, হাতী, এ-সব তাঁরা দেখতে পান। কিন্তু বিশেষভাবে তাঁদের কাছে দৃশ্যমান হয় বৃষ। এই বৃষের মধ্যে এক মহতী অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রকাশ আছে বলে তাঁরা মনে করেন। এইজন্য ভারতবর্ষে প্রাগার্য যুগ থেকে আধুনিকযুগ পর্যন্ত বৃষ বিশেষ এক ধর্মীয় মাহাত্ম্য লাভ করে আছে। শিবের বাহন হিসেবে বৃষ তো দেবতার অনুরূপ মর্যাদাতেই মানুষের কাছে পূজ্য।

এখানকার অধিবাসীরা সাপের পুজো করতেন এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। একদিন পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ সাপের পুজো করত। সেই সর্পতত্ত্ব পূর্বেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মহেন-জো-দড়োতে ধর্মীয় ফলকে বা সীলমোহরে সাপের যে ছবি পাওয়া গেছে ভারতীয় তান্ত্রিক ও যোগীরা তার একটা ভিন্নতর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। যেমন, মহেন-জো-দড়োর মৃৎফলকে বীরাসনে ধ্যানমগ্না মুকুটধারিণী এক দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে। তাঁর দুইপাশে দুই ভক্ত যুক্তহস্তে নতমস্তক হয়ে আছেন। তাদের দুই পাশে বড় বড় দুই সাপ ফণা বিস্তার করে ছত্র ধরে আছে মাথার উপর। এতে যে উৎকীর্ণ লিপি আছে, তার পাঠোদ্ধার হয়নি। কিন্তু ভারতীয় তান্ত্রিকেরা প্রতীকার্থ বিচার করে এই মূর্তিকে (দেবীমূর্তি) বৃত্তকা বা বগ ঋত্তকা অর্থাৎ ভগবতী ঋত্তকা বলে বর্ণনা করেছেন। এই বৃত্তকার অর্থ হল বৃত্তধর্মকারিণী বা বৃত্তধর্মযুক্তা। একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে গোলক-আকৃতি প্রসারলাভ করলে তবেই হয় বৃত্ত। বৃত্তের ধর্ম বহির্মুখী। ইংরেজীতে যাকে বলে centrifugal. কিন্তু এর সূত্র বাধা আছে বিন্দুতে—যে জন্য একই সঙ্গে কেন্দ্রাভিমুখীও বটে—ইংরজীতে যাকে বলে centripetal.

শব্দ বা বাক্ হল এক ধরনের স্পন্দন (vibration) এই vibration বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টি করেছে বিশ্বভবন, পশুজগৎ। এই বৃত্তকা শক্তিকেই পরবর্তীকালে কুলকুণ্ডলিনী বলে চিন্তা করেছেন ভারতীয় যোগী ও তান্ত্রিকেরা। এবং এরই ভিত্তিতে পশুজগতের অধীশ্বর হিসেবে পরমাত্মার চমৎকার রূপ কল্পনা করেছেন। সেই মূর্তি পাওয়া গেছে পশুপতির সীলমোহরে। এখানে শৃঙ্গবিশিষ্ট ত্রিমুখ (চতুর্মুখও হতে পারে) এক দেবতা কূর্মাসনে উপবিষ্ট। তাঁর শিঙ বা শৃঙ্গ আছে। এ ছাড়া তার লিঙ্গ উর্ধ্বমেঢ্র অবস্থায় আছে। তার চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি পশু। যেমন, হাতী, বাঘ, গণ্ডার ও মোষ (সবাই স্থূল শক্তির প্রতীক)। তান্ত্রিকেরা এই প্রতীকের মধ্যে উন্নত ধরনের তন্ত্রতত্ত্ব খুঁজে পেয়েছেন। যেমন, পাশবদ্ধ জীবকেই তাঁরা মনে করেন পশু। সেই পাশবদ্ধ জীবের অভ্যন্তরেই পরমাত্মন বা পশুপতি বাস করেন। কূর্মাসনে বসা এই শৃঙ্গধারী দেবতাকে পশু পরিবৃত করে সেই উন্নত চিন্তার ইঙ্গিতই দিয়েছেন হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর অধিবাসীরা। তাঁর উর্ধ্বমেঢ্র এই বোঝায় যে, সেই পরমপুরুষ প্রকৃতিতে লিঙ্গ প্রদান করে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন।

এই মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পাতে আরও নানা সুন্দর কল্পনার জিনিস পাওয়া গেছে, যাকে বলে শিবলিঙ্গ। Heinrich Zimmer তাঁর Art of Indian Asia-তে সিন্ধুসভ্যতায় প্রাপ্ত শিবলিঙ্গের যথার্থ প্রমাণ ছবিসহ তার গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। এই শিবলিঙ্গের মধ্যে এক সুদূরপ্রসারী অর্থ আছে। সৎ+চিৎ+আনন্দ-এর আনন্দ অংশের প্রতীক হল শিবলিঙ্গ—যোগীরা যাকে বিন্দু হিসেবে দেখতে পান। সৎ হল বোধাতীত নির্গুণ শূন্যতা। এর মধ্যে সুপ্তশক্তির প্রতিনিয়ত স্বভাবজাত স্পন্দন হচ্ছে—যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস মানুষের স্বভাবজাত। বোধাতীত **'নির্গুণ** স্বভাবে এক সময় অস্তিত্ব বোধ অনুভব করেন। **'আমি'** এই অস্তিত্ব বোধ হলেই **'তুমি'** এই বোধ হয়। কারণ, 'তুমি' 'ছাড়া' 'আমি' বোধ অসম্ভব। এই 'আমি' বোধের সঙ্গে সঙ্গে যে 'তুমি' বোধ হয় সেটাই নির্গুণ ইচ্ছার (শক্তির) অভিঘাত স্বরূপ। সেই অভিঘাত বা বিস্ফোরণে প্রচণ্ড শব্দ হয়, এই শব্দ সুপারসনিক শব্দ (Supersonic Sound)। সেই জন্যই অশ্রুত। এই শব্দই 'ওঁ'। বিস্ফোরণের শব্দের আগেই আলোর প্রকাশ হয়। সেই আলোই 'বিন্দু'। যোগীরা যখন ষট্‌চক্র ভেদ করে ক্রমশ সূক্ষ্মতর জগতে প্রবেশ করেন তখন সূক্ষ্ম চেতনা লাভ করে এই সূক্ষ্ম শব্দ শুনতে পান এবং সূক্ষ্ম আলোকে খুব কাছ থেকে দেখতে পান। তখন এই বিন্দুকে একটি গোলকের চতুর্দিকে বলয় সৃষ্টি করে ঘুরতে দেখা যায়। কখনও কখনও এই গোলক লিঙ্গাকার ধারণ করে, তার চারদিকে আলো-বৃত্ত ঘুরতে থাকে। এ হল অবিচ্ছেদ্য পুরুষ ও প্রকৃতি স্বরূপ। শক্তির স্বভাবে 'একের' মধ্যে আলোড়ন হয়েছে কিন্তু শক্তি সেই 'এক' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুই হয়নি। বৈষ্ণবেরা এই ধরনের পুরুষ-প্রকৃতির সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি হিসেবে কল্পনা করেছেন। তাঁদের ত্রিভঙ্গ হল—প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের ক্ষোভ স্বরূপ। এই গুণক্ষোভ হয় 'এক'-এর অন্তর্নিহিত ইচ্ছার বিস্ফোরণ হলে। তখন যে শব্দ হয় তাই 'ওঁ'। বড় মধুর শুনতে। সেই 'ওঁ'-কে বৈষ্ণবেরা বাঁশী দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এবং দেহের ষট্‌চক্রকে বাঁশীর ষড়রন্ধ্র হিসেবে কল্পনা করেছেন। ভারতীয় তন্ত্রে সৎ+চিৎ+আনন্দের এই তিন অবস্থাকে কৃষ্ণ শিব (সৎ) শ্বেতশিব (চিৎ) ও শিবলিঙ্গ (আনন্দ—পুরুষ ও প্রকৃতি) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই লিঙ্গ চিন্তার মধ্যেই হয়তো আর্যদের লিঙ্গ সম্পর্কিত মহৎ চিন্তার বীজ লুক্কায়িত ছিল, যেমন, লিঙ্গ হল সদাশিব অর্থাৎ পুরুষের মনে যখন কেবলমাত্র জেগেছে বিশ্বকল্পনা কিন্তু তার বস্তুরূপ দেখা দেয়নি। একত্রে যুক্ত লিঙ্গ ও যোনি হল সেই প্রথম উন্মেষের প্রতীক। মূর্তি হল এর নিচের কল্পনা—ঈশ্বরতত্ত্ব রূপে প্রকাশিত। লিঙ্গ হল লাঙলের প্রতীক, যোনি ক্ষেত্রের। লিঙ্গ ও লাঙল এই উভয় শব্দই অনার্য অর্থাৎ অস্ট্রীক। যোনি হল উপাদানকারণ এবং লিঙ্গ হল নিমিত্তকারণ। শিব যখন অরূপ তখন তার প্রতীক হল লিঙ্গ। যোনি হল মূলা প্রকৃতি।

সিন্ধু উপত্যকাতে বহু যোগারূঢ় মূর্তিও পাওয়া গেছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, তাঁরা যোগসাধনা জানতেন। (শহর-জীবনে বাস করার জন্যই এঁদের যোগ সাধনার প্রয়োজন ছিল। কারণ শহরের কর্মকোলাহলে ও কর্মব্যস্ততায় সহজে কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করা সম্ভব নয়।) যোগের দ্বারাই বিশ্বজগৎ

ও তার অন্তরালবর্তী সত্য সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান হয়েছে। সুতরাং এই সভ্যতা যে খুবই উন্নত ছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এই শিবলিঙ্গপূজাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। ফলে লিঙ্গ পূজারীদের 'শিশ্নেদেবাঃ' বলে বিদ্রূপ করেছেন। পরে এর মূল্য বুঝতে পেরে নিজেরাই এই তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন।

আর্যদের অধ্যাত্ম সাধনায় 'যজ্ঞ' ছিল বিরাট ব্যাপার। 'যজ' ধাতু থেকে যজ্ঞ, অর্থাৎ Sacrifice বা ত্যাগ করা। নির্গুণ পুরুষ আত্মস্বরূপ ত্যাগ করেই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। আবার জগৎ স্বভাব ত্যাগ করলেই নির্গুণস্থ হন। যজ্ঞের এই মহৎ ভাব এতকাল আর্যদের অবদান বলেই ধারণা ছিল। তবে বর্তমানে আর্যপূর্ব ভারতের লোথাল অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে এমন অনেক গৃহের নিদর্শন—যেখানে ছিল রোদে শুকানো ইঁটের যজ্ঞকুণ্ড। এই কুণ্ডে ছাইয়ের সন্ধানও পাওয়া গেছে। এর কাছে যুপের অস্তিত্বেরও প্রমাণ মিলেছে। সুতরাং আর্যদের যজ্ঞের ধারণাও হয়তো আর্যধারণা নয়। তবে অনেকে সিন্ধুসভ্যতার উদ্ভাবকদেরও অনার্য মনে করেন নি, আর্য বলেই মনে করেছেন। ভারতবর্ষে যাজ্ঞিক আর্যরা এদের 'পণি' অর্থাৎ বণিক বলে উল্লেখ করেছেন। এই নতুন চিন্তার সূত্রপাত করেছেন হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. তাঁর 'বৈদিক তত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞান' গ্রন্থে। সেখানে তিনি নিম্নরূপ ডায়াগ্রাম দিয়েছেন ঃ

আর্যজাতি যাযাবর যুগ
সম্প্রদায় বিভাগ
|
আর্য জাতি

অযাজ্ঞিক (যাঁরা অগ্নি পূজারী নন) নহুষঃ	যাজ্ঞিক
অসূর্য্য (ASSyrian)	দেবযাজি
পর্শু (Persian) মাধ্য (Medes) মায়ী (Magi or	পণস্যু বা পণি

যদু তুর্বশ অনু দ্রুহ্য

ঋগ্বেদের রুদ্রের পূর্বসূরীই হলেন হয়তো সিন্ধুউপত্যকার পশুপতি। ঋগ্বেদের রুদ্র অনার্য বা প্রাগার্য ভাবধাবাপুষ্ট। অথর্ব বেদে তিনি ভব বা পশুপতি নাম লাভ করেছেন। এই রুদ্রই দ্রাবিড় ভাষায় শিব। সংস্কৃতে রুদ্র অর্থ রক্তবর্ণ। দ্রাবিড়দের শিব অর্থও রক্তবর্ণ। শিব হল তামিল ভাষায় শিবন (রক্তবর্ণ), শম্ভু বা শেম্বু অর্থ তাম্রবর্ণ। আর্যরা এই দুটি শব্দকে এক করে করেছেন শিবশম্ভু। ঋগ্বেদের রুদ্র গাছ-গাছড়া ও জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে যুক্ত। সিন্ধুউপত্যকার পশুপতি বৃক্ষনিম্নাসনে রয়েছেন। সিন্ধু উপত্যকার কূর্মাসনে উপবিষ্ট পশুপতি শুধু যে ভারতে শৈবসাহিত্য ও তন্ত্রকেই প্রভাবিত করেছেন তাই নয়, পরবর্তী বৌদ্ধধর্মের মূলও হয়তো ছিলেন তিনিই। গৌতম বুদ্ধ এবং এই পশুপতির মূর্তির মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন,

উভয়েরই বসার ভঙ্গী প্রায় একরকম। উভয়েরই মাথার উপরে ত্রিপত্র যুক্ত পাতা রয়েছে। সিন্ধু উপত্যকার পশুপতির মাথার শিরস্ত্রাণে শৃঙ্গযুক্ত এমন এক মুকুট রয়েছে যা তিনভাগে বিভক্ত। এর সঙ্গে নিবিড় মিল রয়েছে সাঁচীস্তূপের উত্তর তোরণ শীর্ষের। এই প্রতীক হয়তো বৌদ্ধ ত্রিত্বে (Trinity)-র প্রতীক, যেমন, বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ। তেমনই সিন্ধুউপত্যকার পশুপতিব শিরস্ত্রাণও হয়তো কোন মহৎ ত্রিত্ব ভাব প্রকাশ করত। হয়তো এই ত্রিত্ব হল শৈব তত্ত্বের কৃষ্ণ শিব, শ্বেত শিব ও শিবলিঙ্গ, অর্থাৎ 'সৎ+চিৎ+আনন্দের প্রতীক।'

সিন্ধু উপত্যকার পশুপতি যেমন পশুপরিবৃত, তেমনই গৌতম বুদ্ধের সিংহাসনের নিচেও রয়েছে এক জোড়া হরিণ। এবং পশু অধ্যুষিত কোন স্থানেই গৌতম বুদ্ধ প্রথম তাঁব বাণী প্রচার করেছিলেন যেমন, মৃগশিখা বনে। পরবর্তীকালে দেখা যায় বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সর্বত্রই পশুর ছড়াছড়ি। অশোকচক্রে বৃষ, অশ্ব, সিংহ সবই আছে। বৌদ্ধদের স্থাপত্যকীর্তিতে স্তম্ভ এক বিরাট ভূমিকা নিয়ে আছে। ঐতিহাসিক A.L. Basham-এর মতে এই স্তম্ভ সিন্ধু উপত্যকার লিঙ্গেরই স্মারক। বৌদ্ধ মতবাদে অহিংসার প্রাধান্য। সিন্ধুউপত্যকাতেও আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে অভাব দেখে মনে হয় যে, এরাও হিংসাকে তেমন প্রশ্রয় দেয়নি।

বৈদিক সাহিত্যের অনেক পূর্বসূরী-ধারণাও এই সিন্ধু উপত্যকাতে ছিল বলে মনে হয়। ঋগ্বেদে জীবাত্ম ও পরমাত্মারূপী দুই পাখির যে গল্প আছে অনুরূপ পাখিযুক্ত সীলমোহরটির অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন—শিলচরের পণ্ডিত মহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাঙ্খ্যার্ণব। হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োতে এমন সীলমোহর পাওয়া গেছে যাতে পক্ষবিস্তৃত ঈগল মস্তিস্ক বামদিকে হেলিয়ে রয়েছে দেখা যায়। মনে হয় তার প্রত্যেকটি ডানার উপর একটি করে সাপ রয়েছে। সম্ভবত বেদের গরুড়-এর পূর্বসূরী এই ঈগলটি। এ-সব দেখে মনে হয় যে, প্রাগ্বৈদিক যুগে এই সিন্ধুউপত্যকাতেই বৈদিক যুগের সকল ধ্যান-ধারণার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল—এবং ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল এখানেই। গ্রীস যেমন ইউরোপীয় সভ্যতার দোল্না তেমনই সিন্ধুসভ্যতাও ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার দোলনা-স্বরূপ।

অবশ্য সেই অনুমান-হাতুড়ির কাঁচামাল সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরাই যাঁরা তাকে অর্থহীন কতকগুলো রেখাতে পরিণত হতে বাধ্য করেছিলেন, অর্থাৎ সেই আর্যেরা।

সুতরাং মূক মহেন-জো-দড়োকে মুখর করতে গেলে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে তার সেই মহান ঐ উত্তরাধিকারীদের কাছেই, অর্থাৎ আর্যদের কাছে। এবং আর্য সাধনার বেদ উপনিষৎ ষড় দর্শনের তত্ত্ব বুঝলে তবেই পরোক্ষভাবে মহেন-জো-দড়োর হৃদয়ে প্রবেশ করা আবার সম্ভব। সুতরাং আসুন, ভারতের সেই সুপ্রাচীন মহা ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করবার জন্য আমরা প্রবেশ করি আর্যদের অধ্যাত্ম সাধনার জগতে—যাকে বলে বৈদিক ভারত, সেখানে, কারণ সেখানেই আবার সুপ্রাচীন ভারতের মূক অধ্যাত্ম সাধনা মুখর হয়ে উঠেছে ক্রমবিকাশের পথে।

ঈশ্বর সন্ধানে আর্যভারতঃ বেদ

ধর্ম বলতে একটা শব্দ উচ্চারিত হলেই, আমাদের মনে, অর্থাৎ ভারতীয় হিন্দুদের মনে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি শব্দ ভেসে উঠে বেদ। বেদ মানে কি? যাকেই জিজ্ঞেস করুন দেখবেন তিনিই বলে দেবেন—জ্ঞান। স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের কল্যাণে দেখবেন বেদের এই শব্দগত অর্থ প্রায় আমাদের সকলেরই জানা এবং সঙ্গে সঙ্গে চর্তুবেদের কথাও দেখবেন অনেকেই আমাদের কাছে গড়্গড় করে বলে যাবেন ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। কিন্তু তারপর? তারপর প্রায়শই অন্ধকার। এই বেদের অবিচ্ছেদ্য অংশই যে ব্রাহ্মণ আরণ্যক, উপনিষৎ সেটাও ভাল করে আমরা অনেকেই বলতে পারব না।

আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, মহাপ্রাচীন পিতৃপুরুষ থেকে যে ধারা চলে আসছে, যাকে আমরা বলি ঐতিহ্য, অন্ধভাবে আমরা তাকেই অনুসরণ করে চলি মাত্র, তার বাইরে আর কিছুই জানতে চাইনা। যদি বলেন, খাঁটি ধর্ম কার বলুনতো? সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন প্রত্যেকটি হিন্দুই বলে উঠবেন আমাদের। কেন? কারণ আমাদের ধর্ম সনাতন। যদি বলেন, ঈশ্বরকে কে দেখেছেন বলুনতো? সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন আমরা জবাব দেব—আমাদের ঋষিরা। প্রমাণ? প্রমাণ আবার কি? প্রমাণ বেদ। বেদ যে স্বয়ং ভগবানের মুখ নিসৃত বাণী! বেদতো মানুষের সৃষ্টি নয়, ভগবানের নিজের সৃষ্টি। তাইতো তাকে বলা হয় অপৌরুশেয়। এর বাইরে? এর বাইরে আর কোন কিছু তাৎপর্য যেন আমাদের জানার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু না, যতটা সহজ বলে ব্যাপারটাকে ভাবা যায়, ততটা সহজ কিন্তু জিনিষটা নয়। ঈশ্বর, ব্রহ্ম, একম অদ্বিতীয়ম প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করে মনের মধ্যে আমরা যে বিশেষ কতকগুলি অনুরণন অনুভব করি, অত সহজে সেই ধ্যান ধারণাগুলির সৃষ্টি হয়নি। সেই গভীরে, নিঃশর্ত সত্যেব উৎসে যেতে হলে সামান্য কিছু কাঠখড় প্রত্যেককেই পোড়াতে হবে। হ্যাঁ, একটু ভালভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে তবেই জিনিসটাকে জানা যায়। ঈশ্বরের সঙ্গে বেদের সম্পর্ক কতটুকু—একটু খুঁটিয়ে নাটিয়ে বিচারবিশ্লেষণ করলে ব্যাপারটাকে ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

বেদ বলতে কতকগুলি স্তোত্রের কথা যে আমাদের মনে হয়, যাকে আমরা সাধারণত বলি মন্ত্র—সেই মন্ত্রের তাৎপর্য বুঝতে হলে একটু বিচার বিশ্লেষণ অবশ্যই করতে হবে।

'সংহিতা' শব্দের অর্থ কি, তা জানেন তো? সংহিতা হল সংকলন। শ্রুতির মাধ্যমে স্বয়ং ভগবানের মুখনিসৃত বাণী আর্য ঋষিরা শুনেছিলেন বলে একটা ধারণা আছে, সে জন্য বেদকে শ্রুতি এবং অপৌরুষেয়ও বলা হয়। এবং যাকে আমরা ঋগ্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা, যর্জুবেদ সংহিতা ও অথর্ববেদ সংহিতা—ইত্যাদি বলে থাকি—তারো পেছনে ইতিহাস আছে। সবগুলোই প্রচলিত অর্থ এবং বিশ্বাস অনুযায়ী অপৌরুষেয় বা শ্রুতি নয়। সত্যদ্রষ্টা ঋষির অনুরণিত-হৃদয়সঞ্জাত যে শ্লোকবদ্ধ ভাবের প্রকাশ, যেটা অপৌরুষেয় বা শ্রুতি হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত, সেই অপৌরুষেয়

বাক্যগ্রন্থির মধ্যেও কি সেই অনন্তস্বরূপের যথার্থ পরিচয় প্রথমদিকে ছিল? না সেই পরিচয়ে মানুষ তখনই পেল যখন নিজের বিশ্লেষণী মনটাকে একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে সচেতন ভাবে সত্যকে ধরবার চেষ্টা করল, তখনই? কিংবা সত্যের স্বরূপ উদঘাটন বেদও করতে পারেনি? কিংবা পেরেছিল অনেক পরে, সেই উপনিষদের যুগে, যখন কাব্যিক হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ততা বাদ দিয়ে দার্শনিক হৃদয়ের লজিক দিয়ে মানুষ পরম সত্যকে জানবার চেষ্টা করেছে তখন? কিংবা এককভাবে আর্যের প্রচেষ্টাতে ব্রহ্মস্বরূপ ধারণা করা কখনই সম্ভব হয় নি? ভারতের প্রাক-আর্য সাধনার ধারা আর্য সাধনার ধারার সঙ্গে যুক্ত হবার পর তবেই তা উপলব্ধি করা গেছে? এ সবের তাৎপর্য বুঝতে গেলে হিসেব নিকেশ সামান্য একটু করতেই হবে আমাদের। সুতরাং আসুন না, সেই হিসেব নিয়েই একটু বসা যাক?

সংহিতা পর্যায়ের বেদ থেকেই আরম্ভ করা যাক প্রথম। 'সংহিতা' অর্থ যে সংকলন সেটাতো নিশ্চয়ই জানেন বা ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছেন। যদি তাই হয়, অর্থাৎ সংহিতা অর্থ যদি সংকলন হয়, তাহলে আমাদের ধরে নিতেই হবে যে, এক সময় বেদের স্তোত্রগুলি সংকলিত ছিল না। যদি সংকলিত না থেকে থাকে, তাহলে কেন তা ছিল না। এই প্রশ্নটিই স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে আসতে পারে। এর সর্ব প্রথম যে উত্তর আমাদের মাথায় আসতে পারে, তা হল এই যে, সংকলনের প্রথম প্রথম কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না বলেই সংকলন হয় নি। আরও একটা কথাও সেই সঙ্গে আমাদের মনে আসা অসম্ভব নয়, যেমন ধরুন—একথাও তো মনে হতে পারে যে, আর্যদের ভাষাজ্ঞান থাকলেও লিপিজ্ঞান ছিল না প্রথম? সেইজন্যে হৃদয়ের স্বতোৎসারিত ছন্দোময় ভাবকে সংকলন করে ধরে রাখা সম্ভব হয় নি। যেদিন লিপি আবিষ্কৃত হল, সেদিনই হয়তো বহু ঋষির অসংখ্য ছন্দোবদ্ধ হৃদয়ের ভাবকে সংকলিত করে আবদ্ধ করে রাখবার ইচ্ছা দেখা দিল আর্যদের মনে। লিপিজ্ঞান যে আর্যদের প্রথম দিকে ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বেদ শিক্ষার ধারা থেকেই। সেভাবে গুরুগৃহে বারবার আবৃত্তির মাধ্যমে বেদের শ্লোকগুলিকে শিষ্যদের স্মৃতিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হত তা দেখে এই মনে হয় যে, লিপির মাধ্যমে স্তোত্রগুলিকে প্রথমটা ধরা যায় নি বলে এই পুনঃপৌণিক আবৃত্তির মাধ্যমে বেদ শিক্ষা দেওয়া হত প্রথম পর্যায়ে। এবং এমনও হতে পারে যে, এই শুনে শুনে বেদের স্তোত্র গুলিকে মনে রাখা হত বলেই বেদের অপর আর এক নাম শ্রুতি। কিংবা সংকলনের প্রয়োজনীয়তার আর একটি ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটও থাকতে পারে। হয়তো এমনও হতে পারে যে, ভারতে আসার পর চতুর্দিকের অনার্য ভাবপ্রবাহ আর্যচিন্তার মধ্যে ঢুকে যাবার চেষ্টা করছিল নানাভাবে [১] নিজেদের নির্ভেজালত্ব রক্ষার জন্য বাধ্য হয়েই তখন আর্যরা মৌল আর্য-আবেগসঞ্জাত বেদের স্তোত্রগুলিকে সংকলনের মাধ্যমে ধরে রাখবার চেষ্টা করে ছিলেন। এবং তারপর থেকেই বেদ হল বেদ-সংহিতা। অপৌরুষেয় বেদের পর্যায়ে সংহিতার কোন প্রশ্নই

ঋগ্বেদ যে নির্ভেজাল আর্যদের দ্বারা রচিত নয় ঐতিহাসিক ডি. ডি. কোশাম্বি তাঁর An Introduction To the Study of Indian History গ্রন্থে প্রমাণ সহ উল্লেখ করে গেছেন।

দেখা দেয় নি। অরণ্যাবৃত ভারতের প্রকৃত পরিবেশ এমনই বিমুগ্ধ করেছিল আর্যদের যে হৃদয়ের আবেগ, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবধারা, আপনা আপনিই গড়িয়ে পড়েছিল বাইরে। বস্তুত একটু যদি বিচার করে দেখবার চেষ্টা করেন, বিশেষ করে আপনি যদি শিল্পী জাতীয় কোন লোক হন, কিংবা আপনাব মধ্যে যদি স্রষ্টার কোন ভাব বিদ্যমান থাকে, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন, যে চিন্তা করে, বিচার বিশ্লেষণ করে শিল্প হয় না। শব্দ গুণে, পয়ার চিন্তা করে, দুটো হয়তো সমিল বাক্য রচনা করা যায়, কিন্তু তা কাব্য হয় না কখনও। রঙের বাক্স হাতে থাকলেই ছবি আঁকা যায় না। ব্যাখ্যাব অতীত এক দুর্বোধ্য জগৎ আছে হৃদয়ের মধ্যে, সেখান থেকে ঝর্ণাধারাব মত সৃষ্টির আবেগ কখন কিভাবে বেরোয়, কোন বিশ্লেষণী মনের পক্ষে হিসেব নিকেশ করে তার সূত্র ধরা কখনও সম্ভব নয়। এবং সেই অর্থে যে-কোন কবির কাব্য বা শিল্পীর শিল্পও অপৌরুষেয়। বেদের প্রথম পর্যায়েব ছন্দোবদ্ধ বাক্যগুলি যে এই জাতীয় অপৌরুষেয় জিনিষ নয় আপনি হলপ করে তা কখনই বলতে পারেন না। বস্তুত অনেকেই মনে করেন, বেদেব প্রথম পর্যায়ের অপৌরুষেয় বাণীগুলি নির্ভেজাল কতকগুলি কবিতার আত্মপ্রকাশ মাত্র। এবং এই কবিতাগুলিই হল ঋগ্বেদের নিজস্ব ঐশ্বর্য।

আপনি ঋগ্বেদ সংহিতার পরবর্তী সংহিতাগুলি—অর্থাৎ সামবেদ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা আব অথর্ববেদ সংহিতার কথা বলবেন তো? সেই জন্যেই বলছি, সামান্য একটু ইতিহাস দরকার। সামান্য কিছু ব্যাকরণও দরকার। তাহলে পরবর্তী বেদগুলি সম্পর্কে আপনার ধারণা পরিষ্কাব হবে।

সংহিতা-ভুক্ত বেদগুলির চরিত্র সম্যক আমাদেব কাছে পবিস্ফুট হলে তবেই ঈশ্বর সন্ধানে বেদের ভূমিকা কি—সেটা আমরা ভাল করে বুঝতে পারব, নয়তো নয়। সুতরাং আপনাব মূল্যবান সময়েব উপব হস্তক্ষেপ করে এই যে অবান্তর ভূমিকা করে যাচ্ছি—সে জন্যে দয়া করে ধৈর্যহীন হবেন না যেন। এবং সত্যকে জানার জন্য ধৈর্যের যে অপবিসীম প্রয়োজনীয়তা—একথা তো সর্বজন ও সর্বকালবিদিত।

হ্যাঁ, একটা কথা জোর করেই আপনাকে বলতে চাই। বেদ মানেই ঈশ্বরেব রসসিক্ত একটা অত্যাশ্চর্য প্রকাশ কিছু নয়। বেদের বহুসংখ্যক স্তোত্র অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য মরমিয়া কবিতায় ঈশ্বরের নৈকট্য অনেক বেশী। বেদের মধ্যে অনেক জায়গাতেই আছে আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্যের প্রকাশ। আবার কোথাও আছে বেদনাদায়ক ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞান বা ভাবের অভাব। আবার এরই মধ্যেই কোথাও আছে আশ্চর্য বিশ্লেষণী মনের স্পর্শ, যা ঐশ্বরিক সত্যকে প্রায় ধরে ফেলেছে যেন। কুসংস্কারের বশে বেদ পাঠ করে প্রকৃতিকে যদি আমরা ঈশ্বর বলে ভাবি তাব চাইতে পরিতাপের বিষয় নেই। নিকৃষ্টমানের ঘৃণ্য আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ দেখে তাকেও যদি অপৌরুষেয় বলে প্রণাম করি, সেটা দুঃখজনক। আবার প্রকৃতিকে যদি ঈশ্বর থেকে পৃথক করে দেখি, সেটাও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এবং এই সবের মধ্য থেকে যদি যাথার্থের অনুসন্ধানই আমাদের কাম্য হয় তাহলে সামান্য একটু বিশ্লেষণের মধ্যে আমাদের আমাদের যেতেই হবে। সুতরাং আসুন না, সংহিতা পর্যায়ের বেদের স্তোত্রগুলোকেই একটু বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করি, সেই যে

ঋগ্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা এবং অথর্ববেদ সংহিতা' এই সব আর কি!

বেদের এই চতুর্বিভক্তি অনেক দিন আগের। অবশ্য বৈদিক স্তোত্রের উৎপত্তি থেকেই যে এই বিভক্তি তা নয়। প্রথমে ছিল শুধু স্তোত্র। তারপর তার হল সংকলন—অর্থাৎ সংহিতা। তারপর বিভাগ। অন্তত আমার তাই ধারণা। পুরাণকে প্রায়ই বিশ্বাস করা যায় না।[১] তথাপি প্রাচীন ইতিহাসের প্রথম লিখিত উল্লেখযোগ্য সূত্র হিসাবে একে অস্বীকার করে চলা যায়না বলে প্রয়োজনে তার সাহায্য নিতেও হয়। অষ্টাদশ পুরাণের বিষ্ণু পুরাণে লেখা আছে—আসল বেদে আছে একলক্ষ পঙ্‌ক্তি। এবং প্রথম থেকেই সেটা চারভাগে বিভক্ত। কিন্তু আমাদের হাতে আজকের যে চতুর্বেদ,—সেটা নতুন করে বিভক্ত হয়েছে পরবর্তীকালে—দ্বাপর যুগে। কালপ্রবাহে পুরনো বেদের চারভাগ একে অপরের মধ্যে জটিল আকারে মিশে গিয়েছিল। তাছাড়া অনেক অংশ তার তলিয়ে গিয়েছিল বিস্মৃতির অতলে। দ্বাপব যুগের প্রারম্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদকে নতুন কবে উদ্ধার কবেন। জটীল বন্ধন খুলে আবার তাকে সেই পুবনো ঢংয়ে চাব ভাগে সাজান-ঋক্, সাম, যজু ও অর্থবন। আবার যাতে লোকে ভুলে না যায় বেদেব কথা, অপোরুষের বেদ যাতে শাশ্বত হয়ে থাকে, সেজন্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তাঁর চার শিষ্যকে চার বেদ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শিক্ষা দেন। যেমন—ঋকবেদ শিক্ষা দেন পৈলকে, আর যজুর্বেদ বৈশম্পায়ণকে; জৈমিনিকে দেন সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ববেদ। বেদকে এইভাবে নতুন করে উদ্ধার কবাব জন্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নাম হয় বেদব্যাস। আর আমরা আজ যে বেদকে জানি তা জানি এই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কাছ থেকেই।

চতুর্বেদের প্রথম বেদই হল ঋক্‌বেদ। আর্যদের প্রাচীনতম—ধর্মীয় ধ্যানধারণার মূল্যবান দলিল। একটু সাহস দিলে একথাও বোধহয় বলা যায় যে—ঋগ্বেদ হল আর্য-মানসের নির্ভেজাল কাব্যিক প্রকাশ।[২] ঋগ্বেদের এই মন্ত্র বা স্তোত্রগুলো আরও মহান হয়ে উঠেছে তখনই যখন এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা। প্রকৃতির বিভিন্নরূপেব আশ্চর্য গুণমুগ্ধ বন্দনা এই মন্ত্রগুলি। আশ্চর্য শিল্প-সুষমার মণ্ডিত। আবার একই সঙ্গে দৃশ্যের পশ্চাতে অদৃশ্য শক্তির উপস্থিতি অনুভব করে কবিতা হয়েছে দেব-বন্দনা। যিনি দান করেন তিনিই দেবতা, প্রকৃতি আশ্রয়কারী মানুষ। সুতরাং প্রকৃতিই হয়েছে নানাছন্দে নানারূপে আর্য ঋষিদের নিকট দেবতা স্বরূপ। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সেই প্রকৃতি-দেবতার উদ্দেশ্যেই মানুষের কবিমানসের কাব্যিক প্রকাশ। কিন্তু প্রকৃতির অসংখ্য প্রকাশকে অসংখ্য দেবতা হিসেবেই শুধু দেখেননি ঋষিরা এরই মধ্যে বহুর ভিতর সর্বপ্রধান এবং সমস্ত কিছুর

১। তবে ইদানিং অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করে জানা গেছে যে পুরাণের গল্পগুলি একধরনের মরমিয়া কাহিনী। এই কাহিনী রূপক। অন্তরালে-রয়েছে বড় বিজ্ঞান। কোয়ান্টাম ফিজিক্সের অর্থপ্রকাশের পর ভারতীয় পুরাণ কাহিনীগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ ধরা পড়েছে।

২। ইদানিং অনুসন্ধানের ফলে এ ধারণা অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। বহু অনার্য ঋষির অবদান রয়েছে ঋগ্বেদ রচনায়। ডি. ডি. কোশাম্বির An Introduction To The Study of Indian History গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পশ্চাতে 'এক' এবং 'অদ্বিতীয়ের' প্রতি অনুসন্ধিৎসাও প্রকাশ করেছেন তাঁরা। বেদসংহিতার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ঋগ্বেদ সংহিতা। পণ্ডিতদের মতে এতে আছে প্রায় সাড়ে দশহাজার পঙ্‌ক্তি। এই পঙ্‌ক্তিগুলোকে ভাগ করে তৈরি করা হয়েছে এক হাজার সতেরটি স্তোত্র। আর এই স্তোত্রগুলি সংগৃহীত রয়েছে দশটি মণ্ডলে। অবশ্য এই মণ্ডলগুলি যে সমানভাবে বিভক্ত তা নয়। এই প্রসঙ্গে তার একটি কথাও অবশ্য মনে রাখবার মত, যেমন, লোকসঙ্গীতেব মত বেদের স্তোত্রগুলি নাম গোত্রহীন কোন অজ্ঞাত লেখকের নয়। একটা জাতীয় চরিত্রের প্রতীক হিসাবে যেমন নাম গোত্রহীন লোকসঙ্গীতের স্থিতি, তেমনই আর্যজাতীয় সামাজিক মানসের প্রকাশ হলেও ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি কিন্তু বেনামী নয়। এতে কোথাও রয়েছে এক একটা বিশেষ বিশেষ পরিবারের অবদান, আবার কোথাও বা নির্দিষ্ট নামেব রচযিতা—যেমন, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ ইত্যাদি।

সামবেদ আব যজুর্বেদ হল প্রকৃতপক্ষে বৈদিক অনুষ্ঠানের জন্য সংকলন। সামবেদের সংকলন হল ঋগ্বেদ থেকে সংগৃহীত সেই সব মন্ত্র—যেগুলিকে বৈদিক অনুষ্ঠানের সময় গানের সুরে আবৃত্তি করা যায়। ঋগ্বেদের মন্ত্রের বাইবে এর নিজস্ব যেসকল স্তোত্র আছে, সে-গুলোব কোন বিশিষ্ট ভূমিকা নেই। অপর পক্ষে যজুর্বেদ কথাব উৎপত্তি 'যজ্' ধাতু থেকে, যার অর্থ হল ত্যাগ কবা। এই ত্যাগ থেকেই যজ্ঞের উৎপত্তি। নিজেব প্রিয় বস্তুকে যজ্ঞের অগ্নিতে দেবতার নিকট ত্যাগ করাই হল যজ্ঞেব মূল লক্ষ্য।[১] কারণ, এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা নিজেকে ত্যাগ করে বা বলি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন মহাজগৎ। এ যে ত্যাগ বা যজ্ঞ সেই যজ্ঞের প্রয়োজনেই যজুর্বেদেব সৃষ্টি— যার মধ্যে আছে যজ্ঞ অনুষ্ঠানেব জন্য নির্দেশ। এর কিছুটা গদ্যে আর কিছুটা ছন্দময় পঙ্‌ক্তিতে লেখা। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট এই বেদ আবার কৃষ্ণ আর শুক্ল যজুর্বেদ নামে দুইভাগে বিভক্ত। কৃষ্ণ যজুর্বেদে আছে মন্ত্রের পাশাপাশি যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য নির্দেশ, আর সেই সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কেও সামান্য কিছু আলোচনা। ওদিকে শুক্ল যজুর্বেদে আছে আবার একই ধরনেব সমালোচনামূলক দুটি সংশোধনী,—যার নাম—মাধ্যনডিন ও কান্ন। মন্ত্রই[২] হল এই বেদের প্রধান বিষয়।

নির্ভেজাল কবি হৃদয়ের প্রকাশ যজুর্বেদে নেই। অনুষ্ঠান যখন বড় হয় হৃদয়ের স্বাভাবিক সরলতা তখন ছোট হয়ে আসে। হৃদয়ের চাইতে অনুষ্ঠান বড় হলে আসে কৃত্রিমতা। সেখানেই মানুষেব বড় রকমের অবক্ষয়।

যজ্ঞাদি এই সব অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে তখনই, যখন মানুষ নিজের স্বার্থের প্রশ্নটাকে বড় কবে দেখেছে। 'দি হোলিম্যান' গল্পে লেখক যেমন দেখিয়েছেন যে, দেওয়া নেওয়ার সম্পর্কে এলেই—অতীন্দ্রিয় জগতের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় মানুষের কাছে, বেদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক এই ধরনেরই।

১। (এই ত্যাগ হল ego ত্যাগ। ঈশ্বর নিজেব অন্তস্থ গুণকে ত্যাগ কবে জগৎ সৃষ্টি করেন। মানুষ নিজেব অহংবোধ ত্যাগ করে সেই উৎসে ফিবে যান। এর নাম ইংরাজিতে Religion. রোমান শব্দ Religare থেকে এর উৎপত্তি, যাব অর্থ Tie back—যেখান থেকে উৎপত্তি সেখানেই ফিরে যাওয়া।)

২। মনন করে যে শব্দ উচ্চারণ করলে 'ত্র' বা তাড়ন করে তারই নাম মন্ত্র।)

কিছু দিয়ে অর্থাৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে দেবতাকে ঘুষ দিয়ে কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই বস্তুত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সৃষ্টি। সেই জন্যেই ঋগ্বেদেব সাব্রিমিটি নেই পববর্তী দুটি বেদে। অতীন্দ্রিযের সঙ্গে যোগাযোগে অনুষ্ঠানের চাইতে হৃদয় বড়। বস্তুত আর্য ধর্মচিন্তার প্রথম পর্যায়ে এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষকে নিজেকেই অতীন্দ্রিয়ের সন্ধানে এগুতে হত, অনুষ্ঠান করে, পুরোহিতের কাছ ব-কল্‌মা দিয়ে কোন ধর্মকর্ম হত না তখন। অনুষ্ঠানসর্বস্ব ক্রিয়াকলাপ হল আর্য ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাপাব—যখন ব্যক্তিমানুয (সম্ভবত সামাজিক কারণেই) অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ অপেক্ষা নিস্প্রাণ অনুষ্ঠানের মূল্যই দিয়েছে বেশী। ব্যাপার হয়তো এই রকম যে, আর্থিক স্বচ্ছলতায ঐহিক সুখ উপভোগেই অধিকাংশ মানুম ব্যস্ত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবী ছাড়া অতীন্দ্রিয় মনোনিবেশ করবার তার সময় নেই। সেই জন্য বিশেষ এক ধরনের ব্যক্তির হাতে (যারা পুরোহিত নামে পরিচিত) তাদের ধর্মকর্ম করবার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন ধনী যজমানেরা। আর পুরোহিতেরাও সম্ভবত এর সুযোগ নিয়ে সহজ সরল ধর্মসাধনাকে জটীল করে তুলেছে নানা অনুষ্ঠান তৈরী করে। ঋগ্বেদের যুগের আর্যরা যেমন হৃদয়ের নির্ভেজাল সততায় প্রকৃতিমুগ্ধ হয়ে এর অন্তরালবর্তী শক্তির উদ্দেশ্যে নিজেদের হৃদয়ের কাব্যময় উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করে নিজনিজ দাযিত্বে আরাধনা করেছে, সাম আর যজুর্বেদের যুগে সেটা আর থাকেনি। অতীন্দ্রিয়েব সঙ্গে ব্যক্তি-হৃদয়ের সরাসরি যোগাযোগ তখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর্যায়ে নেমে এসেছে। নিস্পাপ হৃদযের সহজ দানে প্রীতিমুগ্ধ দেবতার যে বন্দনা করা হত, তার বদলে এসেছে আচার অনুষ্ঠান। যেমন যজ্ঞ, ঘি, মধুতে চলেনি তখন। এসেছে বলি দেবাব চিন্তা।[১] সহজ নিজস্ব উচ্চারণে আর পূজা হয়নি, নিকটকে দূর করবার জন্য এসেছে জটিলতা। যজ্ঞ তখন ব-কলমায়। তাও এক পুরোহিতে হবে না। চাই চার পুরোহিত, যেমন হোত্রী, অধ্বর্যু, উদ্‌গাত্রী এবং ব্রাহ্মণ। যজ্ঞ অনুষ্ঠানে হোত্রী উচ্চারণ করবেন ঋগ্বেদ, অধ্বর্যু অনুধাবন করবেন যজুর্বেদ, উদ্‌গাত্রী দায়িত্ব পালন করবেন সাম বেদের আর সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হবেন তিনিই বেদেব সকল অংশের উপরেই যাঁর আছে সমান দক্ষতা এবং অগাধ পাণ্ডিত্য; এমনকি অথর্ব বেদের উপরও, যে-বেদকে আজও অনেক হিন্দু বেদ বলে স্বীকার করতেই চায় না। অথর্ব বেদের কথায় পরে আসছি তার আগে ব্রাহ্মণ সম্পর্কেই একটু বলেনি। এই ব্রাহ্মণের স্বরূপ বুঝতে গেলে বেদের সংগে আরও কয়েকটা জিনিসকে বুঝতে হবে। এক একটা বেদ যে শুধুমাত্র কিছু স্তোত্র-সংকলন তা নয়। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ব্রাহ্মণ বলে বিশেষ একটি অংশ যুক্ত। ব্রাহ্মণের কাজ হল বেদের স্তোত্র বা মন্ত্রগুলির যাথার্থ ব্যাখ্যা করা এবং যজ্ঞ বিষয়ে বিজ্ঞব্যক্তিদের মন্তব্য ও আলোচনা ধরে রাখা ব্রাহ্মণের আলোচনা মূলত গদ্যে। এই ব্রাহ্মণও একক নয়। বিভক্ত, যেমন (১) মূল ব্রাহ্মণ, যা নাকি বৈদিক অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, (২) আরণ্যক যার

১। বলি দেবার প্রবণতা এই বিশ্বাস থেকে এসেছে যে প্রাণশক্তিতে বিশ্বশক্তি দান করা হলে তা প্রবল হবে এবং মানুষ প্রাণময় প্রকৃতির কাছ থেকে অনেক কিছু পাবে।

মূলবিষয় কর্ম অনুষ্ঠানে দেবতা আরাধনা ও ভিন্ন জগৎ সম্পর্কে চিন্তা এবং (৩) উপনিষৎ অর্থাৎ দার্শনিক অনুসন্ধিৎসায় সত্য সন্ধান। বেদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এই যে তিন খণ্ডে বিভক্ত ব্রাহ্মণ—যে পুরোহিত এই ব্রাহ্মণ বিষয়ে নির্ভুলভাবে জ্ঞাত তিনিই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সমস্ত কার্য পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।[১] যদিও এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অথর্ব বেদের কোন স্থান নেই, তথাপি এই ব্রাহ্মণ অথর্ববেদ সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। এই অথর্ববেদ হল চতুর্বেদের শেষ বেদ, এবং অনার্য ভাবধারায় উদ্বোধিত সেইজন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানে স্থান হয়নি তার। অবশ্য শেষপর্যন্ত অথর্ববেদ আর্য ধর্মগ্রন্থের একটি গ্রন্থ হিসেবে তার মর্যাদা আদায় করে তবে ছেড়েছে এবং sublimity-তে সম্ভবত অন্যসব বেদকেও অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু সে কথা আলোচনা করব একটু পরে। বরং তার আগে প্রসঙ্গত আর একটি আলোচনা শেষ করে নিই—জাত এবং আশ্রম সম্পর্কিত আলোচনা।

ধর্ম অনুষ্ঠানে স্বার্থ সম্পর্কিত প্রশ্ন বড় করে দেখা দেবার ফলেই বোধহয় এক আর্য সমাজে ভিন্ন জাতি বা বর্ণ দেখা দিয়েছে। অথচ প্রাচীন বেদের যুগে আর্যদের মধ্য মানুষে মানুষে জাতি বৈষম্যের কোন প্রসঙ্গ ছিল না। কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে ঋগ্বেদেই জাতি বৈষম্যের প্রথম সূচনা, কারণ ঋগ্বেদের বিখ্যাত পুরুষ সূক্তে চতুঃবর্ণের উল্লেখ আছে। কিন্তু খুব অভিনিবেশের সঙ্গে বিচার করলে সম্ভবত আমরা বুঝতে পারব যে, 'পুরুষ সূক্ত' ঋগ্বেদে অনেক পরবর্তীকালে রচিত স্তোস্ত্র। সুতরাং প্রমাণ হিসেবে তাকে ধরা যায় না। বস্তুত সমাজ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে সঙ্গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরল সমাজে দেখা দিয়েছে জটিলতা, আর সেই জটিলতার ঢেউ ধর্মজীবনের উপরেও ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকেও করেছে জটিলতর। এবং এই জটিল সমাজের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই অবধারিতরূপে দেখা দিয়েছে বর্ণ-বিভেদ। যেমন—জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য, গণনা ইত্যাদি বিষয়ে যে-সকল পরিবার নির্ভুলভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন তাঁরাই দেব-আরাধনার ভার পেয়ে পুরোহিত নামে পরিচিত হলেন, আর এই পুরোহিতদেরও মধ্যে যিনি প্রত্যেক বেদ ও তার ব্রাহ্মণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তিনিই হলেন ব্রাহ্মণ। এইভাবেই দেশরক্ষার ভারপ্রাপ্ত লোক হলেন ক্ষত্রিয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ভারপ্রাপ্ত মানুষ বৈশ্য।

সামাজিক প্রয়োজনে মানুষের মধ্যে এই বর্ণ বিভেদ প্রথমদিকে তেমন জোরদার ছিল না। ওটা সম্ভবত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে অনার্যদের জন্য। ভারতীয় অনার্যরা তাদের রীতিনীতি নিয়ে আর্য সমাজে ঢুকে পড়তে চাইলে নিজেদের নির্ভেজাল পবিত্রতা বজায় রাখবার জন্যই আর্যরা ভয়ানক কঠোর হয়ে ওঠেন এবং ঐ অনার্যদের দূরে রাখবার জন্যই বিজিত সেই দাসদের 'শূদ্র' নামে আর্য বর্ণের সর্বশেষ পর্যায়ে স্থান দেন। অবশ্য এটাকেও এক ধরনের ভাগ্য বলতে বলতে হবে। সমাজের শেষ পঙ্‌ক্তিতেও স্থান না দিয়ে ইংরেজরা যেমন অস্ট্রেলিয়াতে এবং আফ্রিকাতে আদিম অধিবাসীদের ঝাড়-বাঁশে নির্মূল

১। ব্রহ্মজ্ঞানীকে ব্রাহ্মণ বলে না। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়ে যিনি পূজো-আর্চায় নিজেকে নিয়োগ করেন তিনিই ব্রাহ্মণ। নইলে এমন বহু ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ আছেন যাঁরা ব্রাহ্মণ নন। যেমন রাজর্ষী জনক।

করবাব চেষ্টা করেছে, তেমনও তো করতে পারতেন আর্যরা? সম্ভবত আর্য-সমাজে এ দেশীয় অনার্যেরা যদি স্থান না পেত তাহলে বোধহয় অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকাতে ইংরেজদের ভূমিকাতেই প্রাচীন ভারতীয় আর্যরাও অভিনয় করে যেতে বাধ্য হতেন। বর্ণ বিভাগের ফলেই মনে হয় এ-ধরনের কোন ঘটনা ঘটতে পারেনি এবং এরই ফলে আর্য সমাজের বিভিন্ন বর্ণের পক্ষে একই সমাজের বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করে পরস্পর পাশাপাশি থাকা সম্ভব হয়েছে। না হলে হয়তো কুরুক্ষেত্রই হয়ে যেত।

বর্ণের কথা যখন আলোচনা করা গেল তখন সেই সঙ্গে আশ্রমের কথাও সামান্য একটু আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। এ-কথা সর্বজনবিদিত যে, আর্যদের যেমন আছে চর্তুবর্ণ তেমনি আছে চতুরাশ্রম। তাহলে কি এই বর্ণের পাশাপাশিই চতুরাশ্রমের সৃষ্টি হয়েছিল?

চার আশ্রম কি, সবাই জানি আমরা, যেমন—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা জীবন সম্পর্কে বিশেষ ধরনের একটা বোধ থেকে। চতুরাশ্রমের মধ্যে প্রথম দুটো আশ্রম সংসারের জন্য নির্দিষ্ট। বাকী দুটো সংসার থেকে পলায়নের জন্য। সমগ্র আর্য চিন্তায় এই পৃথিবীটাকে একটা পাপস্থল বলে কল্পনা করা হয়নি কখনও এবং সর্বতোভাবে এই পৃথিবীকে পরিত্যাগের কথাও কখনও চিন্তা করেননি আর্যরা। খ্রীষ্টানরা যেমন একটা পাপবোধে ভারাক্রান্ত, আর্যরা সেই পাপবোধ কখনও অনুভব করেননি। দেবতা কখনও ভীতির বস্তু হয়ে দেখা দেয়নি তাঁদের কাছে। সাধারণত ভীতি থেকেই আনুষ্ঠানিক ধর্মের উৎপত্তি। কিন্তু দেবতা সম্পর্কে আর্যদের চিন্তায় সেই ভীতির স্থান ছিল না প্রথম দিকে। নরকের কল্পনাও ছিল অনুপস্থিত। এই পৃথিবী শুধুমাত্র দুঃখের স্থান এ ধরনের কল্পনা ছিল না বলেই বৈদিক আর্যদের প্রার্থনায় ঐহিক সুখ সম্পদ চাওয়াতে কোন দ্বিধা ছিল না। পৃথিবীটা একটা মায়া, শুধুমাত্র দুঃখের স্থান, এমন কল্পনা এসেছে অনেক পরে। সেইজন্য অথর্ব বেদের সৃষ্টি হওয়ার সময় পর্য্যন্তও পৃথিবী থেকে পালিয়ে যাবার মানসিকতা আর্যদের মধ্যে দেখা দেয়নি কখনও।[১] জীবনকে উপভোগ করবার জন্য তৈরি হওয়ার ব্যবস্থা আছে চতুর্বেদের যুগে—যাকে বলে ব্রহ্মচর্য। গার্হস্থ্যাশ্রম সম্পর্কেও নিয়মকানুন আছে। কিন্তু বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের তেমন উল্লেখ নেই। চতুর্বেদের এই কার্যকালটা সেইজন্য বেদের কর্মকাণ্ডের যুগ। আরণ্যক পর্যায়ে জীবনাতীত সম্পর্কে যখন ধ্যান-ধারণার ব্যবস্থা হল এবং সেটা গিয়ে উপনিষৎ পর্বে যখন সত্য সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট চিন্তায় গিয়ে পৌঁছল তখনই শুধু দেখতে পাই বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস সম্পর্কে উল্লেখ। অবশ্য সেজন্য উপনিষদের যুগেই বৈদিক চতুরাশ্রম প্রথা চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল এরকম প্রমাণ হাতে নেই। বেদ উপনিষৎ, এমনকি পুরাণে পর্যন্ত চতুরাশ্রমের তেমন কোন উল্লেখ নেই। উপনিষদে দেখতে পাই ঋষিরা অরণ্যে বাস করছেন। কিন্তু অরণ্যে বাস করা মানেই সংসার থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, তাতো নয়! এখানে থেকেও সংসারের

১। অবশ্য আশ্রম ব্যবস্থা ও ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চিন্তা একথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে চিরন্তন পলাতক ভারতীয়রা কখনই ছিলেন না।

সঙ্গে ক্ষীণ যোগাযোগ রাখা অসম্ভব ছিল না। অর্থাৎ সংসারেও নয়, সংসার সম্পূর্ণ ত্যাগও নয়—এই ধরনের যে অবস্থা তাকেই তো বলে বাণপ্রস্থ! সেই যে পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ! বস্তুত সংসার থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সন্ন্যাসের কথা বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত নেই। সন্ন্যাসের কল্পনাটা হয়তো অনেক পরের।[1] কিন্তু বৈদিক সমাজে সন্ন্যাস সম্পর্কে আগ্রহ দেখা দেবার পরেও যে ঐহিক জীবন সম্পর্কে অনীহা দেখা দিয়েছে তা নয়। তা যদি হত তাহলে ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য পর্ব তেমন একটা সমাদর পেত না আশ্রম ব্যবস্থায়। এই জীবনটা পরিপূর্ণভাবে সত্য নয় বটে, তবে সম্পূর্ণভাবে অসত্য, এ ধরনের কোন চিন্তা আর্যরা কখনই করেন নি। তাই সংসার এবং অতিসংসার এই দুইয়ের ব্যবস্থাই ছিল তাদের মধ্যে। বরং এই আশ্রম-ব্যবস্থা আর্য বর্ণ-ব্যবস্থাকে কখনই কঠোর একটা শ্রেণী সংঘাতের আকার ধারণ করতে দেয়নি, যেমন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ঐহিক প্রশ্নে মানুষের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ দেখা দিয়েছে। খ্রীষ্টান বলুন, মুসলমান বলুন, ধর্মীয় ব্যবস্থায় তাদের মধ্যে মানুষে মানুষে ভেদ নেই বটে, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থায় একটা স্থায়ী-বৈষম্য আছেই—ধনী আর দরিদ্রের বৈষম্য খ্রীষ্টান-মুসলমান কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি। কিন্তু ভারতবর্ষে সামাজিক জীবনে মানুষ কর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হলেও সেটা জীবনের একটা স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন হয়ে থাকতে পারেনি কখনও। ব্রহ্মচর্যে যখন শিক্ষালাভের পর্যায়, তখন গুরুগৃহে রাজার ছেলে আর প্রজার ছেলের মধ্যে পার্থক্য ছিল না কোন। পার্থক্য কর্মভিত্তিক। গার্হস্থ্য জীবনে। কিন্তু সেটাও চিরন্তন কিছু নয়। সংসারের শ্রেণী-বৈষম্যের নিয়মকানুন ভাঙতে আরম্ভ করেছে বাণপ্রস্থ পর্বেই, এবং সন্ন্যাস পর্বে মানুষে মানুষে আর কোন পার্থক্যই নেই। নেই ধনী-দরিদ্রে, মুচি-ব্রাহ্মণে, কারুর মধ্যেই। বিবেকানন্দের সেই চিত্রটা মনে করতে পারেন এই প্রসঙ্গে—যখন সন্ন্যাস নিয়ে পরিব্রাজকের বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভারতের এ-প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে তখন পথিমধ্যে কোথাও একদিন তামাক খাবার ইচ্ছে হল। এবং একজন মেথরের কাছে হুকো প্রার্থনা করেও সংসার মানসের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে যেতেই যেই মনে পড়ল যে, তিনি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর কোন জাত নেই, তখুনি আবার এগিয়ে এসে সেই হুকোতেই তামাক খেলেন। আর্য 'বর্ণ' এবং 'আশ্রম' এ-দুটিই সারা পৃথিবীতে বহু নিন্দিত ব্যাপার বটে কিন্তু জীবনের এমন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে, কোন মানুষের মধ্যে কখনও হয়নি। বর্ণ ব্যবস্থা দুনিয়াব্যাপী সবার কাছেই ঘৃণ্য, কিন্তু শ্রেণী বৈষম্য যে আরও ঘৃণ্য লোকে সেটা বুঝতে চায় না। বর্ণ-বৈষম্য সাময়িক, কিন্তু শ্রেণী বৈষম্য একটা চিরন্তন ব্যাপার। আশ্রম সম্পর্কে পশ্চিমী দুনিয়ার অনীহার ব্যাপার এই যে, এতে নাকি জীবনকে অস্বীকার করা হয়েছে-বিশেষ করে সন্ন্যাস পর্বে। সেজন্য সোয়াইৎসারের মত বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিকও ভারতীয় জীবনধারাকে life negation বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জীবন এবং অনন্ত জীবনের মধ্যে এমন সুসম ব্যবস্থা অন্য

১। অনেকের ধারণা সন্ন্যাসাশ্রমের চিন্তা আর্যদের মনে আসে প্রাগার্য ভারতের এক ধরনে ভ্রাম্যমান সাধুদের দেখে। সম্ভবত এঁরা শৈব সন্ন্যাসী ছিলেন।

কোন মানুষ কোথাও কখনও করতে পারে নি। বস্তুত ভারতীয় জীবনে প্রাক-আর্য যুগ থেকেই এই সুসম জীবনের ধারা বয়ে চলেছে। মানুষে মানুষে পার্থক্য তো দূরস্থান, ভারতবর্ষ দুইটি প্রাণের মধ্যেও কখনও ক্ষীণতম পার্থক্য অনুভব করেনি। তাই মহেন-জো-দড়োতে মনুষ্য-জীবনের পাশে পশু পেয়েছে সম্মানের আসন। আর্যমন্ত্র সমস্ত প্রাণের কল্যাণের জন্য মন্ত্র।

আপনি বোধহয় বিরক্ত হচ্ছেন? অবশ্য বিরক্ত হওয়াটা তেমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। আমাদের আলোচনার বিষয় হল ঈশ্বর। বর্ণ, আশ্রম, চতুর্বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক বা উপনিষৎ নয়। এ-সব তো বিশেষ জাতির মানসিক চিন্তার একটা অঙ্গ মাত্র। এ সব হল বহিরঙ্গের আলোচনা। এতে সত্য কোথায়? ধৈর্য হারাবেন না। অঙ্গের বন্ধনেই তো অঙ্গাতীত থাকেন! বহিরঙ্গ ভেদ করে অন্তরঙ্গে পৌঁছুতে না পারলে সত্যকে জানা যাবে কি করে? অঙ্গ হল সিঁড়ি, ছাদে ওঠাব জন্য; ধাপগুলো ভাঙলে তবেই না অনন্ত অম্বর চোখে পড়ে! সুতরাং আর একটু ধৈর্য ধরুন। ঈশ্বর এবং অনীশ্বর দুটি নিয়েই সত্য। অনীশ্বরকে ভেদ করে যেতে দিন আমাকে। আরও সামান্য একটু বাকী।

হ্যাঁ যা, আমাদের আলোচনা হচ্ছিল চতুর্বেদ নিয়ে—ঋক, সাম, যজুর্বেদ পর্যন্ত হয়েছে। এখনও বাকী অথর্ব বেদ। অনেকে হয়তো অদ্যাবধি বেদ বলেই তাকে স্বীকার করতে চায় না। অথর্ব বেদে নাকি অনার্য অনাচারেরই প্রাধান্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলছি—এই অথর্ব বেদে এসেই আর্য সমাজের বুদ্ধির বিকাশ এমন এক মহান আকার ধারণ করেছে যে, অনার্য বলে উপহাস করে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার কোন উপায় নেই। বরং নীরবে মনের কাছে স্বীকার করে নিতে হয় যে, অথর্ব বেদ যদি অনার্য আচার-বিচারের সংকলন, তবে সেই অনার্যদের মধ্যেই ছিল মহান এক উচ্চ কোটির অনুসন্ধিৎসা—যা নাকি আর্যদের ব্রহ্মস্বরূপের সন্ধান দিতে ভয়ানক ভাবে সাহায্য করেছে। সেই যে আগে বলেছিলাম হরপ্পা-মহান-জো-দড়োর প্রত্নতাত্ত্বিক নীরব সাক্ষ্য দেখে, যে, অনার্য সাধনার উত্তরাধিকারই আর্যদের করে তুলেছে মহান ও মহীয়ান সে কথাই স্বীকার করে নিতে হয়। একটু ধৈর্য ধরুন, ব্যাপারটাকে ভাল করে একটু ব্যাখ্যা করলেই সব বুঝতে পারবেন।

ঋগ্বেদের হৃদয়ের বিশাল ব্যাপ্তিকে সাম আর যজুর্বেদ আনুষ্ঠানিকতার সংকীর্ণ পর্যায়ে টেনে নামিয়েছিল। কিন্তু অথর্ব বেদের উৎপত্তি সাম এবং যজুর্বেদের পরে হলেও—যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের ব্যাপারে এর ব্যবহার অত্যন্ত কম। অবশ্য অথর্ব বেদের শেষ পর্বে—ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য দু-একটা গান এবং মন্ত্রের ব্যবস্থা যে না নেই তা নয়। কিন্তু ওটা তার আসল চরিত্র নয়। তিন বেদের কৌলিন্যে অথর্ব বেদকে স্থান দেবার জন্যই বোধহয় এ সব করা হয়েছিল। সাম ও যজুর্বেদ যদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টি, অথর্ব বেদের স্রষ্টা সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ। অধিকাংশেরই ধারণা প্রাক্ আর্য ভারতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের ধ্যান ধারণার আশ্রয়স্থল হল এই অথর্ব বেদ। অথর্ববেদের বিষয়বস্তুকে যদি এইভাবে ব্যাখ্যা করি তাহলে বোধহয় তার চরিত্র স্পষ্ট হয়, যেমন—অথর্ব বেদে এসে ঋগ্বেদের মন্ত্র হয়েছে বিভ্রান্ত,

দেবতার কল্পনা হয়েছে বিশৃঙ্খল, দেখা দিয়েছে নতুন দেবতা, আর্যচিন্তার কাছে অপরিচিত নরকের কল্পনা এসেছে, বহু দেবতার পরিবর্তে এসেছে 'এক'-এর কল্পনা মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ দুইয়েরই জন্য জাদুমন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। শত্রুর ক্ষতির জন্য এসেছে তুকতাক, জাদুমন্ত্র। দেখা দিয়েছে সন্তান লাভের জন্য, দীর্ঘ জীবনের জন্য, শত্রুর দুষ্ট মন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য। বিষক্রিয়া ও অন্যান্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এসেছে সর্প-বন্দনা, নিদ্রা-বন্দনা, কাল-বন্দনা, নক্ষত্র-বন্দনা,[১] এইসব। অর্থাৎ অদ্যাবধি ছোটলোক ও ছোটজাত বলতে যাদের আমরা বুঝি, আজও বশীকরণ মন্ত্র আওড়ায়, বাণ মারে, ভূত ছাড়ায়, ঝাড়ফুঁক, তুক্‌তাক করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সেই বিশ্বাসই সংকলিত হয়ে স্থান লাভ করেছে অথর্ব বেদে' ঋগ্বেদে, সামবেদে, যজুর্বেদে আর্য-ঋষিরা প্রকৃতি বন্দনা, দেবতা বন্দনা, অতীন্দ্রিয় শক্তির পূজা করেছে কখনও কখনও আপন বিমুগ্ধ হৃদয়ের আবেগে, কখনও বা স্বার্থ চিন্তায়, কিন্তু নীচু মানসিকতার পরিচয় দেখায়নি যেমন দেখা দিয়েছে অথর্ব-বেদে। আকাশ থেকে দৃষ্টি সম্ভবত এত নীচুতে মাটিতে নামায়নি তাঁরা। তাঁদের লক্ষ ছিল দেবতা, ভূত্‌পেত্নী নয়। দেবতার সঙ্গে ভক্তির সম্পর্ক ছিল প্রাক অথর্ব বৈদিক যুগের আর্যদের। দেবতা দান করতেন চাইবার আগেই আপন ইচ্ছাতে, কিন্তু অথর্ব বেদে ভক্তির স্থান নিয়েছে কুসংস্কার, দেবতার কাছে থেকে তুকতাক করে অভিলিপ্সিতকে পাবার প্রচেষ্টা এখানে। প্রেমে ভালবাসায় অতি-প্রাকৃতকে অধিকার করবার বাসনা। তপস্যা দ্বারা প্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টা আছে এখানে, যৌগিক প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের। এখানেই দেখতে পাই দেহকে কষ্ট দিয়ে কঠোর কৃচ্ছ সাধনের ব্যবস্থা, যেমন, পঞ্চাগ্নির মধ্যে উপবেশন, একপদে অবস্থান, উর্দ্ধবাহু হয়ে অপেক্ষা, এমনি সব। এর উদ্দেশ্য অতি প্রাকৃতের সঙ্গে ভালবাসা নয়, প্রেম নয়, দেবতাকে ভক্তিতে নয়, কৃচ্ছ সাধনের দ্বারা প্রকৃতিকে জয় করে অতি-প্রাকৃতের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা; প্রকৃতিকে জয় করে দেবতাকে বশীভূত করা।[২]

আশ্চর্য একটা সাদৃশ্য আছে এখানে হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর সঙ্গে। যৌগিক প্রক্রিয়ার নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োতে সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অথর্ব বেদের যুগে এই যে কৃচ্ছ্র সাধনার ব্যবস্থা সেটা যদি অনার্য ব্যবস্থা হয়, তাহলে সেটা কি এসেছে মহেন-জো-দড়ো থেকে? ঋগ্বেদে রুদ্রের উল্লেখ আছে। ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ দেবতা হিসেবে তিনি ধ্বংস করছেন পশুকুল। কিন্তু অথর্ববেদে এই সংহারক রুদ্র হয়েছেন পশুপালক পশুপতি। Lord of Beasts অথবা পশুপতির চিত্র দেখেছি হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োতে। তিনিই কি তবে আবার ফিরে এসেছেন অথর্ববেদে?

১। এক্ষেত্রে মেসোপোটেমিয় প্রভাব থাকার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ জ্যোতির্বিদ্যা মেসোপোটেমিয়দের রক্তের সঙ্গে জড়িত ছিল।

২। এই জন্যে অথর্ববেদের সাধনা বর্তমান ভারতের তান্ত্রিক শক্তি সাধনার মত—যেখানে বলা হয়েছে সংগ্রাম দ্বারা শক্তি অর্জন করতে হবে—'আম মা সাধন সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে'—রসিকচন্দ্র রায়।

পশুপূজা স্থান পেয়েছে হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োতে, কুঁজওয়ালা ষাঁড়ের ছড়াছড়ি সেখানে।

অর্থাৎ, তাহলে ব্যাপারটা এই রকমই দাঁড়ায় যে, অথর্ববেদ প্রভাবিত হয়েছে অনার্য ভাবধারায়, এবং সেই অনার্য ভাবধারায় সুস্থতা, সভ্যতার স্থান নেই। সেটা সম্পূর্ণই একটা অপসংস্কৃতি। তাহলে কি প্রথমেই যে কথাটা বলে এসেছি তা মিথ্যে? হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর ধর্ম সাধনায় উচ্চকোটীর স্থান নেই? সবটাই একটা অজ্ঞতা, অন্ধতার ব্যাপার? কিন্তু, না মজার কথা আরও আছে অথর্ববেদে। সেইটেই ভাব্বার বিষয়। এবং সেই সঙ্গে ভাব্বার বিষয় এই যে, অথর্ববেদে যে একটা অপসংস্কৃতির বিস্তাব দেখতে পাই সেটা কি সত্যই অনার্যদের? কিংবা অনার্য সংস্কৃতিব গুহ্যতত্ত্ব আর্য-মানসে ধরা পড়েনি বলেই তা দেখা দিয়েছে বিকৃত আকারে? তা যদি না হয়, তাহলে অথর্ববেদের মধ্যেই এত বড় একটা বৈসাদৃশ্য দেখব কেন?

জানেন তো, অথর্ববেদের বিষয়বস্তু সংবলিত যে গ্রন্থ, তার পুরানো নাম অথর্ববেদ নয়? এর পুরানো নাম 'অথর্বাঙ্গিরস' অর্থাৎ দুই ভিন্ন ভিন্ন ঋষির সৃষ্টি এই চতুর্থ বেদ। অগ্নি-পূজারী এই দুই পুরোহিতের একজনের নাম—অথর্বন, আর একজনের নাম অঙ্গিরস। কল্যাণের জন্য যে জাদুমন্ত্র, তুক্‌তাক্, তাঁব স্রষ্টা অথর্বন। আব দুষ্টমন্ত্র এবং ক্ষতিকর তুক্‌তাকের সংকলয়িতা অঙ্গিরস। কল্যাণের জয়ই শেষপর্যন্ত হয়েছে। চতুর্থবেদ অথর্বনেব নামে পরিচিত হয়েছে, অঙ্গিরসের নামে নয়।

কে এই অথর্বন, জানি না।[১] কিন্তু তিনিই রেখেছেন সংহিতার যুগে বৈদিক চিন্তার অত্যুৎকর্ষের পরিচয়। দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা প্রথম থেকেই জড়িয়ে ছিল অথর্বনের সঙ্গে। অথর্বনের বংশেই দেখতে পাই সেই বিখ্যাত বৈদিক উক্তি, যা নাকি বৈদিক বহু-দেবতার দায়দায়িত্ব থেকে আর্যদের মুক্ত করেছে। দীর্ঘতমদের রচিত সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে করুন না—সেই যে, অনেক দেবতা তোমরা জেনেছ বটে কিন্তু সত্যিই তাঁরা অনেক নন। একেরই বহুপ্রকাশ মাত্র—একম সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।

কই আগে তো দেখতে পাইনি আর্য চিন্তাতে এই 'এক' সম্পর্কে এমন উক্তি? যে অথর্বন অনার্য সংস্কৃতিকে স্থান দিয়েছেন অথর্ববেদে, প্রাক আর্য-ভারতের সংস্কৃতির হয়তো তিনিই ধারক। কিংবা তিনিই সত্য বুঝতে পেরেছিলেন অনার্য-ভারতের অধ্যাত্ম চিন্তার যথার্থ স্বরূপ। বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিংসা নয়, কল্যাণেরই সাধনা করেছেন অনার্যরা। কুসংস্কার নয়, বিজ্ঞানেরই পূজা করেছেন তাঁরা। পশুতে বৃক্ষে, সর্পে, জীবনে, প্রেমে এবং কামে সর্বত্রই অতিপ্রাকৃত এক জীবনের ব্যাপ্তি দেখতে পেয়েছিলেন তাঁরা। অঙ্গিবস হয়তো বুঝতে পারেন নি অনার্য সাধনার সেই দিকটি। তাই অথর্ব বেদে তাঁর নিজের অংশে অনার্যদের সুকৃতিকে ধরে রাখেন নি তিনি। ধরে রেখেছেন তার বিকৃতিকে। মিস মেও-এর ভারত দর্শনের মতো, গান্ধীজী

১। এরা কি ইরাণে বসবাসকারী আথ্রবন গোষ্ঠিভুক্ত যারা ইরাণের প্রাচীন ভারত সীমান্তে বাস করত?

যার বই পড়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, ইনি ড্রেন ইনস্পেক্টর। অঙ্গিরস হয়তো সেই ড্রেন ইনস্পেক্টর অনার্য ভারতের সাধনার।

সম্ভবত অনার্য চিন্তার মহান দিকটা যথাযথ চিত্রিত হয় নি অথর্ব বেদে। কিন্তু যতটুকু হয়েছে তাকে অবহেলা করার হেতু নেই কোন। ঋক, সাম ও যজুর্বেদের সঙ্গে অথর্ববেদের সংঘাত নেই। একে অপরের পরিপূরক বলে ধরে নেওয়াই ভাল। ঋক, সাম ও যজুর্বেদ যদি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে চিন্তা করেছে অর্থাৎ পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে, অথর্ব বেদ চিন্তা করেছে তার ইহলৌকিক দিক নিয়ে। তিন বেদের বিষয় হল দেবতা ও যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান, আব অথর্ববেদের বিষয় হল মানুষ, তার কল্যাণ, বিপদ মুক্তি, রাজ্য, রাজনীতি এই সব। কালিদাসের রঘুবংশের নায়ক দিলীপ যখন রাজ্য বাজনীতিকে নিয়ে পরামর্শ করেছিলেন তিনি এমন এক গুরুব কাছে গিয়েছিলেন যিনি ছিলেন অথর্ববেদের আধার অর্থাৎ আথর্বনিধি। অথর্ববেদ অর্থাৎ অনার্য বিশ্বাসের আর্য-সংকলন বৈদিক সাধনাকে ছোট তো করেইনি কোন মতে বরং তাকে আরো করেছে উজ্জ্বল, মহান, মহীয়ান। ঋক, সাম ও যজুর্বেদের অভাবকেও পূর্ণ করেছে অথর্ববেদ। তিন বেদ সত্য সম্পর্কে আগ্রহ দেখায়নি তেমন ভাবে যেমন দেখিয়েছে অথর্ব বেদ। অথর্ববেদের সাধনা সেই দার্শনিক হিউমের সাধনার মত, যার মূল লক্ষ্য—Truth without God. তাই Absolute নিয়ে অথর্ববেদের যত ভাবনা অন্যান্য বেদে তা নেই। আনুপাতিকভাবে বৈদিক স্তোত্রগুলির সংখ্যা যদি বিচার করি তাহলে দেখব, অথর্ববেদের যত সংখ্যক স্তোত্রে দার্শনিক মানসিকতা বিদ্যমান আছে, ঋগ্বেদে পর্যন্ত তা নেই। অপর দিকে ঋগ্বেদে যতখানি দার্শনিক স্তোত্র আছে তার প্রায় সবগুলিই অথর্ববেদে বিদ্যমান। এর পরেও অথর্ববেদের সংকলনকে কি অনার্য কুসংস্কারের ধারক বলে ঘৃণা করবেন আপনি ?

আর বোধহয় ধৈর্য নেই আপনার? এ পর্যন্ত ঈশ্বর সম্পর্কিত কোন উল্লেখই নেই আলোচনাতে, তা দেখে বোধহয় বিরক্ত হচ্ছেন খুব? আগেই তো বলে দিয়েছি যে, বৈদিক ঈশ্বর সাধনার-স্বরূপ বুঝতে হলে তার আঙ্গিক সম্পর্কে ধারণা থাকা চাই প্রথম। সুতরাং সংক্ষেপে এ হল তার একটা রূপরেখা মাত্র। সত্যি কথা বলতে কি, বৈদিক ঈশ্বর সাধনার ধারা বুঝতে হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আরও একটু বেশী পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল ব্রাহ্মণ আরণ্যকের বিষয়ে আলোচনা। প্রয়োজন ছিল বেদাঙ্গের একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয়। তাহলে মন্দিরের চাইতে মন্দির গাত্রের অলংকরণ বেশী হয়ে যাবার ভয়ে সেদিকে আর অগুচ্ছি না। ব্রাহ্মণ আরণ্যক সম্পর্কে সামান্য পরিচয় দেওয়া যাবে ঈশ্বর বা সত্য সম্পর্কে উপনিষদের সাধনা আলোচনা করব যখন, তখন। আপাতত এসব অলংকরণ বাদ দিয়ে সংহিতার যুগে বৈদিক ভারতের ঈশ্বর সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার পর্যায়েই প্রবেশ করা যাক। সংহিতার যুগে আর্যরা কি ঈশ্বর বা সত্য সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করেছিলেন ?

বেদে অতি-প্রাকৃতের সাধনায় আছে দুটো পদ্ধতি। একটির নাম কর্মকাণ্ড আর একটির নাম জ্ঞানকাণ্ড। বেদের মন্ত্র অথবা স্তোত্র অধ্যায়—যেগুলো সংকলিত হয়ে হয়েছে সংহিতা—সেই সংহিতার অধ্যায় বস্তুত তার কর্মকাণ্ডের অধ্যায়—যার সাহায্যে পালন করা হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান অর্থাৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান। যজ্ঞ কুণ্ডের চারধারে পুরোহিতেরা বসেন মন্ত্র উচ্চারণের জন্য। যিনি প্রধান পুরোহিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত তিনি বসেন যজ্ঞ কুণ্ডের উত্তর ধারে, তাঁর দক্ষিণ পাশে বসেন উদগাতৃ, বামপাশে হোতৃ, আর মুখোমুখি বিপরীত পার্শ্বে বসেন অধ্বর্যু। ব্রাহ্মণ সমস্ত কিছু পরিচালনা করেন আর সেই সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করেন অথর্ব বেদের (অনার্য ভাবধারায় উদ্বোধিত এই অথর্ব বেদের মন্ত্র উচ্চারণের দায়িত্ব যে যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের উপর অর্পিত হয়, এর কারণ কি এই নয় যে, বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ লুকিয়ে আছে অথর্ব বেদেই? অথচ প্রথম দিকে এই অথর্ব বেদকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে স্থানই দেওয়া হয়নি।) হোতৃ আবৃত্তি করেন ঋগ্বেদ, উদগাতৃ সামবেদ, আর যজুর্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দান করেন অধ্বর্যু। এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সংহিতা পর্বের মন্ত্র উচ্চারণ করে অতি-প্রাকৃতকে আহ্বান করে মানুষের উদ্দেশ্য সিদ্ধির যে উপায়, তাকেই বলা হয় কর্মকাণ্ড। এক সময় প্রাচীন ভারতে অতি-প্রাকৃতের এই সাধনায় সংহিতার এই কর্মকাণ্ডের মূল্য এত অপরিসীম ছিল যে, বৈদিক পণ্ডিত মীমাংসকেরা বেদের এই কর্মকাণ্ডের বাইরে অন্য কিছুকে ধর্মীয় মর্যাদা দিতেই রাজী ছিলেন না। কর্মকাণ্ডের সাধক যারা তাঁদের বিশ্বাস—'এই কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগের সুযোগ আসবে মানুষের। যজ্ঞ কুণ্ডের অগ্নি সহস্র জিহ্বায় হবি গ্রহণ করে উর্ধলোকে দেবতাদের নিকট তা পৌঁছে দেবেন এবং পরিতৃপ্ত দেবতাদের আশীর্বাদে মানুষ লাভ করবে স্বর্গলোক। পার্থিব কল্যাণ ও স্বর্গীয় আনন্দ লাভের জন্য বেদের এই কর্মকাণ্ডের জন্যই তৈরী হয়েছে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও নির্দেশিকা। ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের অন্তর্গত আরণ্যকে শুধুমাত্র পার্থিব প্রক্রিয়ার বাইরে আন্তর সাধনাকেও অতি-প্রাকৃতের আরাধনায় স্থান দেওয়া হলেও কর্মকাণ্ডের পরিধির বাইরে সে যেতে পারেনি। সংহিতার কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যকের উপাসনাকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল অভ্যুদয় অর্থাৎ পার্থিব কল্যাণ ও স্বর্গীয় আনন্দ। কিন্তু কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ ও নির্দেশিকা ব্রাহ্মণের শেষপর্বে সত্যের আগ্রহ যখন জাগ্রত হয়েছে অত্যন্ত তীব্রভাবে, মানুষের মধ্যে তখনই অতি-প্রাকৃতের সাধনার প্রক্রিয়া গেছে পাল্টে। অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে আর্যরা দিয়েছেন অন্তরের মধ্যে ডুব। সত্যকে লাভ করবার বাসনা দেখা দিয়েছে জ্ঞানের মধ্যে। সুতরাং উপনিষদের সাধনা জ্ঞানেব সাধনা, বৈদিক অতি-প্রাকৃত সাধনায় যার নাম—জ্ঞানকাণ্ড। বৈদিক কর্মকাণ্ড যদি উপাসনা করেছে অভ্যুদয়ের, জ্ঞানকাণ্ড করেছে নিঃশ্রেয়স-এর। কিন্তু নিঃশ্রেয়স-এর সাধনা পরবর্তীকালের। আর্যদেব প্রথম সাধনাই ছিল কর্মকাণ্ডের সাধনা। এই কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কি ঈশ্বর সম্পর্কিত সত্য ধারণার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল? সেই কর্মকাণ্ডের পর্যায়ে আর্যদের ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণার কথাই প্রথম আলোচনা করা যাক।

সংহিতার যুগে বৈদিক সাধনায় অতিপ্রাকৃতের সন্ধান চলেছে প্রকৃতির

মধ্য দিয়েই প্রথম। স্তরে স্তরে সেটা উন্নীত হয়েছে প্রকৃতির বহুদেবতা শেষে এক-দেবতায় এবং সর্বশেষে একম অদ্বিতীয়মে—ইংরেজীতে যাকে বলা যায় Naturalistic Polytheism, Monotheism এবং Monism.

পণ্ডিত ব্যক্তিদের ধারণা, প্রাচীন ভারতের মহান গাম্ভীর্য এবং সৌন্দর্য এত বিমুগ্ধ করেছিল আর্যদের যে, অভিভূত হয়েছিলেন তাঁরা। সীমার মধ্য দিয়ে অসীম তাই অসংখ্য বিচিত্র রূপকে অসংখ্য দেবতা জ্ঞানে শত সহস্র স্তোত্রে বন্দনা করেছেন স্বতস্ফূর্ত কাব্যের উচ্ছ্বাসে। অসীম শূন্যে হিমবিজড়িত হিমশৃঙ্গ. নিম্নে নিবিড় সবুজ তৃণাস্তরণ, অসংখ্য স্রোতস্বিনী, তিন দিক ঘেরা সুনীল জলধি, ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন—ডি. এল রায়ের সেই কবিতার ভাষায় 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাক তুমি' মুগ্ধ করেছে। আর যতই মুগ্ধ হয়েছে তাঁরা, ততই ভেবেছে, প্রকৃতির এই অসীম সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের অন্তরালে রয়েছে অতিপ্রকৃত কোন এক শক্তি এবং তাকেই দেবতারূপে কল্পনা করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছে সঙ্গে সঙ্গে। এইভাবেই অসংখ্য প্রকৃতিদেবতার উদ্ভব।

জানি না এ কথা সত্য কিনা। প্রাচীন ভারতে যে বিস্ময়কর বিশাল প্রকৃতির ছায়া বিমুগ্ধ করেছিল আর্যদের, আমেরিকা প্রবাসী ইউরোপীয়েরাও তো সেই বিশাল প্রকৃতির স্পর্শই পেয়েছিল নতুন মহাদেশে? তবে প্রকৃতির ছায়ায় ভারতে যে বৈদিক স্তোত্রের উৎপত্তি হল আমেরিকাতে তা হল না কেন? প্রকৃতি কি অতি-প্রাকৃতের তোরণ হতে পারে সব সময়? জানি না। অতিপ্রাকৃতের সাধনায় মানুষের আন্তব রহস্যের মূল হয়তো কোনদিনই ধরা সম্ভব নয়। তবে এ কথা সত্য যে, ভারতীয় আর্যেরা প্রকৃতি-দেবতার সাধনা দিয়েই অতিপ্রাকৃতের সন্ধান আবম্ভ করেছিলেন প্রথম।

প্রকৃতির সেই অংশই মানুষকে আকর্ষণ করে প্রথম. যে অংশ আপন দীপ্তিতে উজ্জ্বল, ঝলমলো। তাই সূর্য মিত্ররূপে আরাধনা লাভ করেছেন, সুনির্মল নীল আকাশ বরুণরূপে (মূল শব্দ বর অর্থাৎ যা আচ্ছাদন করে। বর থেকে বরুণ) ও দ্যু রূপে। শ্যামশষ্পাচ্ছাদিত শ্যাম বসুন্ধরা এসেছেন পৃথিবী রূপে, উজ্জ্বল অগ্নি হয়েছেন দেবতা। 'দেব' শব্দের মূল অর্থ হল দীপ্তি, তাই প্রকৃতির উজ্জ্বল অংশ দেবতা হয়ে দেখা দিয়েছে আর্যদেব কাছে। এবং এই উজ্জ্বল অংশের কাছ থেকে দান আশা করে তাকে দাতার আসনে বসিয়ে 'দেব' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ সৃষ্টি করেছেন আর্যরাই, অর্থাৎ যিনি দান করেন তিনিই দেব।[১]

পণ্ডিতদের ধারণা—বেদ সৃষ্টি হবার আগেই প্রকৃতির উজ্জ্বল অংশ পূজা পেয়েছেন দেবতারূপে আর্যদের কাছে। মিত্র, বরুণ, দ্যু, পৃথ্বী এবং অগ্নি আর্যদের প্রাক-বৈদিক যুগের দেবতা।

ঋগ্বেদে যখন রচিত হল স্তোত্র, সেই স্তোত্রগুলি সংকলিত হয়ে হল সংহিতা, তখন এই প্রাক-বৈদিক দেবতারাই অতিপ্রাকৃতের ছোঁয়া নিয়ে আরো মহীয়ান হয়ে উঠলেন আর্যদের কাছে। বৈদিক ঋষি যখন আরো মহীয়ান হয়ে

১) আর্যরা যখন ইরানে ছিলেন এবং আদি পর্বে ভারতে, তখন কিন্তু দেব বা দেবতা তাদের কাছে দানব হিসেবেই চিহ্নিত ছিল। আর অসুর বা অসুর ছিল প্রাণপদ দেবতা। পরে যে কারণেই হোক হয়ে গেছে উল্টো রকম।—বাঙ্গালা ভাষা পার্বতী ভট্টাচার্য।

উঠলেন আর্যদের কাছে। বৈদিক ঋষি যখন আরো নিবিড় চোখে তাকালেন উর্ধ্বেদ্যু (আকাশ) এবং নিম্নে পৃথ্বীর (বসুন্ধরার) দিকে, এক অতীন্দ্রিয় অসীমতায় হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল তাঁর, সীমার বাইরে এক অসীমতার ইঙ্গিত পেয়ে গেলেন তিনি। প্রাক্তন ধারণা ভেঙে গিয়ে অসীমের দ্যোতনা দেখলেন তিনি অদিতির মধ্যে। যা সীমাবদ্ধ তাই দিতি। যা সীমাহীন তাই অদিতি। না, উর্ধে সীমাহীন যে আকাশ, সেটাও তাঁর কাছে তখন অদিতি নয়, কারণ, আকাশও নুইয়ে পরে দিগন্তে।[১] অদিতির সীমাহীন ব্যাপ্তি তখন পৃথিবী ছাড়িয়ে, মেঘলোক অতিক্রম করে নুব্জ আকাশেরও ওপারে। অবিচ্ছিন্ন, অবিভাজ্ সীমাহীনতা, অদিতির যা মূল অর্থ, তাই হল নতুন স্তোত্রের বিষয় আর্যদের কাছে। এই সীমাহীন ব্যাপ্তির মধ্যেই প্রকৃতি। সুতরাং প্রকৃতিদেবতারা হলেন এই অদিতি থেকেই উদ্ভূত। অদিতি হলেন সকল দেবতার জননী।[২] আদি জননী এই অদিতি আর্যদের কাছে আবির্ভূতা হলেন দ্যু-লোক, অন্তরীক্ষলোক এবং ভূ-লোকের অধীশ্বরী হয়ে। এই অনাদি অসীম অদিতির উদ্দেশ্যে আর্য স্তোত্র উচ্চারিত হল এই বলেঃ—অদিতি হল দ্যু-লোক, অদিতি অন্তরীক্ষলোক, অদিতি হল জননী, পিতা, পুত্র। অদিতি সমস্ত দেবতা। অদিতিই পঞ্চসত্তা অদিতি সৃষ্ট [৩] এবং একই সঙ্গে সৃষ্টির কারণ।

ত্রিলোক আচ্ছন্ন করে যে অদিতি—(দ্যু-লোক, অন্তরীক্ষলোক ও ভূ-লোক) তার প্রথম লোক—অর্থাৎ দ্যু-লোকের অধীশ্বর হলেন সূর্য। ইন্দ্র অথবা বায়ু হলেন অন্তরীক্ষলোকের এবং অগ্নি হলেন ভূ-লোকের। কালক্রমে এই তিন—সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়ে হলেন তেত্রিশ। প্রতি লোকে এগার জন। এই তেত্রিশজন হলেন অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য দ্যু এবং পৃথ্বী। অষ্ট বসু হলেন—ধ্বব, ধ্রুব, সোম, আপ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ এবং প্রভাস। দ্বাদশ আদিত্য হলেন—ধাতৃ, মিত্র, আর্যমন, রুদ্র বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবশ্বত, পূষান, সবিতৃ, ত্বষ্টৃ এবং বিষ্ণু। আর একাদশ রুদ্র হলেন—মৃগব্যাধ, সর্প, নিঋতি, অজয়কবাড, অহির্বুধ্ন্য, পিনাকিন, ধন, ঈশ্বর, কপালিন, স্থানু এবং ভগ।

কারা এই অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য আর একাদশ রুদ্র? জানি না। ঋগ্বেদের হংসবতী স্তোত্রে বসুকে বলা হয়েছে বায়ু। তাহলে এই অষ্ট বসু কি বায়ুরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ? শতপথ ব্রাহ্মণের মতে দ্বাদশ আদিত্য হল—বার মাসে একই সূর্যের বিভিন্ন নাম। কিন্তু এই একাদশ রুদ্র কারা? জানি না।

বৈদিক প্রকৃতিদেবতার বংশবৃদ্ধি কিন্তু তিন থেকে তেত্রিশে এসেই থামেনি। তেত্রিশ আবার হয়েছে তিন হাজার তিনশ উনচল্লিশ এবং তিনহাজার তিনশ উনচল্লিশ শেষপর্যন্ত তেত্রিশ কোটি।

(১) পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে আকাশ কেন শূন্যতা পর্যন্ত সে বেঁকে যায় একথা বর্তমান কোয়াণ্টাম ফিজিক্স প্রমাণ করেছে।

(২) অদিতি হলেন দেশ (Space) দুমড়ানো দেশ থেকেই যে বস্তুর আবির্ভাব বর্তমান কোয়াণ্টাম ফিজিক্স সেকথাই বলছে।

(৩) শক্তিপূর্ণ দেশ সৃষ্ট শক্তিহীন দেশ অর্থাৎ অতিশূন্যতা সৃষ্টির মূল উৎস।

সীমাহীন যে মূল, অদিতি, তাঁর অংশভূত সীমিতেরাও তো কেউ প্রকৃতপক্ষে সীমিত নয়।[১] সুতরাং প্রকৃতি যত রূপে যতবার, কবি-দৃষ্টির ভাবালোকে উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিল, ততবারই বুঝি নতুন দেবদেবীর জন্ম হল আর্যদের কাছে। তাই সংখ্যা বৃদ্ধির আর কোন সীমা থাকলো না দেবতাদের।

এই তিন লোকের দেবতার উদ্দেশ্যে আর্য ঋষিদের বেদমন্ত্র উচ্চারিত হল মহান গাম্ভীর্যে। দ্যু-লোকের দেবতা সূর্যের দ্বাদশ রূপের মধ্যে মিত্র পেলেন প্রথম উল্লেখযোগ্য স্তোত্র আর্য ঋষিদের কাছ থেকে। মিত্র হলেন আলোর দেবতা, দিনের অধীশ্বর। আর নিবিড় নীলিম আকাশের অধীশ্বর বরুণ এলেন রাত্রির অধীশ্বর হয়ে। ঋগ্বেদের ঋষিদের কণ্ঠে দ্যু-লোকের এই আদিত্যদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারিত হল ঃ 'হে মিত্র, হে বরুণ তোমরা মহা শক্তিধর। তোমাদের অনুগতদের শক্তিবৃদ্ধি কর। তিন দ্যু-লোক, তিন অন্তরীক্ষ এবং ত্রি-ভূবন তোমরাই ধারণ কর। হে মিত্র, হে বরুণ, তোমাদের নির্দেশেই গাভী দুগ্ধ দান করে, নদী সুমিষ্ট বারি দান করে এবং তিন দীপ্যমান দেবতা (অগ্নি, বায়ু এবং আদিত্য) আপন অস্তিত্ব রক্ষা ক'রে মেঘ বহন ও বৃষ্টি দান করেন।'

কালক্রমে মিত্র এবং বরুণের মধ্যে বরুণই হয়ে উঠেন মহামহীয়ান। অথর্ব বেদ সংহিতায় এসে বরুণ লাভ করেন মানুষের অভূতপূর্ব শ্রদ্ধা এবং ভক্তি। সর্বত্র বিরাজমান সর্বজ্ঞ বরুণেব অজ্ঞাত থাকে না কিছুই। বরুণের উদ্দেশ্যে স্তোত্র রচিত হয় ঃ

সেই মহাশক্তিধর দেবতা আমাদের সকল কার্যই খুব কাছে থেকে লক্ষ্য করেন। মানুষ যদিও মনে করে যে সে লুকিয়ে কাজ করছে। তবু তার সকল কার্যই দেবতার কাছে জ্ঞাত। কেউ দাঁড়িয়ে থাকুক, চলুক, স্থানে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াক কিংবা গোপন কক্ষে নিজেকে লুকিয়ে রাখুক, দেবতারা তাকে খুঁজে বার করবেনই। কোন দুই ব্যক্তি যদি গোপনে ষড়যন্ত্র ক'রে মনে করে যে, আর কেউ জানল না, মনে রাখতে হবে যে, নৃপতি বরুণ সেখানেও উপস্থিত আছেন তৃতীয় পক্ষ হিসাবে। এবং ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্রও ফাঁস হয়ে গেছে তাঁর কাছে। এই পৃথিবী বরুণের। এই সীমাহীন আকাশও তাঁরই। সুনীল জলধিও যেমন তাঁব বাইরে নয়, তেমনি গোষ্পদের মধ্যেও তিনি আছেন। নিবিড় নীলিমার ওপারেও কেউ যদি চলে যায়, দেখবে, সেখানেও রয়েছেন বরুণ।[২]

দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে মিত্র ও বরুণের পরই হলেন সবিতৃ। হৈমহস্ত একচক্র রথের আর্যারোহী সূর্যকে টেনে নিয়ে চলেছে সপ্তাশ্ব (সূর্যের সাত রশ্মি)। জীবন, সম্পদ এবং শক্তি দাতা এই সূর্য। গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে ঋগ্বেদে এই সূর্য সম্পর্কেই ঃ 'সেই সবিতৃর মহান আলোকচ্ছটার ধ্যান করি। আমাদের চিন্তাকে তিনি তাঁর দিকেই পরিচালিত করুন।'[৩]

(১) প্রাকৃত জীবের মাত্রা বৃদ্ধি পেলেই সে বুঝতে পারে যে সে জীবিত নয় অসীম। বিজ্ঞানই একথা বলছে। Cosmos Carl Sagan দ্রষ্টব্য।

(২) আধুনিক কোয়ান্টাম ফিজিক্সের দেখা (Space)-এর ধারণার সঙ্গে এখানে অপূর্ব মিল হয়েছে। একটি স্পেশ হল Kinetic energy পূর্ণ আর একটি potential energy পূর্ণ যা অতি শূন্যতা রূপে প্রতীয়মান হয়। বরুণ হলেন এই সর্বপ্রথম চিৎ সত্তা।

(৩) এই সূর্যে সৌরমণ্ডলের সৃষ্ট নয়। এই সূর্য সৃষ্টির অবতরণ পর্যায়ে তৃতীয় ধাপের জ্যোতি।

এই সূর্যের নিকটই প্রার্থনা জানানো হয়েছে এইভাবে ঃ

সর্বস্রষ্টা হে ভগবান সবিতৃ আমাদের প্রতিবন্ধকতা দূর করে আশীর্বাদ বর্ষণ কর। এবং ক্ষমা ভিক্ষা করা হয়েছে এই বলে ঃ দেবলোকের বিরুদ্ধে অজ্ঞতাবশত, দুর্বলবশত, অহঙ্কারবশত কিংবা মানুষের স্বভাববশত আমরা যদি কোন অপরাধ করে থাকি, হে সবিতৃ আমাদের সেই পাপ মোচন কর।

সবিতৃর পর আর এক বিশেষ আদিত্য হলেন বিষ্ণু। প্রথম দিকে তাঁর গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী না হলেও পরবর্তীকালে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। ঋগ্বেদে যদিও বিষ্ণুর নামে বহু ঋক্ নেই, তবু বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে যে সব স্তোত্র রচিত হয়েছে, তার গুরুত্ব অনেকখানি। যেমন বিষ্ণুকে প্রথমেই বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে যে, তাঁর তিনপদে সমস্ত বিশ্বভূবন আচ্ছন্ন করে আছেন তিনি। যদিও মূলত তিনি সূর্যের সমার্থবোধক, তবু বিষ্ণু হিসেবে তাঁর তাৎপর্য একটু বিশেষ রকম। ঋগ্বেদের এই ঋকে বিষ্ণুর বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে ঃ

বিষ্ণু তাঁর দীর্ঘ পদক্ষেপে তিন ভূবন অতিক্রম করলেন
তিনবার তিনি তাঁর পদ স্থাপন করলেন।[১]
তাঁর পদক্ষেপের ধূলিতে জেগে উঠল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।
সর্বরক্ষক বিষ্ণু,
তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় কারো পক্ষেই
তিনবার পদক্ষেপ করে তিনি ধর্ম স্থাপন করেছেন (ধরণীতে ?)
নয়ন প্রসারিত করে উর্ধে তাকালে সব কিছুকেই যেমন স্পষ্ট দেখা যায়—
তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তিরা দেখতে পান বিষ্ণুর সেই মহামূর্তি।
সর্বদা ভক্তিনম্র এবং জাগ্রত জ্ঞানীরা বিষ্ণুর সেই পরম অস্তিত্ব
অনুভব করতে পারেন।

এই ঋকের বক্তব্য—বিষ্ণুই হলেন পরম পুরুষ। তিনি আর আদিত্য নন, আদিত্যেরও স্রষ্টা। কিন্তু অনেক আধুনিক পণ্ডিত ঋগ্বেদের এই ঋক ব্যাখ্যা করে একথা বলার চেষ্টা ত্যাগ করেন নি যে, বিষ্ণুই হলেন সূর্য। তাঁর উদয় অবস্থিতি এবং অস্তই হল তাঁর তিন পদক্ষেপ। কিন্তু বৈদিক ভাষ্যকার যাস্কের মতে বিষ্ণুর ত্রিপদক্ষেপ হল দ্যু-লোক, অন্তরীক্ষলোক এবং ভূ-লোকের অস্তিত্ব স্বরূপ। আবার কারো কারো মতে এই তিনলোকে সূর্যের বিভিন্ন অবস্থাই হল তাঁর তিন পদক্ষেপ। পৃথিবীতে সূর্য হলেন অগ্নি, অন্তরীক্ষলোকে বিদ্যুৎ এবং দ্যু-লোকে স্বয়ং ভগবান সবিতৃ। কিন্তু বিষ্ণু শব্দের মূল অর্থ অন্য সকল ব্যাখ্যাকে ম্লান করে দিয়ে নতুন এক মহিমায় উন্নীত করেছে এই দেবতাকে। বিষ্ণু শব্দের মূল অর্থ হল 'স্বয়ংপ্রকাশ'। আপনাতে আপনি প্রকাশিত এই বিষ্ণু সীমার বন্ধন অতিক্রম করে অসীম এক ব্যাপ্তি ধারণ করেছেন।[২]

দ্যু-লোকের এই আদিত্য বন্দনার পরই বেদের স্তোত্র নেমে এসেছে

(১) এই তিন হল প্রকৃত পক্ষে তিন গুণ সত্ত্ব, রজ ও তম।

(২) বিষ্ণু শব্দের উৎপত্তি দ্রাবিড় (তামিল) বিন (আকাশ) শব্দ থেকে। বিষ্ণু মূলত আকাশতত্ত্ব।

অন্তরীক্ষলোকে। আর আর্য বন্দনায় এই অন্তরীক্ষলোকই তখন হয়ে উঠেছে মহামহীয়ান। অন্তরীক্ষলোকের প্রথম উল্লেখযোগ্য দেবতা হলেন ইন্দ্র। যদিও ইন্দ্রকে দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যেও স্থান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আর্যবন্দনায় অন্তরীক্ষলোকই হয়েছে তার মহা অধিষ্ঠানের ক্ষেত্র। ইন্দ্রের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক অন্তরীক্ষলোকের আর এক দেবতা মরুতের, অর্থাৎ বায়ু দেবতার। ভারতের ভাগ্য নির্ভরশীল তার আবহাওয়ার উপর। বৃষ্টি ক'রে ধরনীকে শ্যাম শস্যে পূর্ণ, অনাবৃষ্টি মরুভূমি। যিনি এই আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করবেন ভারতীয় আর্যদের কাছে তিনি যে হবেন বিশেষ দেবতা তাতে আর আশ্চর্য কি! ইন্দ্র নিয়েছেন সেই দায়িত্ব, সুতরাং অন্তরীক্ষলোকের দেবতা হয়েও ইন্দ্র হয়েছেন মহাশক্তিধর। ইন্দ্র কৃষ্ণসর্পরূপী বৃত্রাসুরকে[১] ঘনকৃষ্ণ মৌসুমি মেঘ ?) হত্যা করে পৃথিবীতে ঋতুকালীন বর্ষা নামিয়েছেন। মানুষের এত বড় কল্যাণ আর কে করেছেন বাঁচবার জন্য? সুতরাং যে শক্তিধর দেবতা এই বিরাট কাজ করেছেন আর্যবন্দনার মূল দেবতা তিনি তো হবেনই। বৃত্রাসুর বধের বর্ণনা বেদে দেওয়া হয়েছে এইভাবে ঃ

'তমসা প্রতিহত করে রেখেছে বৃষ্টির ধারা।
বৃত্রের উদরে বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ রয়েছে অগোচর।
বৃত্রের অধিকার থেকে বৃষ্টিধারার পথ কেটে দিলেন ইন্দ্র নিম্নভূমিতে।

মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী এত বড় দেবতা আর কোথায় পাওয়া যাবে? সুতরাং ঋগ্বেদের স্তোত্র ভরে উঠল ইন্দ্রের প্রশংসায়। ইন্দ্র—যিনি সম্ভবত ছিলেন কোন আর্য যোদ্ধা, অসুর ধ্বংসকারী, সেই প্রতিচ্ছবিতেই অন্তরীক্ষলোকে হলেন দেবতা। মানুষের কল্যাণ সাধন করে দেবতা থেকে হলেন পরমদেবতা। সীমা অতিক্রম করে অসীমে গিয়ে মিশলেন তিনি। এবং তাঁর উদ্দেশ্যে স্তোত্র রচিত হল অসীম উচ্ছ্বাসে ঃ

(হে ইন্দ্র) 'তুমি এই অসীম বিশ্বের সীমা।[২]
তুমি দ্যুলোকের শাসক
তোমার বিরাটত্বে সমস্ত অন্তরীক্ষেও ব্যাপ্ত হয়ে
আছ তুমি।
তোমার সমকক্ষ কেউ নেই!
হে মনুষ্যের রক্ষাকর্তা, ত্রিপাক রজ্জুর মতো সকলের
ক্ষমতাকে তুমি সীমিত করেছ।[৩]
তিন লোকে তুমি তিন আলোর ছটায় (সূর্য, বিদ্যুত, অগ্নি ?) উজ্জ্বল।
একমাত্র তুমিই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে রাখতে পার।
শত্রুহীন তুমি, তুমি অনাদি।[৪]

(১) D. D. Kasambi র মতে ইন্দ্র আর্য দলপতি যিনি সিন্ধুনদের জল দ্বারা বাঁধ ধারা বন্ধন কারি অনার্যদের বাঁধ ধ্বংস করে মুক্ত করেছিলেন। E. R. E. VIII-এর ৬০ পৃষ্ঠায় একে বলা হয়েছে শীতে যখন আকাশের মেঘে বৃষ্টি থাকে না ও নদনদীর উৎস পর্বত শৃঙ্গের তুষার বরফাবৃত হয়ে থাকে। E. R. E. P. 60, Vol VIII.

(২) শক্তিপূর্ণ গোলক—অর্থাৎ Spherical universe

(৩) ত্রিপাক রজ্জু, সত্ত্ব রজ ও তম গুণের সাম্য।

(৪) অনাদি শব্দটি প্রশংসার আধিক্য। যথার্থ প্রয়োগ নয়।

অথচ ইন্দ্র যতটা প্রয়োজনের দেবতা ততটা অধ্যাত্ম দেবতা নন। তথাপি অধ্যাত্ম জগতে উন্নীত করা হয়েছে তাঁকেও বৈদিক স্তোত্রে। ইন্দ্রের আসল প্রয়োজন ছিল অনার্যপরিবৃত ভারতে শত্রু নিধনে। এবং সেই প্রয়োজন সাধনা করেই ইন্দ্র আচ্ছন্ন করেছিলেন আর্যদের। তার প্রমাণ আছে ঋগ্বেদেই। যেমন ঃ

আত্মপ্রকাশ করেই যে বীর দেবতা রক্ষা করলেন দেবতাদের—
যাঁর পরাক্রমের কাছে দুই ভুবন প্রকম্পিত, হে জনগণ তিনিই ইন্দ্র।
যিনি পৃথিবী এবং উৎক্ষিপ্ত পর্বতসমূহকে দৃঢ় করলেন,
বায়ুর স্থান নির্দেশ করে দিলেন, স্বর্গকে ধারণ করলেন,
হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র।
সর্পহত্যা করে যিনি সপ্তস্রোতস্বিনীর ধারাকে বাধমুক্ত করলেন,
ধেনুগণকে উদ্ধার করলেন, যুদ্ধে যিনি শত্রুঘাতক,
হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র!
সেই ভয়ঙ্কর দেবতা, যাঁর সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে তোমরা
জিজ্ঞাসা কর তিনি কোথায়?
এবং বিদ্রূপ করে বল যে, তিনি নেই;
কিন্তু যিনি শত্রুদের উৎখাৎ করেন তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।
হে জনগণ তিনিই ইন্দ্র।
যাঁর সাহায্য ব্যতিরিকে মানুষের যুদ্ধজয় অসম্ভব,
যাঁর সুতীক্ষ্ণ শায়ক চিন্তা করবার আগেই শত্রু নিধন করে,
হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র।

ইন্দ্রের মৌলিক চরিত্র ব্যক্ত হয়েছে এই স্তোত্রটিতেই। অনার্য ভারতে আর্যদের রক্ষার জন্যে কোন আর্য-প্রধানের ভূমিকা স্মরণ করেই সম্ভবত ইন্দ্রের উৎপত্তি। মৃত ব্যক্তি দেবতার আকারে অদৃশ্যে বিচরণ করেন, এ-ধারণা তো মানুষের সুপ্রাচীনকালের। হয়তো বা সেই কোন অতীত মহাবীর পিতৃপুরুষের স্মৃতিই দেবতার আকারে ইন্দ্র হয়েছেন। ভক্তি-অর্ঘ্য পেতে পেতে দেবতা উন্নীত হয়েছেন মহামহিম এক পর্যায়ে যেখানে তিনি সর্বস্থ, সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রেষ্ঠ। এবং ঋগ্বেদে অধিকাংশ স্তোত্র সেই জন্য তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে।

ইন্দ্র দ্যু-লোক এবং অন্তরীক্ষলোক দুই জগতেই আছেন। শুধুমাত্র অন্তরীক্ষলোকের মূল দেবতা হলেন বায়ু। মরুৎ এবং মাতরিশ্বন হলেন তাঁরই বিভিন্ন রূপ। বায়ু সম্পর্কে আর্য-ঋষির স্তোত্র রচিত হয়েছে এইভাবেঃ

দেবতাদের প্রাণশক্তি স্বরূপ, এবং পৃথিবীতে জীবনের বীজ স্বরূপ,[১]
এই দেবতার জন্ম কোথায়? এবং কোথায়ই বা তাঁর উৎপত্তি?
সর্বত্র তিনি সঞ্চরণশীল, যেখানেই কান পাত
তাঁর শব্দ শুনতে পাবে, কিন্তু তিনি অদৃশ্য।

এই বায়ুদেবতাই যখন ভয়ানক ঝঞ্ঝা হিসেবে প্রকাশ পান তখন আর্য-ঋষিদের কাছে তাঁর পরিচয় আসে নতুন নামে। বায়ু হন মরুৎ। বায়ু তখনই মরুৎ হন আর্য-ঋষিদের বর্ণনাক্রমে যখন প্রকৃতিতে বায়ুর প্রভাব হয়

(১) গতিশক্তি ও শ্বাস (প্রাণ) রূপে তিনি জীবনের উৎস সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নিম্নরূপ, অর্থাৎ যখন বায়ু ঘনকৃষ্ণ মূর্তি ধারণ করে ধূলো আর মেঘে, যখন মুহূর্তের মধ্যে (বায়ুবেগে) বৃক্ষ হয় পত্রচ্যুত, শাখা কম্পিত, কাণ্ড ভগ্ন; যখন পৃথিবী হয় ঘূর্ণায়মান, পর্বতসমূহ আন্দোলিত এবং নদীসমূহ বেত্রাহত ফেনিল ক্রুদ্ধ।

মরুতের মত বায়ুর চরিত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাতরিশ্বনও দেখা দেন। তাঁকে কল্পনা করা হয় স্বর্গ থেকে অগ্নি উদ্ধারক হিসেবে।[১]

এই অন্তরীক্ষলোকে দেবতা হয়ে আছেন আরো, যেমন, অষ্টবসু, পর্জন্য (মেঘের দেবতা), যম ও যমী (মৃত্যুর দেবতা ও দেবী) ঊষা ও গোধূলির দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইত্যাদি। আছেন বিশ্বদেব (বৃষ্টিদাতা দেবতা) এবং ঊষা (সূর্যোদয়েব প্রাকমুহূর্তের দেবী। এঁকে অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকের মধ্যে সংযোগকারিণী হিসাবেও কল্পনা করা হয়েছে)। এছাড়া আছেন ঋভু নামে আর এক শ্রেণীর দেবতা যাঁবা মূলত ছিলেন মানুষ কিন্তু সুকর্মের জন্য দেবতা নাম নিয়ে বিরাজ করছেন অন্তরীক্ষলোকে।[২]

এঁদের প্রত্যেকের নামেই সশ্রদ্ধ স্তোত্র নিবেদন করেছেন ঋষিরা যে-সব স্তোত্র কাউকেই মহামহিম না কবে ছাড়েনি। যেমন পর্জন্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

ধরণী আমার মা, আমি তাঁরই পুত্র; পর্জন্য আমার পিতা
তিনি আমাদের সাহায্য করুন।

অন্তরীক্ষলোকের পরেই ভূলোক। এই ভূলোকের সর্বপ্রধান দেবতা হলেন অগ্নি। শত্রুনিধনকাবী ইন্দ্রেব পরেই অগ্নির স্থান আর্য-ঋষিদেব কাছে। পার্থিব মানুষের কাছে এ-দুয়েব চাইতে বড় আর কি আছে? শত্রুবেষ্টিত দেশে শত্রু হন্তারকের মূল্য অপরিসীম। আর জীবনের পক্ষে, সভ্যতার পক্ষে, অগ্নিই হল মানুষের প্রথম বিস্ময়কর প্রকাশ। সুতরাং এ দুইয়ের চাইতে বহু প্রশংসিত আর কে হতে পারেন? সুতরাং ইন্দ্রের পবেই অগ্নি ঋষিদের স্তোত্র লাভ করে মহামহিম হয়েছেন।

পণ্ডিতদের ধারণা বেদ প্রকাশের পূর্বেই অগ্নি ছিলেন আর্যদের পরম আরাধ্য। বৈদিক আর্যদের পরিকল্পনা তাকে করে তুলেছে মহীয়ান। ঋগ্বেদের প্রথম স্তোত্রের আরম্ভই এইভাবে ঃ

'নির্বাচিত পুরোহিত, সমুজ্জ্বল যজ্ঞাচার্য, দেবগণের আহ্বায়ক,
মহাসম্পদশালী ভগবান অগ্নিকে প্রণাম করি।'
যজ্ঞনিয়ন্ত্রণকারী শাশ্বত নিয়মের দেবতা, যজ্ঞকুণ্ডে ক্রমবর্দ্ধমান হে উজ্জ্বলদেহী
আমাদের কাছে সহজগম্য হও, যেমন পিতা পুত্রের কাছে সহজগম্য।
আমাদের কল্যাণের জন্য সর্বদা আমাদের পাশে বিরাজ কর।

(১) সম্ভবত এখানে ঘনকৃষ্ণ মেঘে বিদ্যুতের চমকেব কথা বলা হয়েছে।
(২) অন্তরীক্ষলোকে যে সূক্ষ্মরূপে দেবতারা বিরাজ করেন যোগবলে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। বর্তমান লেখকেব যোগপদ্ধতি অনুসরণ কবলে প্রত্যেকেই তা দেখতে পাবেন।
সৃষ্টি পর্বের জ্যোতিরূপ অগ্নির কথা বলা হয়েছে এখানে।

আবার অন্য এক স্থানে তাঁকে স্তব করা হয়েছে এইভাবে ঃ

হে অগ্নি! তুমি আনন্দদানকারী! তুমি মানুষের গৃহ পরিচালক
তুমি দেবতা আহ্বায়ক মানুষের দূত—।
দেবতারা যে সকল পুণ্যকীর্তি করেন তা সবই তোমার মধ্যে এসে
সংগৃহীত হয়।[১]

অগ্নির শিখা উর্ধ্বমূখী। যজ্ঞাগ্নির ধোঁয়া উঠে যায় আকাশে। সুতরাং বিশ্বাস যে, মানুষের আশা-আকাঙ্খা, প্রার্থনা, সেই যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে উর্ধলোকে দেবতাদের নিকট গিয়ে পৌঁছায়। সেই জন্য নিসংশয় কণ্ঠে প্রার্থনা জানানো হয়েছে অগ্নিকে ঃ

হে অগ্নি! আমি এই যে তোমাকে যজ্ঞাকাষ্ঠ দিচ্ছি তা গ্রহণ কর।
উজ্জ্বল ভাবে প্রজ্বলিত হয়ে তোমার পবিত্র ধূম উর্ধলোকে
প্রেরণ কর।
তোমার লেলিহান কেশর দিয়ে দ্যু-লোক স্পর্শ কর
এবং সূর্যরশ্মির [২] সঙ্গে মিশে যাও।

মানুষ এবং দেবতাদের মধ্যে এই দূত অগ্নি। তাই আত্মবিশ্বাসেব সুরে স্তোত্র উচ্চারিত হয়েছে অগ্নিকে উদ্দেশ্য করে ঃ

হে অগ্নি, আমাদের এই হবিঃতে বরুণকে আনয়ন কর।
আকাশ থেকে আন ইন্দ্রকে, এবং বায়ুমণ্ডল থেকে মরুতকে।

অগ্নির এই ভূমিকার জন্য অগ্নির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা মানুষের। তাই অন্তরঙ্গতা ফুটে উঠেছে ঋষির স্তোত্রে ঃ

আমি অগ্নিকে আমার পিতা বলে মনে করি।[৩]
আমি তাঁকে আমার আত্মীয়, ভ্রাতা ও বন্ধু বলে মনে করি।

অগ্নিরই বিভিন্ন রূপান্তর রুদ্র নামে চিহ্নিত। তাঁর বিভিন্ন একাদশ ভূমিকা দেখেই হয়তো একাদশ রুদ্রের কল্পনা করেছিলেন আর্য-ঋষিরা। সুতরাং তাঁর উদ্দেশ্যেও বৈদিক মন্ত্র আছে বেদে।

দেবতা তেত্রিশ কোটি। পূর্বেই সে কথা বলেছি। অসংখ্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত অসংখ্য স্তোত্র নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য নয়। বেদ-সংহিতার সবগুলি ধারা আলোচনাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য প্রকৃতির মধ্যে কিভাবে দেবতা কল্পনা করে তাঁর উদ্দেশ্যে অর্ঘ নিবেদন করেছেন ঋষিরা, তাই। দেবতাকে তাঁরা বিভক্ত করেছিলেন তিন শ্রেণীতে, দ্যু-লোক, অন্তরীক্ষলোক ও ভূলোকের দেবতা হিসেবে। তারই উদাহরণস্বরূপ প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি দেবতার স্তোত্র মাত্র আলোচনা করা হল এখানে।

আরো একটি আশ্চর্য জিনিস, যাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেছিলেন আর্যরা, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করে মূল বিষয়ে যাব আমরা, অর্থাৎ আর্যদের ধর্ম বিষয়ে, ঈশ্বর সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসার বিষয়ে। এই

(১) এই সূর্য রশ্মির জ্যোতির্লোক।

(২) সৃষ্টিশক্তির অবতরণ পর্যায়ের জ্যোতিকে জগতের ভ্রূণ হিসাবে কল্পনা কবা যেতে পারে।

(৩) লেখকের মতে এই সোমরস যোগকালে সহস্রার নির্গত রসধারা যা এক ধরনের দিব্য নেশায় বুঁদ করে দেয়।

প্রকৃতি-পূজাব মধ্যে কি ঈশ্বর আছেন? ধর্ম আছে? কিংবা এটা কি কোন অসভ্য মানুষের নিষ্পাপ মনের হাস্যকর প্রকাশ মাত্র?

শুনলে আশ্চর্য বোধ হবে। বিশেষ এক ধরনেব উদ্ভিদ তাকেও দেবতা-জ্ঞানে পূজা করে গেছেন আর্য-ঋষিরা। কোন এক বিশেষ রকমের উদ্ভিত যার রস পান করলে দেহমনে উন্মাদনা জাগে, শক্তি বৃদ্ধি হয়, কর্মে উৎসাহ জাগে, মনোসন্নিবেশ হয়, তাব প্রতি পরম কৌতূহল বোধ করেছেন আর্যরা। অন্যান্য প্রাকৃত জিনিসের অন্তরালে বিশেষ কোন শক্তিব উপস্থিতি কল্পনা করে তাকে যেমন বন্দনা করেছেন আর্যঋষিরা, সোম উদ্ভিদকেও তেমনভাবে বন্দনা করেছেন দেবতা জ্ঞানে। সোমরস পানে যে উন্মাদনা জাগে, তাকে অতীন্দ্রিয়লোকের অন্যতম পাথেয় বলে বোধ হয়েছে তাঁদেব কাছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই উদ্ভিদও হয়ে উঠেছে দৈবী ক্ষমতার অধিকারী। আর্য ঋষিদের স্তোত্র রচিত হয়েছে সোম-উদ্ভিদকে লক্ষ্য করে যেমন;

হে সোম যেখানে অনন্ত আলো, যেখানে সূর্য,
সেই অমৃত অক্ষয় জগতে আমাকে স্থাপন কর।
যেখানে বৈবশ্বত শাসনদণ্ড পবিচালনা করেন, স্বর্গের সেই গোপন অন্তপুরে,
যেখানে রয়েছে এই দুর্বার স্রোতধারা
সেখানে আমাকে অমবত্ব দান কর।
যেখানে জীবন বাধাবন্ধহীন সেই দ্যু-লোকে,
যেখানে সবকিছুই আনন্দোজ্জ্বল,
সেখানে আমাকে অমরত্ব দান কর।
যেখানে রয়েছে আকাঙ্খা ও ইচ্ছা এবং উজ্জ্বল সোমপাত্র,[১]
যেখানে রয়েছে পর্যাপ্ত আহার এবং বিহার
সেখানে আমাকে অমরত্ব দান কর।
যেখানে আছে সুখ ও আনন্দ, যেখানে বাস করে আনন্দ ও উল্লাস
যেখানে আকাঙ্খার চূড়ান্ত পরিতৃপ্তি,
সেখানে আমাকে অমরত্ব দান কর।

দুহত্তর ইংরেজী জানা লোক, বাইবেল পড়িয়ে লোক, কোট-প্যাণ্টপরা লোক, অফিসে যাবার মুখে হঠাৎ এ ধরনের একটা কবিতা শুনলে কেমন বোধ করবেন, বলুন? বিশেষ করে পানরস জাতীয় কোন নেশার উপর যদি ধর্মের আবরণ পবিয়ে এমন কবিতা লেখা হয়? মদ্যপ বাবু হয়তো স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বার কয়েক এটা আবৃত্তি করে একটু হাসবেন, এবং দুই ঠোঁট সামান্য একটু ফাঁক করে অর্ধচন্দ্রের মত বলবেন 'দেখলে তো! তুমি তো দুবেলা চোখের জল ফেলে অস্থির, জাহান্নামে যাচ্ছি বলে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রেই দেখ এর অনুমোদন! মদ কি আর মদ থাকে গো, হয়ে দাঁড়ায় তখন মহাকারণ, সেই যে গো, সেই গানের মতন—'সুরা পান করি না মা, সুধা খাই জয় কালী বলে।'

(১) তন্ত্রোক্ত কোটিচন্দ্র সুশীতলম অবস্থা।

এবং এই ধরনের দু'একটা দৃশ্য চোখে পড়লে আপনিই তখন কি ভাববেন? নিতান্ত ছেলেমানুষী একটা ব্যাপাব বলে ভাববেন না? যাকে তাকে ধরে পুজো করলেই কি ধর্ম হয়ে গেল? ঈশ্বর কি অসংখ্য, অজস্র, এমনি সস্তা?

হ্যাঁ যা, সেইটেই হল আসল প্রশ্ন, এবং সেই প্রশ্নটা নিয়েই গভীর ভাবে আমাদের একটু ভেবে দেখতে হবে। একটা ব্যক্তিব যেমন শৈশব আছে, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য—তেমনি আছে একটা জাতিবও। যে শিশু শৈশবে চাঁদের বুড়িকে বিশ্বাস করে, কৈশোরের চর্চা দ্বারা যৌবনেই সে সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে। মাতৃগর্ভ ত্যাগ করেই কোন শিশু যদি সবজান্তা হয়, তবে তাকে এঁচোড়ে-পাকা ছেলে বলা ছাড়া গত্যন্তব নেই। কোন জাতি যদি তার উন্মেষেই জ্ঞান-দীপ্ত হয়ে দেখা দেয় তাহলে তাকে এঁচোড়ে-পাকা জাতি বলা ছাড়া গত্যন্তব নেই। ভ্রান্তির মধ্য দিয়েই সত্যে পৌঁছুতে হয়, এটাই স্বাভাবিক। এটাই সুস্থ বিকাশের লক্ষণ।[১]

আর্য জাতির এটা শৈশব কাল? তাই শিশুসুলভ ভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। অবিশ্বাস্য আত্মবিশ্বাসে প্রকৃতির প্রতিটি রূপের পশ্চাতে দেখছে একজন কবে সক্রিয় দেবতাকে। কিন্তু ঐ আবিষ্কারই যদি তাব চবম এবং স্থায়ী আবিষ্কার হত, তাহলে সেটা হোত তার অকাল পক্কতা। তাহলে আর্যদের ধর্ম নিয়ে ঈশ্বর সন্ধান নিয়ে আলোচনায় বসবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু এই আর্যরাই একমাত্র জাতি, যারা মিথ্যাকে ভ্রান্ত বিশ্বাসে সত্য বলে জড়িয়ে ধবলেও, মিথ্যার চবিত্র যখন প্রকাশিত হয়েছে তৎক্ষণাৎ তাকে পরিত্যাগ কবতে দ্বিধা বোধ করেনি। এই জন্যই তাব ঈশ্বর অনুসন্ধান যতটা সার্থক হয়েছে, অপর কারো হয়নি। আর্য সাধনায় ঈশ্বরেব সন্ধান এই জন্যই এত আকর্ষণের।

হ্যাঁ যা, অনেকেই হয়তো বলবেন, রক্ষণশীলদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবেন—'কে বললে, সংহিতার যুগে বেদের সাধনা, ঈশ্বর সন্ধানে শিশুসুলভ কৌতূহল মাত্র? মোটেই তা নয়। বোঝার অভাবে, বোধের অভাবে, বেদের স্তোত্র আমাদের কাছে ভ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু বস্তুত ব্যাপারটা তা নয়। বেদের প্রত্যেকটি স্তোত্রের পেছনে আছে গুহ্য তত্ত্ব। সেই অবস্থায়, সেই মন নিয়ে পাঠ না করলে বেদের যথার্থ অর্থ বোঝা যাবে না।

এ-কথা সত্য, ভাষার অর্থবহ ক্ষমতার অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়, সময় ও পরিবেশ পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে। এমন হতে পারে যে, সত্যই কাল প্রবাহে বৈদিক স্তোত্রের মৌল অর্থ ভেসে গেছে। তার আসল অর্থ আজ আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। কিংবা হয়তো অর্থের বাইরেও আছে একটা ধ্বনিগত তাৎপর্য সেখানে। শব্দ ব্রহ্ম, ধ্বনি হল তার নাদ। অর্থহীন ধ্বনির মূল্য তো অর্থবান ভাষার চাইতেও বেশী! উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত যে অতীন্দ্রিয়লোকে নিয়ে যেতে পারে, তাইতো উচ্চাঙ্গ দর্শনও তা পারে না। এবং সেই জন্যই অত্যাধুনিক কালে কাব্য সাধনায় ধ্বনিবাদী কবির জন্ম হয়েছে ইউরোপে

(১) যদিও গভীর ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে এব কোনটাই ভ্রান্ত নয়। মবমিয়া অনুভবেব কাছে ধৃত বৈজ্ঞানিক সত্য। পাঠক এই সত্য বোঝার জন্য—Fritg of capra-এর Taps of physicsপড়তে পারেন।

মালার্মের মত! হয়তো শব্দের অভিঘাতে সৃষ্ট ধ্বনিই ছিল ঋগ্বৈদিক স্তোত্রের মূল তাৎপর্য।

কিংবা যদি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে বলি যে, ঋগ্বেদের স্তোত্র দুর্বোধ্য নয় মোটেই। তার যা অর্থ, সেই অর্থই ঠিক। কোনটাই মিথ্যে নয় বেদের। এই অসংখ্য কোটি দেবতা সবই ঈশ্বর, সবই ভগবান! মানুষকে তো ভূত-পেত্নী রূপে কল্পনা করেনি বৈদিক ঋষিরা। তারাও সব প্রচ্ছন্ন দেবতা সেখানে? দেবতা ছাড়া কিছু নেই, সবই দেবতা, এবং (দেবতার কল্পনায় যদি নিঃশর্তভাবে হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ নিবেদন করে দেওয়া যায়, ক্ষুদ্রও তখন অনন্ত অসীম হয়ে ওঠে। বিশ্বাসই তো সব। সমগ্র এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই তো একটা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি যদি বিশ্বাস করি তবেই আছে, নইলে নেই। যদি সার্থক দার্শনিকতার তুঙ্গে উঠে বিচার করি তাহলে 'আমি' ছাড়া সত্য আর কোথায় আছে? সত্যও আমার উপর নির্ভরশীল, মিথ্যাও আমারই উপর নির্ভরশীল। 'দি হোলি ম্যান' গল্পের সেই নিষ্পাপ সমুদ্রতীরবাসী মানুষটি বিশ্বাসের জোরেই সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে আসতে পেরেছিলেন। গভীর বিশ্বাসে প্রকৃতিকে যদি আপন বলে ভাবা যায়—তাহলেই তো সার্থকতা। তাহলে প্রকৃতিও আপনার হয়ে ওঠে। বিশ্বাস করে হাত বাড়ালে অগ্নিদগ্ধ করে না। সর্প দংশন করে না। ব্যাঘ্র ভক্ষণ করে না। শুধু সেই বিশ্বাস থাকা চাই। প্রহ্লাদের মত আত্মবিশ্বাস নিয়ে কেউ আমরা বলতে পারি না বলেই স্ফটিকস্তম্ভে নৃসিংহাবতার পাই না। সে বিশ্বাস যদি নিজেদের অন্তরে সঞ্চার করতে না পারি, তাহলে বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল কোন ধর্ম বিশ্বাসকে আঘাত করে লাভ নেই। দার্শনিক মনের আলোয় সংহিতার যুগের আর্যেরা ঈশ্বর বা সত্য সম্পর্কিত বিশ্লেষণী জ্ঞান নাও লাভ করতে পাবেন। কিন্তু বিশ্বাসের আলোয় হয়তো সবই পেয়েছিলেন। তাইতো তারা পরম নির্ভয়ে আত্মীয়, বন্ধু, ভ্রাতা প্রভৃতি নামে অগ্নিকে আরাধনা করে বেদমন্ত্র রচনা কবতে পেরেছিলেন ঃ

আমি অগ্নিকে আমার পিতা বলে মনে করি,
আমি তাঁকে আমার আত্মীয় ভ্রাতা ও বন্ধু বলে মনে কবি।)

কিন্তু না, রক্ষণশীলতায় সংহিতা যুগের বৈদিক স্তোত্রকে যারা অভ্রান্ত বলে মনে করেন, আমি তাদের দলে নই। যারা আত্মবিশ্বাসের উপর গভীর জোর দিয়ে ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যাতীত করে তুলতে চান—আমি তাদের দলেও নই। আমি সেই আর্য-ঋষিদেরই দলে যারা নিজেদের ভ্রান্তি নিজেরাই বুঝতে পেরেছিলেন, সংহিতার বহু স্তোত্রে ব্যাকুল হয়ে হাতড়ে বেড়িয়েছিলেন এক এবং অদ্বিতীয় সত্যের সন্ধানে। তাই কোন দেবতাকেই খণ্ডিত ও সীমিত আকারে দেখে তৃপ্তি লাভ করেননি তাঁরা, প্রত্যেককেই অসীমত্ব দিয়ে অখণ্ড সত্যে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। এবং তারপর যখন বুঝেছেন ইন্দ্র, বরুণ, অদিতি, বিষ্ণু , প্রত্যেকেই অসীম ক্ষমতাশালী হতে পারেন না, তখনই তারা একের সন্ধান করেছেন। যে এক সকলের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বহু প্রকৃতি-দেবতা বাদ দিয়ে এক সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, সেই একের সন্ধানে এগুতে যখন গিয়ে খুলে গিয়েছে তাঁর দার্শনিক দৃষ্টি, অন্তরের অনন্ত ব্যাপ্ত অনুভবের সঙ্গে যখন তাঁর চূড়ান্ত যুক্তিবাদী দর্শনের সংমিশ্রণ ঘটেছে, তখনই তাঁর নিকট নিঃশর্ত সত্য উদঘাটিত হয়েছে একম অদ্বিতীয়ম হিসেবে।

একম অদ্বিতীয়মের যথার্থবোধ বৈদিক সংহিতার কর্ম-কাণ্ডে হয়তো সম্ভব হয়নি—অর্থাৎ সংহিতা, ব্রাহ্মণ হওয়ায় ও আরণ্যক (উপাসনা কাণ্ড) পর্যন্ত। সেই অদ্বিতীয় 'এক' আর্যমানসে ধরা দিয়েছে তাঁর জ্ঞানকাণ্ডে অর্থাৎ উপনিষদে। উপনিষদের সত্যবোধ আজ বিজ্ঞানও স্বীকাব করে নিতে বাধ্য হচ্ছে ক্রমে ক্রমে।

আর্যমানসে বহু থেকে এক এবং সর্বাত্মক একের প্রতি কৌতূহল আত্মপ্রকাশ করেছিল সংহিতা পর্বেই। সেইজন্য আর্য ঈশ্বর চিন্তা একটা ক্রমবিকশিত চূড়ান্ত সিদ্ধি। ভ্রান্তির পথে চিরন্তনের সাক্ষাৎ লাভই তাঁর সাধনাকে করে তুলেছে মহামহীয়ান। বহু থেকে একের পথে, ভ্রান্তি থেকে সত্যের পথে তাঁর সেই ক্রমাভিব্যক্তির কথাই বলছি এখন।

মূল সম্পর্কে চিন্তা না করে প্রকৃতির নানা প্রকাশকে দেবতা জ্ঞানে কেউ যদি পূজা করতে থাকে—একদিন না একদিন ক্লান্তি তার অনিবার্য হবেই। দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে একের পর এক, প্রত্যেকেই হয়ে উঠতে চাইবেন মহামহিম। একাধিপত্যের প্রতি প্রত্যেকের দাবিই একদিন মানুষকে সন্দেহকাতর করে তুলতে চাইবে স্বাভাবিকভাবে দেবতাদের প্রতি, সত্যিই তো, কে বড়! এবং স্বাভাবিকভাবেই তখন বড়র বিরাটত্ব খুঁজতে গিয়ে মানুষ নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাবে। আর্য-ঋষিদের ক্ষেত্রেও সম্ভবত ব্যাপারটা এমনিই দাঁড়িয়েছিল একদিন। শুধুমাত্র নিজেদের কল্পনাপ্রসূত দেবতার জন্মবৃদ্ধিই তাদের ক্লান্ত করে তোলেনি, তুলেছিল আর্য-দেবজগতে অনার্য দেবতাদের প্রবেশও। সুতরাং দেবতাদের সংখ্যা সীমিতকরণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন অনেকেই। এবং সেই জন্যই সম্ভবত সবচরিত্রের দেবতাদের এক করে আনবার চেষ্টা হয়েছিল, এবং সকল দেবতাকে একত্রে মিশিয়ে দিয়ে বিশাল 'এক-দেবতা' কল্পনাব চেষ্টা হয়েছিল। বিশ্বদেব হয়তো এই ধরনেরই একটা পরিকল্পনা।

এই প্রচেষ্টা থেকেই হয়তো আর্য-মানসে সত্যের এক নতুন ইঙ্গিত ছায়াপাত করেছিল। বহুজন তো সর্বশ্রেষ্ঠ হতে পারেন না। সর্বশ্রেষ্ঠ হতে পারেন মাত্র একজনই। আর যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁর স্রষ্টা নিশ্চয়ই কেউ হতে পারেন না? কোন সৃষ্ট দেবতাই সর্বশ্রেষ্ঠ নন। যিনি তাঁর স্রষ্টা তিনি নিশ্চয়ই তাঁরও উপরে হবেন। অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি, যাকে বলা যেতে পারে ঈশ্বর বা ভগবান তাঁর উপরে নিশ্চয়ই কেউ নেই।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে ভাব্বার বিষয়, বিশেষ একটা কথা—যে পর্যায়ে আর্য-ঋষিরা এই একের সন্ধানে ব্যস্ত সেই সময়েই অনার্য ভাবধারা এসে স্থান লাভ করেছে বৈদিক সূক্তে। অর্থাৎ অথর্ব-বেদ তৈরি হয়েছে। অথর্ববেদের বিরাট অংশে রয়েছে দার্শনিক মানসিকতা। এবং ঋগ্বেদর সেসব সূক্ত দার্শনিকতায় সমুজ্জ্বল, তার অধিকাংশই স্থানলাভ করেছে এই বেদে। তাহলে কি এ-কথাই স্বীকার করতে হয় যে, দার্শনিক মানসিকতার অধিকারী ছিলেন অনার্যরাই আর্যদের চাইতে বেশী? হরপ্পা মহেন-জো-দড়োর মূক প্রতীক থেকে যে সিদ্ধান্ত আমরা পূর্বেই নিতে চেয়েছি তাই কি তবে সত্য যে, অনার্য চিন্তায় উচ্চকোটি কল্পনার অভাব ছিল না? অথচ পাশাপাশিই রয়েছে আশ্চর্য কুসংস্কারজাত ধারণা, ফুস্‌মন্তর আর তুকতাক্।

অত্যুচ্চ দার্শনিক চিন্তার পক্ষে এইসব তুকতাকের মূল্য যে কি, অদ্যাবধি

কেউ বুঝি তা আবিষ্কার করতে পারে নি। অথচ আজ পর্যন্ত সভ্য জগতের মানুষও তো এই তুকতাককে ভয় করে। আছে কি তাহলে কোন সত্য নিহিত এর পেছনে? সমস্তটাই কি আত্মশক্তি? জাগরিত ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার? মৌন পৃথিবী এ গভীর রহস্য উন্মোচনে আর কোন দিন হয়তো মুখ খুলবে না।[১]

থাক। এই তর্ক আপাতত থাক। আর্য-চিন্তার দার্শনিকতা, আর্য কিংবা অনার্য, এ-নিয়ে সময়ের অপব্যবহারে লাভ নেই। আর্য-ঋষিরা বাধ্য হয়েছেন যখন অনার্য-ভাবধারাকে তাদের সংহিতাতে স্থান দিতে তখন আর্য-অনার্য ভেদাভেদের প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। অনার্য নিকৃষ্ট চিন্তা Gresham's Law-এর মত আর্য চিন্তাকে দূর করে—সংস্কৃতির অঙ্গন অধিকার করেছিল, এ প্রশ্ন তোলাও অবান্তর। যখন ঋগ্বেদে এসেছে দার্শনিকতা, অথর্ববেদ তখন সংকলিত হয়েছে চতুর্থ বেদ হিসেবে। ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায় যদি আর্য-অনার্য সংঘাতের পর্যায়—অথর্ব বেদ তবে মীমাংসার। সুতরাং আর্য-অনার্য পার্থক্য করে আর লাভ নেই। বেদে উন্নীত হবার পর অনার্য চিন্তাও তখন আর্য-চিন্তা। সুতরাং বেদের কথাতেই আসা যাক। বহুকে অতিক্রম করে বেদ কি সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক পর্বের বেদ?

প্রত্যেক দেবতারই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব যে সম্ভব নয়, মানুষের মনে এ প্রশ্ন যে একদিন সন্দেহের উদ্রেক করবেই, এ-কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। বস্তুত ঋগ্বেদের বহু ঋষিই যে বহু-দেবতার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তার প্রমাণ ঐ সংহিতাতেই আছে। এক এক একক দেবতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ে পৌঁছে দেবার জন্য চেষ্টার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে অসংখ্য সূক্তে। কেউ কেউ বা সেই তখনই একটা অতিপ্রাকৃত ঐক্য লক্ষ্য করেছিলেন প্রাকৃত-বিভিন্নতার পশ্চাতে। কেউ বা এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক বিশাল ঐক্যের মধ্যে বিধৃত দেখেছিলেন।[২] আবার কেউবা সমগ্র মনুষ্য সমাজকে এক বিশাল পুরুষরূপে কল্পনা করেছিলেন—এই ঐক্যেরই সন্ধানে। ভ্রান্তির ঊর্ধে সত্যে উত্তরণের এই প্রচেষ্টাই বৈদিক সাধনার আসল সৌন্দর্য।

যে ঋগ্বেদের সূক্তে আছে বহু দেবতার কল্পনা, সেই ঋগ্বেদের মন্ত্রেই আছে এমন কথা যা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সংহিতা পথেই বহুর মিথ্যা একের সন্ধানে সার্থকতার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল ঋষিদের মানসে। বহুর বহুত্ব ঘুচে গিয়ে বহুর মধ্যে ফুটে উঠছিল 'এক'। যেমন—ঋগ্বেদেরই কোন এক মন্ত্রে বলা হয়েছে—'বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁকে বলেন ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও স্বর্ণপক্ষ গরুৎ মৎ (সূর্য)। যা 'এক' ঋষিরা তাকেই দিয়েছেন বহু নাম, অগ্নি, যম, মাতরিশ্বন।' ঋগ্বেদের হংসবতী সূক্তে আছে, 'উজ্জ্বল আকাশে তিনি থাকেন আলো হিসেবে, অন্তরীক্ষলোকে বিষ্ণু রূপে এবং যজ্ঞকুণ্ডে হোতৃ (অগ্নি) রূপে।[৩] অতিথি হিসেবে তিনি থাকেন গৃহে, প্রাণ হিসাবে মানুষের মধ্যে'[৪]

(১) জাদুবিদ্যা প্রাচীন কালে ধর্মের সঙ্গে যে একাত্মীভূত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই জাদুবিদ্যার আশ্চর্য ক্ষমতা আজও প্রত্যক্ষ করা যায় প্রাচীন গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের মধ্যে যারা আজও আধুনিক শিক্ষার আলো লাভ করেনি।

(২) বর্তমানে যেমন কোয়ান্টাম ফিজিক্সের Super string তত্ত্ব দেখতে পাচ্ছে।

(৩) এখানে Big bang-এর বিস্ফোরণের পর দৃষ্ট জ্যোতি, দ্বিতীয় দৃষ্ট নীল আকাশ এবং স্থূল জগতে অগ্নির কথা বলা হয়েছে।

(৪) তাপ প্রাণের একটি লক্ষণ, এই জন্য একথা বলা হয়েছে।

সর্বোচ্চ সত্তা হিসাবে শুধুমাত্র অস্তিত্বে। গতিময় ঋত হিসাবে (জাগতিক আইন) তাঁর অস্তিত্ব সর্বত্র। আকাশে, জলে, আলোতে, পর্বতশ্রেণীতে, সত্যে, সর্বত্র তিনিই দীপ্যমান।'

উপরের সূক্ত দুটি পড়ে, কি মনে হয় আপনার? আর্য স্তোত্রের বহু দেবতা কি অবশেষে তার যথার্থ পশ্চাৎপট লাভ করে সত্যসত্যই অর্থবহ হয়ে উঠছে না? এ-কথা কি বোঝা যাচ্ছে না যে, 'বহু' শুধু বহিঃপ্রকাশ মাত্র, তার অন্তরালে চিরন্তন 'এক'-এর ইঙ্গিত ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে আর্যদের কাছে, যাকেই শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছে পরমাত্মা?

যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁর কোন দ্বিতীয় থাকতে পারে না এ কথা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আর্যদের কাছে। পবিত্র বিশ্বাসের মধ্যে ফুটে উঠছে স্বাভাবিক দার্শনিকতা। আর্য-মন বহুর পরিবর্তে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎস হিসাবে একের কল্পনায় নিয়োগ করেছে নিজেকে, ঋগ্বেদের সূক্তেই সেই একের চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত ভাবে ঃ

যিনি আমাদের সকলের পিতা, জন্মদাতা, বিধাতা,
যিনি এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত, যদিও
তিনি বহু দেবতার নাম গ্রহণ করেছেন, তথাপি তিনি 'এক'।
তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের জন্য সকল বিশ্ববাসী আগ্রহাকুল।

সেই বিরাট 'এক'-কে দার্শনিক ধারণায় ধরবার জন্য—ঋগ্বৈদিক প্রথম উদ্ভাবন হল হিরণ্যগর্ভ (ঘন স্বর্ণদ্যোতক স্তর) অথবা বিশ্বকর্মণের, যিনি এই মহাবিশ্বের আদিপুরুষ। এই আদিপুরুষের কল্পনায় আর্যমানস রীতিমত বিশ্লেষণী হয়ে উঠেছে। তার প্রাক্তন স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যিক সততা, সহোদর দার্শনিকতায় বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে তাকিয়েছে মহাজাগতিক উৎপত্তির প্রথম কেন্দ্রটির দিকে। কৌতূহল মিশ্রিত প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ঋগ্বেদের আর্য-মানসে, যেমন, সৃষ্টির মুহূর্তে সেই আদিপুরুষের ভিত্তি ছিল কি? এই মহানুভব সর্বদ্রষ্টা বিশ্বকর্মণ কোথা থেকে এবং কেমন করে তাঁর সৃষ্টি আরম্ভ করেছিলেন?

কি করে তিনি উর্ধে আকাশে এবং নিম্নে ধরণীকে বিস্তৃত করেছিলেন?

বিশ্বকর্মণের হস্ত এবং মুখ সর্বত্র প্রসারিত, এবং সকল হস্ত ও পদের মধ্যেই তিনি বিরাজমান।

সেই একক দেবতা তাঁর হস্ত ও পক্ষ সঞ্চালন করে এই আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু কি ছিল সেই অরণ্য ও বৃক্ষ, যা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে এই পৃথিবী এবং আকাশ?

হে বিজ্ঞজন, তোমরা মনের মধ্যে এ-ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখ এবং বুঝতে চেষ্টা কর, কিসের ভিত্তিতে তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন।[১]

বহুর অসারতা উপলব্ধির পর এই হল সার্থক একের সন্ধানে আর্য-মানসের যাত্রা। কিন্তু উপরের সূক্তটি পড়বার পর আপনার কি ধারণা হয়? একের যথার্থ স্বরূপ কি তাঁরা যথার্থই ধরতে পেরেছিলেন? না বুঝতে

---

১ অতিশূন্যতা স্থিত সুপ্ত ও পরে জাগরিত energy -এর কথা বলা হয়েছে – এখানে

পেরেছিলেন আর্যরা যে সর্বব্যাপী এক ছাড়া দ্বিতীয় কোন কিছু থাকা পর্যন্ত একের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রমাণ হয় না? কিন্তু সর্বাত্মক সেই 'এক' অনুভবের মধ্যে দিয়ে পরবর্তীকালে যেমন প্রকাশ পেয়েছেন, যে একের সন্ধানে লাভ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বকে মায়া বলে মনে হয়েছে অনেকের কাছে; কিংবা সোঽহং বলে সেই উপলব্ধির পর উক্তি করে উঠেছেন কেউ, সেই 'এক'-এর সন্ধানে সংহিতার যুগে তেমন করে আসেনি। অবশ্য কেউ কেউ যদিও এই সংহিতার যুগেই বলে উঠেছেন যে আমিই সব, তবু সেটা সর্বাত্মক আনন্দের স্তরে এসে পৌঁছায়নি। বিশ্বকর্মণের কল্পনা বহুর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ একের কল্পনা, সর্বাত্মক আর্যদের কল্পনা তখনও তেমন স্পষ্ট নয়। কেউ, কিছু দিয়ে এই পৃথিবী তৈরী করেছেন এ-রকম ধারণাই অপূর্ণতার ধারণা। কিন্তু তবুও বহুকে অতিক্রম করে একের সন্ধানে এই অভিযাত্রা সত্যই অপার আনন্দের বিষয়।

সন্দেহ মানুষকে দুর্জ্ঞেয়বাদী করে তোলে, সন্দেহই মানুষকে বস্তুবাদী করে তোলে, আবার এই সন্দেহই কখনও কখনও চূড়ান্ত সিদ্ধিতে নিয়ে যায়। অন্ধ বিশ্বাস যদি নিঃশর্তে না হয়, মানুষকে তা মহাপাপে লিপ্ত করে—অজ্ঞানতার পাপে। সন্দেহ যদি উৎসের সন্ধানে মানুষকে পরিচালিত করে এবং এরই ফলে বিশ্লেষণের সাহায্য উৎসের সন্ধান যদি পায় তাহলে ফুটে উঠে জ্ঞানের আলো। বিবেকানন্দ যাচাই করে নিয়েছিলেন রামকৃষ্ণকে।

কিন্তু সন্দেহ যদি অন্ধ বিশ্বাসের মত অর্ধপথে থেমে যায়, সেটাই হয় মারাত্মক। যেমন হয়েছে বর্তমান ইউরোপে। যাঁরা অতীন্দ্রিয়ে অবিশ্বাস করে শুধুমাত্র বস্তুতে আস্থা স্থাপন করেছেন তাঁরা উৎসে যেতে পারেন নি—তারা হয়েছেন, বস্তুবাদী।[১] অবশ্য বর্তমান পদার্থ বিজ্ঞান বস্তুকে আজ যে পর্যায়ে নিয়ে এসেছে তাতে বস্তুই সত্য, এই ধরনের বিশ্বাসেও আর আস্থা স্থাপন করা সম্ভব নয়—আবার বিশ্লেষণী মনের আলোয় যারা পরম সত্যের সন্ধান করে এক নিঃসীম অর্থহীন উপস্থিতিই শুধুমাত্র দেখেছেন যেমন বর্তমান ইউরোপের অস্তিত্ববাদীরা, তাঁরা সমস্ত জীবনটাকেই এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঠেলে দিয়ে চরম হতাশায় ভুগছেন। কিন্তু আর্য ঋষিদের কৃতিত্ব এইখানে যে, বহু প্রকৃতি দেবতার আরাধনা করতে করতে অবশ্যম্ভাবীরূপে একদিন তাঁদের মনে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল তা অর্ধপথে সমাপ্ত হয়নি। বহুর প্রতি সন্দেহ সর্বশ্রেষ্ঠ একের সন্ধানে ব্যস্ত করে তুলেছিল তাঁদের। কিন্তু যখন সেই 'এক'-কে কল্পনায় এনেছিলেন, তাঁরা, তখনই চূড়ান্তরূপে তা তৃপ্তিদায়ক হয়নি। সুতরাং আবার আরম্ভ হয়েছিল সাধনা, চরৈবেতি। অবশেষে সেই 'এক'-এর যখন সন্ধান পেয়েছিলেন তখন উপনিষদে এসে শান্ত হয়েছিলেন তাঁরা।

কিন্তু এই নিঃশ্রেয়সের সাধনায় প্রথমাবধিই একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আর্যদের কাছে যে, সত্যের সন্ধান দ্বিতীয় ব্যক্তির বিচার বিশ্লেষণে হবে না। নিজের হৃদয়কে বিস্তৃত করে দিয়ে প্রত্যেককে নিজেকেই সেই

১ অবশ্য এই বস্তুবাদ ত্রিযাত্রিক ধারণাকে যতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানে আবদ্ধ ছিল ততদিন পর্যন্তই ছিল। বর্তমান বহু মাত্রিক বিজ্ঞানের আবির্ভাবে এই বস্তুতান্ত্রিকতার ভিত্তি উবে যাচ্ছে।

সাধনায় অগ্রসর হতে হবে। তাই উপনিষদের যুগে যখন সত্য আপন আলোয় উদ্ভাসিত আর্য-ঋষিদের কাছে, তখনও কাউকে তারা বিশ্লেষণী বাক্-জাল বিস্তার করে সত্যের স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। সত্যের ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, এবার নিজের মনে ধ্যান করে তার স্বরূপ উপলব্ধি কর। তাইতো ঋষি বরুণের পুত্র ভৃগু যখন পিতার কাছে এসে পর ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করলেন বরুণ তাকে বললেন—নিজের ধ্যানে তাকে জানবার চেষ্টা কর। শুধু তাকে সাহায্য করবার জন্য পর ব্রহ্মের[1] এক রূপরেখা তুলে ধরলেন মাত্র। তার মধ্য থেকে পর ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করার দায়িত্ব প্রত্যেকের নিজের। বরুণ পুত্রকে বললেন, যা থেকে এই অস্তিত্বময় জগৎ, এবং যাতে এই সব স্থিত, এবং যার প্রতি সবকিছু ধাবমান এবং যাতেই এই সব প্রবেশ করে তাই পর ব্রহ্ম। এইবার তুমি নিজে চিন্তা করে অনুভব কর, কী সেই উৎস, মধ্য এবং অন্ত! ভৃগু চিন্তা করে দেখলেন অন্ন অর্থাৎ বস্তু। বস্তু থেকে জন্ম, বস্তুতে স্থিতি এবং বস্তুতেই লয়। বাহ্যত এই স্থায়ী প্রকৃতিই তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল বস্তু হিসাবে। বস্তু বলতে তিনি অন্ন শব্দ ব্যবহার করেছিলেন এই কারণে যে, মাতৃগর্ভে মা কর্তৃক গৃহীত অন্নের রস আহরণ করেই ভ্রূণের বৃদ্ধি, জন্মগ্রহণের পর এই খাদ্যের সাহায্যেই সে বেঁচে থাকে এবং মৃত্যুতে দেহ অপরের খাদ্য হয়। এই জন্যই তিনি পিতাকে এসে বললেন যে, হ্যাঁ, তোমার ধাঁধার জবাব আমি পেয়েছি—পর ব্রহ্ম হল অন্নম। পিতা কিন্তু তর্ক বিতর্ক কিছুই করলেন না। শুধু বললেন আবার চিন্তা করে দেখ। ভৃগু আবার চিন্তা করতে লাগলেন। এবার তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে অন্ন শুধুমাত্র জীবিতদের জন্য। মৃতের জন্য নয়। সুতরাং তার মনে হল অন্ন নয়, প্রাণই হল উৎস। প্রাণ থেকেই প্রাণের সৃষ্টি। সর্বশেষে নতুন প্রাণেই প্রাণের রূপান্তর। সুতরাং তিনি পিতার কাছে এসে বললেন। এবার পর ব্রহ্মের স্বরূপ আবিষ্কার করেছি আমি, তিনি প্রাণম। পিতা বললেন আবার চিন্তা করে দেখ। ভৃগু আবার চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর মনে হল প্রাণ কোন মানসিক ক্রিয়া ব্যতীত হতে পারে না। সুতরাং এই মানস ক্রিয়াতেই সৃষ্টি এবং এই মানস ক্রিয়াতেই তার স্থিতি এবং তাতেই লয়। সুতরাং তিনি পিতার কাছে ছুটে এসে বললেন আমি পেয়েছি পর ব্রহ্মের স্বরূপ, তিনি মানস ব্যতীত আর কিছুই হতে পারেন না। হল না, পিতা বললেন আবার চিন্তা কর। ভৃগু আবার চিন্তা করলেন। দেখলেন এই মানসের প্রক্রিয়া গভীর দর্শন ব্যতীত অস্পষ্ট। সুতরাং দর্শনই হল মূল। সত্যের স্বরূপ দর্শনের মধ্যেই জ্ঞাত হতে পারে। সুতরাং দর্শন থেকেই উৎপত্তি, দর্শনেই স্থিতি, দর্শনেই পরিণতি। ভৃগু পিতার কাছে এসে বললেন, জেনেছি তাঁকে, তিনি বিজ্ঞানম। পিতা বললেন—আরো চিন্তা করে দেখ। ভৃগু আবার চিন্তা করতে লাগলেন—এবার তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ সেই পর ব্রহ্মের উপলব্ধি পেয়ে গেলেন আনন্দের মধ্যে। দেখলেন, এই অনন্ত জগৎ এক অকারণ উদ্বেলিত অবর্ণনীয় আনন্দ থেকেই প্রকাশিত, আনন্দে স্থিত, এবং আনন্দে অনুপ্রবিষ্ট।

১ শাস্ত্রে ব্রহ্মন শব্দটিরই উল্লেখ আছে। কিন্তু ব্রহ্মন অনন্ত নয় বলে লেখক পরব্রহ্মন বা পরব্রহ্ম শব্দ ব্যবহার করছেন

কিন্তু সেই আনন্দ অনুপ্রবিষ্ট। কিন্তু সেই আনন্দ স্বরূপকে ভাষায় বোঝানো যায় না। সেই স্নিগ্ধ আনন্দমে শুধু নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়। ভৃগু আর পিতার কাছে ফিরে এলেন না, বললেন না যে আমি তাঁকে পেয়েছি।

সেই অবাঙ-মানসগোচরম জগৎই আর্যদের অভিলষিত। ভ্রান্তি থেকে ভ্রান্তির স্তর পার হতে হতে তবেই সেই অভ্রান্ত জগতে গিয়ে তারা পৌঁছুতে পেরেছেন। কিন্তু আর্য-ঋষিরা সেই আনন্দ স্বরূপের ইঙ্গিত দিলেও স্পষ্ট করে বলে দেন নি। বলেছেন, সেই মহান 'এক -কে নিজের চেষ্টায় জান। 'বিশ্বকর্মণ এক বিশেষ পর্যায় সত্য-সন্ধানের। কিন্তু সেই সত্যকে ব্যাখ্যা করে প্রকাশেব চেষ্টা নেই। সমস্যাব সমাধানে এগিয়ে আসতে বলা হয়েছে প্রত্যেককে নিজের—'হে বিজ্ঞজন তোমরা মনের মধ্যে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখ, এবং বুঝতে চেষ্টা কর কিসের ভিত্তিতে তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরী করেছিলেন। সত্য সন্ধানের এই আকুলতার সঙ্গে সত্য-সন্ধানের পদ্ধতি সম্পর্কেও যে আর্যদের মধ্যে সঠিক ধারণা এসেছিল, 'বিশ্বকর্মণ তারই আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কোন একটা প্রচলিত বিশ্বাস সম্পর্কে অবিশ্বাস দেখা দেয তখনই যখন মানুষ গভীরভাবে চিন্তা আরম্ভ করে। বহু দেব কল্পনার ত্রুটি যখন আর্য-মানসে ধরা পড়তে লাগল তখনই তার অন্ধবিশ্বাসের পর্ব গেল শেষ হয়ে। অতি-প্রাকৃতের প্রতি বিচারহীন আনুগত্যের পবিবর্তে এল দার্শনিক বিশ্লেষণের মনোভাব। এল মানস বিশ্লেষণ।

অন্ধ বিশ্বাস হল কুসংস্কার। কিন্তু যে কবিচিত্ত অপার বিস্ময়ে হৃদয়েব রসধারা ঢেলে দিয়ে সুক্ত রচনা করেছিল একের পর এক—সেই কবিচিত্তের মধ্যে অন্ধতা ছিল না ছিল তীব্র অনুভব। এই অনুভবই তাঁকে দার্শনিক মানসিকতার অভ্যুদয়ের পূর্বেই অতি-প্রাকৃত এক নৈর্ব্যক্তিক কারণের সন্ধান দিয়েছিল, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে যে-কারণই হল একমাত্র উৎস। কিন্তু সেই কারণের অদ্বৈত স্বরূপ তেমন স্পষ্ট ছিল না তাঁদের কাছে। সেই মহাজাগতিক সত্তা-আনন্দ স্বরূপে না এসে এক পরমপুরুষ রূপে আবির্ভূত হয়েছিল তাঁদের কাছে। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে সেই পরম পুরুষেরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইভাবে ঃ

পুরুষ হলেন সহস্রচক্ষু, সহস্রমুখ, সহস্রপদ
তিনি এই পার্থিবলোকে ব্যাপ্ত এবং পৃথিবী ছাড়িয়েও দশদিকে প্রসারিত।
যা ছিল, এবং ভবিষ্যতেও যা হবে, সবই সেই পুরুষ।
তিনি যেমন কর্মফল দ্বারা স্পৃষ্ট নন তেমনই অমৃতত্বেরও নিয়ন্তা।
সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই মহিমাভাস্বর, কিন্তু সেই পুরুষ এই সৃষ্টিরও ঊর্ধে।
সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁর এক চতুর্থাংশ মাত্র, বাকী তিনভাগ
আছে অমৃত দ্যু-লোকে। [১]

যে ঋগ্বেদে বহু প্রকৃতির আরাধনা সেই ঋগ্বেদেই এই পুরুষ সূক্তকে

(১) আধুনিক কোয়ান্টাম ফিজিক্সে জানা যাচ্ছে অনন্ত শূন্যতার ক্ষমতার সামান্য অংশ মাত্র জুড়ে রয়েছে।

কেমন লাগছে আপনার? মনে হচ্ছে না কি যে, মন্ত্র স্রষ্টা সেই ঋষিরা এই দৃশ্যমান জগৎকে এই মহাকারণের প্রকাশ রূপে দেখেছিলেন? এবং সেই মহাকারণ দৃশ্যমান হয়েও অতিদৃষ্ট? বস্তুত আর্য-ঋষিদের সৎ কবিমানস সেই প্রথম পর্যায়েই যখন প্রত্যেকটি খণ্ড প্রকৃতিকে দেবতারূপে কল্পনা করে তাঁকে সর্বব্যাপী করে তুলবার চেষ্টা করছিলেন বর্ণনা ব্যঞ্জনায়, তখনই তাঁর হৃদয় তন্ত্রীতে অতি-প্রাকৃত আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সত্যানুসন্ধিৎসায়। কখনই খণ্ড ও সীমিতের সাধনায় আর্য-মানস তাকে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখতে চায়নি। আর্যদের প্রকৃতি বন্দনার মূল তাৎপর্য সেখানেই।

হিরণ্যগর্ভ ও বিশ্বকর্মণ কল্পনাতে জগৎ-কারণ সম্পর্কে আর্যদের ঈশ্বর ছিলেন এমন এক শক্তি, যিনি অতি-প্রাকৃত আবির্ভাবে মানুষের কাছে জ্ঞাত। কিন্তু পুরুষ সূক্তে তিনি সর্বধারী অর্থাৎ বিশ্বজগতের সব কিছুই সেই মহান ঈশ্বর, পরম পুরুষ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁরই অঙ্গ বিশেষ।

ইউরোপীয়েরা এই ধরনের চিন্তাকেই বলে। সর্বেশ্বরবাদ, Pantheism অর্থাৎ সমগ্র-জগৎ ঈশ্বরময় এই কথা। সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে এই সর্বেশ্বরবাদ আর বহু ঈশ্বরবাদে কোন তফাৎ নেই। যদি প্রত্যেক জিনিসই ঈশ্বর হন, তাহলে যত জিনিসই আছে ততই ঈশ্বর। সুতরাং বহু ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ একই জিনিসের দুইরূপ মাত্র। কিন্তু না, ভারতীয় ঋষিদের কাছে বহু ঈশ্বরবাদই বলুন বা সর্বেশ্বরবাদই বলুন ইউরোপীয় অর্থে কখনই ধরা দেয়নি। প্রকৃতির বহু বিচিত্র দৃশ্যও প্রতিপদে আর্য-ঋষিদের কবি কল্পনায় অতি-প্রাকৃত দীপ্তিতে ভরে উঠতে চেয়েছে। সর্বেশ্বরবাদের চিন্তাও সেইভাবে দৃশ্যাতিক্রমকারী। যখন 'প্রত্যেক' বলতে পৃথক পৃথক বোঝায় তখনই সর্বেশ্বরবাদ ও বহু ঈশ্বরবাদে কোন তফাৎ থাকে না। কিন্তু এই দৃশ্যমান জগতের সত্যতা আর্য-ঋষিরা কখনই স্বীকার করেন নি। দৃশ্যমান জগতিক সত্য শুধুমাত্র ব্যবহারিক জগতে, কিন্তু যে জগৎ সত্য, চিরন্তন, আর্য-ঋষিদের সর্বব্যাপীত্বের অর্থ নিহিত সেইখানেই। সুতরাং পুরুষসূক্তে সর্বেশ্বরবাদের লক্ষণ থাকলেও তা হল লোকোত্তর। কবি মনসে অতি প্রাকৃত অনুভবে যে সত্য ঈশ্বররূপে প্রতীয়মান, পুরুষসূক্তে তাই দার্শনিক মানসপুষ্ট আর এক ধাপ উচ্চপর্যায়ের অনুসন্ধান। সেই অনুসন্ধান আর্য-ঋষির কবিসত্তাকে আরও উন্নীত করে ব্যাখ্যাতীত এক শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করেছে নাসদীয় সূক্তে। যে ঋগ্বেদের ঋষি প্রকৃতি বন্দনা থেকে এগিয়ে গিয়ে কল্পনা করেছেন হিরণ্যগর্ভ, বিশ্বকর্মণ এবং পরমপুরুষের, তিনিই অভূতপূর্ব কবি-সিদ্ধিলাভ করেছেন নাসদীয় সূক্তে। যে এক ও অদ্বিতীয়ের প্রয়াসে তাঁর সমস্ত হৃদয় পরম অনুসন্ধিৎসায় আকুলি-বিকুলি করছিল, সেই অনুসন্ধিৎসাই এক 'প্রায়চরমসিদ্ধি' লাভ করেছে। ঈশ্বরের চিন্তা যখন সীমিত নয়, তখনই ঈশ্বর বোধের জন্য অবধারিতরূপে সৃষ্টি করেছে—হিরণ্যগর্ভ এবং বিশ্বকর্মণকে। সেই অনুসন্ধিৎসা থেকেই নাসদীয় সূক্তেরও উৎপত্তি।

বহুদেবতার সাধনা করেছেন যখন আর্য-ঋষিরা, তখনও তাঁরা ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ও বিশ্বকর্মণকে সমগ্রজগতের স্রষ্টা হিসাবে কল্পনা করে সত্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সত্য সম্পর্কে তাঁদের প্রাথমিক পর্যায়ের ধারণা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। যেমন, কোন কোন ঋষি সেই সৃষ্টিকর্মকে অনুমান

করেছেন অত্যন্ত ছেলেমানুষের মতন ;—সূত্রধন যেমন গৃহ তৈরি করে যেন তেমনই ভাবে দেবতারা তৈরি করেছিলেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। বিশ্বকর্মণ পর্যায়েও এই দুর্বলতা দূর হয়নি, তাই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ঃ সৃষ্টির সরঞ্জাম হিসাবে বৃক্ষ ও কাষ্ঠ পেলেন তিনি কোথায় ? পরবর্তীকালে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে-বটে কিন্তু সংহিতার এই পর্বে ঋষিরা তার জবাব পাননি।

আর্য-ঋষিরা যখন একেশ্বরবাদের নিকটবর্তী—তখনই প্রশ্ন এসেছে ঈশ্বর কি আপন স্বভাব থেকেই সৃষ্টি করেছেন এই দৃশ্যমান বিশ্ব ? অথবা তাঁরই পাশাপাশি অবস্থিত কোন বস্তু থেকে তৈরি কোরেছেন এই সব ? বৈদিক ঋষিরা দুটো মতের কথাই বলেছেন। হিরণ্যগর্ভ যখন বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তখন অদ্বৈত একের কল্পনা করতে পারেন নি ঋষিরা। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে মহাঅম্বুধি[১] ছিল হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি সেই অতলস্পর্শী মহাম্বুধি থেকেই। তখন সর্বদিকে এক মহা বিশৃঙ্খলা। সেই মহা বিশৃঙ্খলা থেকে হিরণ্যগর্ভ তৈরি করলেন এই বিশ্বজগৎ।[২] কিন্তু যখনই প্রশ্ন এল এই বিশৃঙ্খলাই বা তৈরি হল কেন ? আর সেই আদিম অম্বুরাশির স্রষ্টাই বা কে ? হিরণ্যগর্ভ কল্পনাকারী ঋষিরা তার জবাব দিতে পারেন নি। এর জবাব এসেছে পরে মনুর কাছ থেকে, হরিবংশ থেকে, পুরাণ থেকে। তাঁদের মতে ঈশ্বরই ছিলেন সেই বিশৃঙ্খলার স্রষ্টা। ঈশ্বর নিজের ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে সেই বিশৃঙ্খলা তৈরি করেন এবং ভিতর বীজ স্থাপন করেন।[৩] সেই বীজ স্বর্ণ অঙ্কুর হলে তাতে আত্মপ্রকাশ করেন ব্রহ্মা বা স্রষ্টা ভগবান।[৪] এবং এই উৎপত্তির রহস্যভেদে তিনি নিজেই বলে উঠেন—'আমি হিরণ্যগর্ভ, সেই পরম শক্তি স্বয়ং; হিরণ্যগর্ভ আকারেই (পুনরায়) প্রকাশিত হয়েছি।' এইভাবে সংহিতা যুগের হিরণ্যগর্ভ-চিন্তার দ্বৈতকে একের মধ্যে সীমিত করার প্রয়াস পেয়েছেন পরবর্তী আর্য পুরুষেরা। কিন্তু সেই 'এক' চিন্তা, সংহিতার মধ্যে তত সফল হয়নি তাই হিরণ্যগর্ভ উৎপত্তির ত্রুটি পূরণের জন্যই সম্ভবত নাসদীয় সূক্ত, সৃষ্টি রহস্যের মূল অনুসন্ধান থেকে ঈশ্বর স্বরূপ লাভের চেষ্টা। উপনিষদের আনন্দ স্বরূপের ধারণা এই নাসদীয় সূক্তেও নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবি কল্পনায় এই সূক্ত আশ্চর্য রকমে মহিমাময়।

সংহিতার যুগে আর্য কবি কল্পনার সেই বিস্ময়কর অগ্রগতি সৃষ্টির উৎস সন্ধানে ব্যক্ত হয়েছিল এইভাবে ঃ

'তখন (সৃষ্টির পূর্বে) না ছিল কোন বস্তু, না অবস্তু।
না ছিল পার্থিব জগৎ, না ছিল আকাশ।[৫]
তাহলে কি ছিল ? কেই বা থাকতেন কোথায় ?
শুধু কি ছিল অতলস্পর্শী সেই আদিম জলরাশি ?

১) অধুনা জ্যোতির্বিজ্ঞান লক্ষ্য করেছে যে মহা বিশ্বে বিন্দু বিন্দু করে হাইড্রোজেন কণা পুঞ্জিভূত হচ্ছে। সৃষ্টির পূর্বে আর্যদেব এই আদিম বারি কল্পনা হয়তো নতুন করে ভাববার বিষয়।

(২) এই বিশৃঙ্খলা Blackhole-এর অন্তর্ভুক্ত Chaos-এর মত ? প্রাচীন ঋষিরা কি এই Blackhole কল্পনা করতে পেরেছিলেন ?

(৩) সম্ভবত অতিশূন্যতাই এই ঈশ্বর। ইচ্ছাশক্তি হল Potential energy স্বাভাবিক স্ফুটনের আবেগ।

(৪) ব্রহ্মাকে বর্তমান কোয়ান্টাম ফিজিক্স Neutron field বলে বর্ণনা করতে চায় যা থেকে আপনা আপনি electrion ও Proton নির্গত হয়।

(৫) এটাই হল বর্তমান ফিজিক্সের Singularity

তখন না ছিল মৃত্যু, না অমৃতত্ব
না ছিল রাত্রি, না দিন বা দিন রাত্রির পার্থক্য।
তখন ছিল শুধু রুদ্ধশ্বাস অচঞ্চল 'এক'।
সেই 'এক' ছাড়া আর কেউ ছিল না।
তখন অন্ধকার ছিল ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন! [১]
অবিচ্ছিন্ন আদিম বারিতে আচ্ছন্ন ছিল সব।
যা ছিল, সবই ছিল মায়াচ্ছন্ন।
তার মধ্য থেকে সৃষ্টি প্রকাশিত হল (ইচ্ছার) উত্তাপে।
সেই মহামানসে প্রথম দেখা দিল ইচ্ছা এবং
সেই ইচ্ছাই মহামানস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এল বীজের আকারে।
সত্যদ্রষ্টা কবিরা অনুভবের মধ্যে সেই অপ্রকাশ থেকে দেখতে
পেলেন প্রকাশ।
সৃষ্টির যে আলো প্রকাশিত হল, সেটা কোথায় দেখা দিয়েছিল
প্রথম? নিম্নে বা ঊর্ধ্বে?
ছিল বীজ বহনকারীরা, ছিল শক্তি; স্বয়ংক্রিয় শক্তি নিচে
এবং ইচ্ছা ঊর্ধ্বে [২]
সেই প্রথম প্রকাশকে কে দেখেছিল? কেই বা সেকথা
জানিয়েছে?
কোথায়ই বা এই সৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছিল?
দেবতার উৎপত্তি এই সৃষ্টিরও পরে। কে তবে বললেন
কোথা থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি?
যার থেকে এই সৃষ্টি, তিনি কি নিজে সৃষ্টি করেছিলেন বা
করেন নি?
দ্যু-লোকের সেই সর্বোত্তম স্রষ্টা
একমাত্র তিনিই জানেন (এর উত্তর), কিংবা
তিনিও জানেন না?

ঈশ্বর সম্পর্কিত যথার্থ ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে সৃষ্টির রহস্য। ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ, এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর বাইরে অপর কেউ যদি থাকে তাহলেই তাঁর সীমাবদ্ধতা। যদি না থাকে, তাহলে এ সৃষ্টি কি? দুই না থাকলে সৃষ্টি হয় কোথা থেকে? পার্থিব অর্থেও দুই থাকা চাই, মানস অর্থেও দুই প্রয়োজন। সৃষ্টির জন্য চাই পুরুষ ও প্রকৃতি। যদি এই দ্বৈতে বিশ্বাস না করেন তাহলে একটা মানসিক প্রক্রিয়ার কথা স্বীকার করতেই হবে। যে কোন ভাবেই হোক সেই 'একে'র মধ্যে কোন প্রকার একটা সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিলই, না হলে সৃষ্টি সম্ভব নয়। একের মধ্যে কোন প্রকার সংঘাতের সৃষ্টি হওয়া মানেই একের অভাব সূচিত করা। কিন্তু তাহলে সেই এক সীমিত হয়ে পড়ে। আর নয়তো বলতে হয় যে সৃষ্টিটিষ্টি যা দেখছি, সবই মায়া। এর কোন সত্যতা নেই। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসে, তাহলে এই ভ্রান্তিই বা কার? এই সব প্রশ্নের জবাব যেখানে আছে, সেখানেই আছে ঈশ্বর সম্পর্কিত

(১) Blackhole-এর অন্তর অবস্থার সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে।
(২) এখানে সায় ও দেশের উপর মাধ্যাকর্ষীয় শক্তির প্রভাবের অপূর্ব ব্যঞ্জনা রয়েছে

এই সব প্রশ্নের জবাব যেখানে আছে, সেখানেই আছে ঈশ্বর সম্পর্কিত সমস্যার চূড়ান্ত নিস্পত্তি। এটা হল দার্শনিকতা। এই দার্শনিকতা ছাড়া ধর্মের গুরুত্ব নেই। দার্শনিকতা ছাড়া অন্ধবিশ্বাস, বা আপ্ত বাক্যের উপর নির্ভরশীল ধর্ম এক ধরনের গোঁড়ামী, ইংরেজীতে যাকে বলে fanaticism.

বৈদিক ধর্মের প্রারম্ভ পর্যায়ে আবেগ থাকলেও অন্ধতা নেই। কবি-হৃদয়ের অনুভূতির মধ্যে অতীন্দ্রিয় ছোঁয়া দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আর্য ঋষিদের মনে পরমের জন্য আকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। সেই আকৃতি অবধারিত রূপে দেখা দিয়েছে দার্শনিকতায়। সংহিতা পর্বে বৈদিক ঈশ্বর-অন্বেষাতে সর্বাপেক্ষা দার্শনিকতাপূর্ণ বোধহয় এই নাসদীয় সূক্ত। এই ঋগ্বৈদিক সূক্তে সৃষ্টি সম্পর্কে অত্যন্ত উন্নত চিন্তার পরিচয় রয়েছে।

সৃষ্টির পূর্বে এক মহান অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু ধারণার মধ্যে আনা যায় না। কিন্তু এই অস্তিত্ব Positive না Negative? যদি positive হয়, তাহলে সৃষ্টি চিরন্তন; যদি না হয়, তাহলে শূন্যে থেকে বস্তু এল কি করে? [১] সমস্যা ঘোরতর। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে হয় যে, আর্যমানস সেই কত বহুদূর পুরানো দিনেও এই সমস্যা অনুধাবন করতে পেরেছিল—যে ধারণা করতে আধুনিক কোন শ্রেষ্ঠ এক কবির রীতিমত অনুশীলন করতে হয়েছিল সম্ভবত আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাল ফিজিক্স। নাসদীয় সূক্তের ভাবের কিছু অংশকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিয়ে তার পাশে যদি বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি T.S. Eliot-এর একটি কবিতার অংশ বিশেষ তুলে ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে দুইয়ের মধ্যে কী আশ্চর্য সামঞ্জস্য। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্ব তৈরী হবার পরও যদি কোন কবিকে গলদঘর্ম হতে হয় সৃষ্টির প্রাক অবস্থা অনুভব করতে তাহলে বৈদিক যুগের ঋষিদের কবি-কল্পনায় কী অপরিসীম সত্য অনুভব ছিল ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। সম্ভবত বৈদিক ঋষিদের কবি-কল্পনা আধুনিক কবি-কল্পনার চাইতেও অগ্রসর ছিল এ ব্যাপারে। উপনিষদের দার্শনিকতার পূর্বে এ সত্যি এক আশ্চর্য বিস্ময়। নিম্নে নাসদীয় সূক্তের কিছু অংশ এবং T.S Eliot-এর কবিতার কিছু অংশ তুলে ধরা হল ঃ

Then there was neither Aught nor Naught
    no air or sky beyond
What covered all? where rested all ?
    In watery gulf Profound?
Nor death was there, nor deathlessness
    nor change of night and day.
That one breathed calmly, self-sustained
    naught else beyond it lay.
T.S. Eliot: Neither from nor towards; at the still
    Point there the dance is.

(১) বর্তমান কোয়ান্টাম ফিজিক্স বলছে total energy the universe is exactly zero. অবশ্য zero কখনও শক্তিবিহীন নয়। কারণ তার singularity রয়েছে। আসলে অতিশূন্যতাস্থিত যে Potential energy space তৈরি করে সেই বঙ্কিম দেশ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বস্তু সত্তার উদয়।

But neither arrest nor movement, And do not
call it fixity.
Where past and future are gathered......

এই সঙ্গে space time and poetry নামে আধুনিক কবি ও কাব্য সমালোচক Lawrence Durrel-এর একটি আলোচনার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছিঃ It was the first indication to come from science that the material universe was not the solid, substancial objective thing people had taken it to be. What was it? 'To Talk' says a scientific writer of an electric Charge existing apart from ordinary matter seemed to many minds as incomprehensible as talking about motion without anything that moves. Indeed the discovery could not be understood unitl our notions of matter become more abstract. The notion of substance had to be replaced by the notion of behaviour.]

T.S. Eliot-এর উল্লিখিত কবিতার চেতনা বিজ্ঞানপ্রসূত। এবং বিজ্ঞান যে গতি এবং স্থিতি সংযুক্ত 'এক'-এর চরিত্র সম্পর্কে ধারণাপুষ্ট, উপরের ইংরেজী আলোচনা থেকেই কথাটা প্রমাণিত। আরও একটু স্পষ্ট করে বিজ্ঞানের কথা টানা যেতে পারে। নাসদীয় সূক্তে 'There was neighter nor Naught' বলে অর্থাৎ অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব মিলে যে এক অবস্থার কথা বলা হয়েছে, অধুনা বিজ্ঞান তার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। যেমন অধুনা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, আলোর গতিতে কোন Mass-কে ঠেলে দিলে তা গতি হারিয়ে ফেলে এবং ভারি হয়ে ওঠে। এ যদি সত্য হয়, তাহলে প্রমাণ হয় যে তীব্রতম গতি এবং স্থিতি একই জিনিস। বৈজ্ঞানিক ভাবে এ-কথা যদি সত্য হয়, তাহলে নিশ্চয়ই নাসদীয় সূক্তে প্রাকসৃষ্টি-মুহূর্তে অবস্থার বর্ণনা অত্যন্ত নির্ভুল। খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হবার পরও যে-ধারণা সৃষ্টি হতে প্রায় দু'হাজার বছর লেগেছে, সেখানে খ্রীষ্টপূর্ব কমপক্ষে দেড়হাজার বছর আগে (ঋগ্বেদের রচনাকাল সম্পর্কে সব স্বীকৃত সর্বাপেক্ষা পরবর্তী সময়) আর্য-ঋষিদের এই ধারণা (হয়তো আর্য অনার্যের সম্মিলিত ধারণা) সত্য সত্যই বিমুগ্ধ করে দেবার মত। অত প্রাচীনকালের এত আধুনিক ধারণা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও অধিকাংশ মানুষের প্রায় ধারণাতীত। অথচ তবু, তবু দেখুন ঈশ্বর সম্পর্কিত ভারতীয় অন্বেষাতে ঋগ্বেদের এই নাসদীয় সূক্তের অনুভবও স্পষ্ট নয়! তাকে আরও দীর্ঘপদক্ষেপে এগুতে হয়েছে এক এবং অদ্বিতী আনন্দস্বরূপের সন্ধানলাভের জন্য। [১]

প্রারম্ভিক সর্বব্যাপী এক নিস্তরঙ্গ বোধের মধ্যে প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল অহং-এর। অহং-এলেই অনহং এসে যায় সঙ্গে সঙ্গে। তর্ক-বিদ্যার এই ত্রুটির

(১) তবে এ ধরনের চিন্তা শুধু প্রাচীন কালে হয়েছিল একথা সত্য নয়। আফ্রিকা, পূর্বআফ্রিকা, চীন জাপান। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আদিম মানুষ সবার মধ্যেই এক সময় এ ধারণা ছিল। এজন্য পর্যটক Fritiof Capra-র Tao of Physis, Carlsagan -এর Cosmos এবং God and New Physics

তবে এ ধরনের চিন্তা শুধু ভারতবর্ষেই প্রাচীনকালে হয়েছিল একথা সত্য নয়। কাম্বাস, পূর্ব আফ্রিকা, চীন, জাপান, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আদিম মানুষ সবার মধ্যেই এক সময় এ ধারণা ছিল। এজন্য পাঠক Frity of capra-এর Tao of physics, Carl Sagan এর Cosmos Paul Davies-এর God and New physics, M. Kaku ও J. Trainer-এর Beyond Einstein প্রভৃতি বিজ্ঞানগ্রন্থ পড়ে দেখতে পারেন।

কথাও জ্ঞাত ছিলেন আর্য-ঋষিরা। তাই অহং এবং অনহং-এর দ্বন্দ্ব এড়াতে আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে এক স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাবের মধ্যে; মহা অস্তিত্বের মধ্যে অস্তিত্বের উদয় অর্থাৎ অনন্তের মধ্যে সহজাত প্রাণস্পন্দনের প্রকাশ হিসেবে। অন্তর্নিহিত এক ইচ্ছার উত্তাপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ—যে ইচ্ছার উত্তাপকে বলা হয়েছে মানস রেতঃ। এই সহজাত ইচ্ছা ঠিক চিন্তার মত নয়। চিন্তা মানেই অচিন্তার মত আর একটা কিছুকে বোঝাতে চায়, সেই জন্যই কল্পনা করা হয়েছে এক নিঃশর্ত ইচ্ছার—যার সহজাত ধর্মই হল প্রকাশ এবং সেই স্বত-বিস্ফোরিত প্রকাশ থেকেই প্রকাশমান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অস্তিত্ব অনস্তিত্ব দুইকে অতিক্রম করেই যার রহস্যময় এক স্থিতি। এই ইচ্ছাই হল পুরুষের সহজাত গুণ। আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল পুরুষের সেই গুণমাত্র। সৎ কবি-হৃদয়ে জাগরিত সৃষ্টি-রহস্যের এই মূল সন্দেহাতীত হতে গিয়েও সন্দেহের অতীত হতে পারেনি ঋগ্বেদে। তাইতো আবার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ঋষির মনে 'কো বেদ'? কে জানে? ঋগ্বেদের ঋষি এর আর জবাব খুঁজে পাননি। আরও পরবর্তী কালের ঋষিরা তারই জবাব পাবার চেষ্টা করেছেন মায়ার মধ্যে। অর্থাৎ এই দৃষ্ট জগতও বস্তু-সত্য নয়।[১] সবই সেই অবস্তু। সতের গুণ মাত্র।

তবুও এই নাসদীয় সূক্ত ঋগ্বেদের যুগের এক অভূতপূর্ব অগ্রগতি। পূর্বাহ্নেই বিশ্বকর্মণের সৃষ্টিতে আদি-সলিলে-ধৃত-প্রথম বীজের যে-কল্পনা করা হয়েছিল তাতে যে দ্বৈতের প্রকাশ ছিল, পুরুষ ও প্রকৃতির ছায়া, নাসদীয় সূক্তে তা নেই। সেই আদি সলিল হয়তো গ্রীক ধারণার মহাজাগতিক বিশৃঙ্খলা বা খ্রীষ্টানদের Genesis-এর 'আকৃতিহীন মহাশূন্য'। এই দ্বৈত থেকেই অনন্ত নাগবক্ষ শায়িত নারায়ণ কল্পনা।[২] ইচ্ছা, মন এবং বাক্যের প্রকাশ সীমাহীন চিৎ থেকে। ঋগ্বেদের বিশ্বকর্মণ বা হিরণ্যগর্ভ পর্যায়ে এসে খ্রীষ্টীয় জগৎ-উৎসের চিন্তা গতিহীন, আর এগুতে পারেনি। সেখানে জগৎ-সৃষ্টিতে সেই অনন্ত ইচ্ছার প্রকাশ এইভাবে—'Let there be and there was.' "He thought, I will create the worlds, then he created the various worlds, water, light etc." কিন্তু নাসদীয় সূক্ত সৎ কবিহৃদয়ের আলোড়নে আশ্চর্যভাবে অদ্বৈত আলোতে উদ্ভাসিত। নাসদীয়তে 'দুই'-এর স্বীকৃতি নেই। প্রকৃতি এবং পুরুষ এখানে 'এক'-এরই দুই অবস্থা মাত্র। সেই মহান অস্তিত্ব অহংও নয়, অনহংও নয়। তা এ দুইকেই অতিক্রমকারী। যে ইচ্ছা প্রকাশের কারণ, তা অন্তর্নিহিত। (সেই ইচ্ছা কি তবে Hegel-এর thesis-এর অন্তর্নিহিত Anti-thesis? আর পরিণতি Synthesis-এ?)

নাসদীয় সূক্তের কবিহৃদয়ের সেই গূঢ় অন্বেষাকে যদি বর্তমান চিন্তাতে সৃষ্টির স্তর হিসাবে ভাগ করা যায়, তাহলে হয়তো তা এই ভাবে দাঁড়াবে—(১) এক, (২) আমিই আমি আত্মবোধ। কিংবা (৩) সীমিত

(১) এই দৃষ্ট জগৎ যে মূলত বস্তুসত্তা নয় তা আইনস্টাইনের EMC^2 প্রমাণ করে দিয়েছে। যার অর্থ বস্তুসত্তা হল শক্তি ও গতির স্কোয়ার। অবশ্য MC^2 যথার্থ হবে $+RC^2$

(২) হিন্দু মতে নারায়ণ অর্থ—নারা (জল) অয়ণ বীজ = নারায়ণ কারণ সলিলে সৃষ্টির বীজ। কারো মতে এই বীজকে নররূপে দেখা হয়েছে বলেই তিনি নারায়ণ। অর্থাৎ Primordial being.

চেতনাই অসীম চেতনা। নাসদীয় সূক্তের সৃষ্টিতত্ত্বে 'এক' কোন বিশেষ সময়ে স্পন্দিত হয়নি। ইচ্ছার অহং—জড়িয়ে আছে অনংহেরই সঙ্গে; কেউ কারো পূর্বগামী-নয়। ইচ্ছার যে তাপ তাও 'একে'র সহজাত। সেই এক চিরপ্রকাশমান এবং তার এই বিচিত্র প্রকাশ অধরাকে ধরার জন্য। তাই চিরকাল মহাশূন্যে বিশৃঙ্খলা। নাসদীয় সূক্তে আছে সৃষ্টি কেমন তার উত্তর, কিন্তু সৃষ্টি কখন, তার উত্তর নেই।

নাসদীয় সূক্তে যে মায়ার উল্লেখ আছে, সেই মায়া কিন্তু অলীক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি কখনও। এই পৃথিবী মিথ্যা নয়, স্বপ্নের মত। পৃথিবী ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি মাত্র। নাসদীয় সূক্তের মায়া হল 'একের' অন্তর্নিহিত শক্তি-ব্যঞ্জক। আর সৃষ্টি-উৎসের সেই 'এক' অনস্তিত্ব নয়, তা হল পরম বাস্তব সৎ, এক রুদ্ধশ্বাস শ্বাস-প্রশ্বাস (The one breathing breathless by itself)। অনস্তিত্ব থেকে যে অস্তিত্ব, তার অর্থ এই নয় যে, না থেকে হ্যাঁ-এর আবির্ভাব; এর অর্থ হল অপ্রকাশ থেকে প্রকাশ। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তেই আছে ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণার চূড়ান্ত অনুভূতি। কিন্তু তবু, তবু কি পেয়েছিলেন সেই ঋগ্বেদের ঋষি অনাদি এক আনন্দময়ের স্বরূপ উপলব্ধি করতে? অথর্ববেদের যুগে ঋগ্বেদ সংহিতায় যে দার্শনিকতার অবতারণা—যা উৎসের হৃদয়স্থিত কবি-কল্পনার আলোকে উজ্জ্বল, তা তার চূড়ান্ত সিদ্ধি লাভ করতে পারেনি, যতদিন না মানুষ যোগের মাধ্যমে স্থিতধি হয়ে নিজে হতে পেরেছে অনন্ত। আর এই যোগ হল তাদেরই অবদান যাঁরা অনার্য নামে পরিচিত—যে যোগভঙ্গী আর্য-সভ্যতার পূর্বেই আমরা দেখেছি হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োতে। কিন্তু তার আগে দার্শনিকতা—উপনিষদের, যে দার্শনিকতা অথর্ববেদ সংহিতার সময় থেকেই আর্য-মানসে নতুন ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সে কথা একটু পরে। তার আগে আর্যঋষিদের সেই সত্যানুভবের চেষ্টা সাধারণ মানুষ কিভাবে গ্রহণ করেছিল, সে সম্পর্কে একটু বিচার করে দেখা যাক। কারণ, যে-কোন প্রচেষ্টার চূড়ান্ত সিদ্ধি তখনই যখন সাধারণ মানুষ তাকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করতে পারে। লোকসাধনা কি সেই লোকোত্তরের সন্ধান পেয়েছিল? কিংবা লোকসাধনা ও লোকোত্তর সাধনা চিরকালই ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনাকে পৃথক করে রেখেছে অপরিসীম সমস্যা সৃষ্টি করে?

কবি সম্পর্কে এক বিশেষ ধারণা আছে আমাদের দেশে। তাঁকে বলা হয় ত্রিকালদর্শী।[১] সৎ কবির হৃদয়ে সত্যের অনুরণন এক রহস্য। বেদ সংহিতার যুগে কবি হৃদয়ে যখন সত্য ধরা দিতে চেয়েছে, তখনই তা হয়ে উঠেছে মহামহিম। সকল কুসংস্কারের উর্ধে সে এক আশ্চর্য প্রকাশ। কিন্তু ভাষা প্রতীক হয়ে যে অতীন্দ্রিয়ের দৌত্য করেছে সংহিতার যুগে সাধারণ মানুষ তা হয়তো বুঝতে পারেনি। তাই অধ্যাত্মতা যখন নেমে এসেছে অনুষ্ঠানে, প্রতীক সীমিত হয়ে বহু দেবতার আকারে দেখা দিয়েছে মানুষের কাছে। প্রকৃতির অন্তরালবর্তী সেই 'সৎ' দেখা দিয়েছে মনুষ্যাকৃতি ধরে।

(১) বর্তমানে ত্রিকালের ধারণা পাল্টে দিয়েছেন আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বে। অপরপক্ষে সময়ের অনন্ততা কেড়ে নিয়েছে কোয়াণ্টাম ফিজিক্স। ফলে ত্রিকালজ্ঞ অর্থ আর সর্বব্যাপ্ত কোন কিছু নয়।

মহান 'একের' যে স্পর্শ বিহ্বল করেছিল আর্য কবিদের ; সেই এক হয়েছে বহু। সুতরাং কবি হৃদয়-উৎসারিত ধর্ম তার মাহাত্ম্য হারিয়েছে বেদনায়ক ভাবে। কোথাও কোথাও ভয়াবহ প্রকৃতি তার বাহ্য চরিত্রেই পূজা লাভ করেছে, পরিপূর্ণভাবে মনুষ্যাকৃতিও ধারণ করতে পারেনি। যেমন সলিল ও মেঘজাত ইন্দ্র যখন বজ্রের আকারে নিপাতিত হয়েছেন ভূতলে, তখন সেই ভাবেই তিনি মানুষের ভীতি উৎপাদন করে পূজার বেদী অধিকার করে নিয়েছেন। যে সকল দেবদেবী মনুষ্যাকৃতি পেয়েছেন তাঁরাও মানসিক রিপুর তাড়নার ঊর্ধে উঠতে পারেন নি। মানুষের মতই দেখা দিয়েছে তাঁদের হস্তপদ, মানুষেরই মত প্রবৃত্তি। উচ্চকুলোদ্ভব মানুষের মত বর্ণনা। তাঁরা যুদ্ধে লিপ্ত, ভোজে আপ্যায়িত, পানোন্মত্ত ও নৃত্যচঞ্চল। মানুষেরই মত আহার এবং বিহার-প্রিয়। কেউ ভূমিকা নিয়েছেন মানুষের ঘরে তাদের পুরোহিতের, যেমন, অগ্নি এবং বৃহস্পতি। আবাব কেউবা হয়েছেন যোদ্ধা, যেমন, ইন্দ্র ও মরুৎ। মানুষের যা প্রিয় খাদ্য তাই হয়েছে তাঁদের প্রিয়। ঘি, মাখন, শস্য। মানুষেরই মত সোমরস হয়েছে প্রিয় পাণীয়। মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে তাঁদের তাঁদের মধ্যে, যেমন, মানুষেরই মত তাঁরা হয়েছেন চাটুবাক্যে তুষ্ট। কখনও কখনও এত আত্মকেন্দ্রিক যে, হাস্যকর ভাবে নিজেদের মধ্যেই-কথোপকথনে লিপ্ত এইভাবে ঃ আমি এই কর্ম করব কিংবা করব না। আমি (একটি বিশেষ লোককে) একটা গো দান করব, কিংবা অশ্ব ? আচ্ছা, ঐ ব্যক্তিটি কি আমাকে কখনও সোমরস পান করতে দিয়েছেন ? ইত্যাদি।

সাধারণ মানুষ যখন বিশাল হৃদয়েব ব্যাপ্তিতে কবি হৃদয়ের অনুরণনকে ধবতে না পারেন, কবি হৃদয়ের অনুভূত সহৃদয় দেবতা নিজেই হয়ে দাঁড়ান তখন হৃদয়হীন। হৃদয়ের আবেগে তুষ্ট নন তখন তিনি। কোন্ মানুষের দান কত বিপুল, তারই উপব তখন তাঁর দাক্ষিণ্য। অনুভবের দেবতা তখন হয়ে দাঁড়ান দেওয়া-নেওয়াব সম্পর্কের বস্তু, যদিও পরবর্তী ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই সম্পর্ক যতটা স্বার্থক্লিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর্যদের কাছে, সংহিতার যুগে ততটা হয়নি।

কবি হৃদয়ের মহান প্রকৃতি, অসীমের যা ছিল তোরণ, তা যখন মনুষ্য প্রকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে নেমে আসে হীনমন্যতা। যে শক্তি ভালমন্দ বিচার না করে সকলকেই আঘাত করে তাকেও পূজা করতে দ্বিধা হয় না মানুষের। প্রকৃতিকে মনুষ্যাকৃতি দিয়ে দেবতা করা হলে তাঁর পূজার জন্য একটা কল্পিত কারণ বের করতেই হয়। বজ্রাঘাতে মৃত্যুর কারণ হিসাবে দেখাতে হয় মানুষের অপরাধে দেবতার ক্রোধ। অতীন্দ্রিয় কোন পরম চেতনাকে যদি মনুষ্যাকৃতি দিয়ে ব্যক্তিগত ঈশ্বরে পরিণত করা হয় তিনি তখন খেয়ালী এবং নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন স্বাভাবিক ভাবেই। সুতরাং যে দেবতা ছিলেন বেদের কবি-ঋষিদের কাছে অসীমেরই গুণের প্রকাশমাত্র—মানুষের কাছে তিনিই হয়ে দাঁড়ান ভীতির কারণ, এবং প্রকৃতি-দেবতার পূজা হয়ে দাঁড়ায় স্বার্থদুষ্ট। যে প্রকৃতি ভয়াবহ, তাঁর দেবতা পূজা পান ভীতি থেকে, আর ভালবাসা পান তিনিই দৈনন্দিন জীবনে যিনি মানুষের কাছে কল্যাণকর। বজ্র ভয়ঙ্কর, অথচ বৃষ্টি অত্যন্ত

প্রয়োজনীয়। সুতরাং ইন্দ্রের কাছে মানুষের প্রার্থনা হয়ে দাঁড়ায় এইভাবে—'হে ইন্দ্র, আমাদের বৃষ্টি দান কর, কিন্তু কখনও বজ্র ও ঝঞ্ঝাকে প্রেরণ করো না।' সূর্যের নিকট প্রার্থনা জানানো হয় এইভাবে—'আমাদের মৃদু উত্তাপ দান কর, কিন্তু ধরিত্রীকে নির্মম তাপ বিকিরণ করে খরা ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি কোর না।'

প্রকৃতির যে অংশের উপযোগিতা ও অপযোগিতা যতখানি, সেই প্রকৃতি-দেবতার পূজাও হয়ে দাঁড়ায় ততখানি মুখ্য কিংবা গৌণ। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে না পেরে যখন তাকে স্থাপন করা হয় ভাগ্যনিয়ন্তা হিসেবে, দেবতা তখন হয়ে দাঁড়ান মহাশক্তিধর, কিন্তু মহাকল্যাণকর নন। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আর্য-ঋষিদের মহান কল্পনা আর্য-মানুষের কাছে সীমিত হয়ে দেখা দিলেও চূড়ান্ত অসভ্য বর্বরদের দেবতাদের মত, আর্য-প্রকৃতিদেবতারা মানুষের কাছে কখনও শুধুমাত্র মহাশক্তিধর, প্রতিহিংসাপরায়ণই হয়ে দাঁড়াননি। দেবতার মধ্যে তাঁরা আরোপ করেছেন এক উন্নতমানের নৈতিকতা, যেখানে দেবতা শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন করেন। শুধুমাত্র তাই নয়, কোন কোন দেবতা মানুষকে পর্যন্ত সাহায্য করেন অনন্তস্বরূপবোধে, মুক্তিতে।

প্রকৃতি-দেবতা যখন তাঁর অতীন্দ্রিয় বৈশিষ্ট্যচ্যুত হয়ে মনুষ্যাকৃতি লাভ করেন, তখন তাঁকে পূজার জন্য শুধুমাত্র হৃদয় উন্মুক্ত করে দিলেই চলে না। তাঁর পূজার জন্য করতে হয় অনুষ্ঠান। সম্পর্ক যখন হয়ে দাঁড়ায় দেয়া-নেওয়ার, তখন শুধুমাত্র প্রার্থনা করলেই তো হয় না, দিতেও হয় কিছু। সেই দেবার জন্য গড়ে উঠে যজ্ঞ-পদ্ধতি। অবশ্য যজ্ঞ-পদ্ধতি উদ্ভবের প্রথম পর্যায়ে ততটা বস্তু-ভিত্তিক দেয়ানেওয়ার সম্পর্ক গড়ে উঠেনি দেবতাদের সঙ্গে, যতটা হয়েছে আরও পরবর্তীকালে। প্রারম্ভিক পর্যায়ের যজ্ঞে দানের চাইতে হৃদয়ের মূল্যই ছিল বেশী। তাইতো বৈদিক ঋষি বলেছিলেন—'ইন্দ্রের নিকট উচ্ছ্বসিত প্রার্থনাবাক্য, মাখন এবং মধু অপেক্ষাও প্রিয়।' এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, অনুষ্ঠানকে শুধুমাত্র বাহ্যিক হলেই চলবে না, তার অন্তরালে থাকা চাই অন্তরের শ্রদ্ধা, কারণ দেবতারা হৃদয়ের গভীর গহনে পর্যন্ত প্রবেশ করে সব জানতে পারেন। মানুষের হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে যে বরুণের অবাধ প্রবেশ, সে কথা তো ঋগ্বেদের বরুণ স্তোত্রেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু যজ্ঞের এই আন্তরিক শ্রদ্ধার পর্ব ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে তখনই যখন মানুষ হৃদয়ের অকৃত্রিমতা হারিয়ে দেবতাকে দেখতে আরম্ভ করে ক্রমশঃ আরো বেশী মানবিক করে। তখনই মনে হতে থাকে যে, শ্রদ্ধার চাইতে যজ্ঞ বড়।

যজ্ঞের রুচি বিকৃত হতে হতে যেমন পরবর্তীকালে মনুষ্য-বলিতে এসে ঠেকেছিল,[১] ঋগ্বেদের যুগে সে-সম্পর্কে ক্ষীণ একটা উল্লেখ থাকলেও একথা

(১) মনুষ বলি হয়তো ঋগ্বেদের ঋষিদের কাছে ছিল পাপবদ্ধ মানুষের পাপবলি পরে যা ভুল বশত মনুষ্য বলিতে পরিণত হয়েছে। যজ্ঞের উৎসও হয়তো ছিল এই বিশ্বাস যে, 'Out of the sacrifice of God's quality the universe and the lifeform in man came and out of the sacrifice of mans ego he can go back to his source.'

প্রায় নিশ্চিতরূপেই বলা যেতে পারে যে, মনুষ্য-বলিদান প্রথা ছিল না তখনও। অবশ্য পশুবলির উল্লেখ আছে। আছে অশ্বমেধের কথা। কিন্তু বলি-প্রথা থাকলেও আর্য-হৃদয়কে তেমনভাবে তা আকর্ষণ করতে পারেনি। তাই সামবেদেই দেখতে পাই এই ধরনের উক্তি -'হে দেবগণ, আমাদের কোন যূপকাষ্ঠ নেই। আমরা হনন করি না। আমরা তোমাদের পূজা করি বার বার আমাদের পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করে।'[১]

যজ্ঞে জীব হত্যার প্রাক্ আর্য-মানসে প্রারম্ভকাল থেকে যে প্রবল অনীহা ছিল, উপনিষদপর্বে সেই অনীহা বলি প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহেব আকার ধারণ করে এবং তা চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ কবে বৌদ্ধ ও জৈনদের কাছে।

ঈশ্বর-সাধনায় অনুষ্ঠানপর্বের বহ্বাড়ম্বর বৈদিক ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাপাব। অনুষ্ঠান অপেক্ষা প্রথম পর্যায়ে হৃদয়ের শ্রদ্ধাই ছিল বড়। পরাশর স্মৃতিতে আছে—'কৃতযুগে ঈশ্বর সাধনার অঙ্গ হল ধ্যান, ত্রেতা যুগে বলি, দ্বাপরে পূজা এবং কলিতে প্রার্থনা ও স্তুতি।'[২] পরাশরের সমর্থনে বিষ্ণু পুরাণেরও ঐ একই অভিমত, অর্থাৎ বলিপ্রথা এসেছে দ্বাপরে। অর্থাৎ চতুর্বৈদিক যুগে আনুষ্ঠানিক পূজার সূত্রপাত হলেও তা নির্মম আনুষ্ঠানিকতার আকার গ্রহণ করেনি কখনও।

মনুষ্যরূপে প্রকৃতি-দেবতাকে কল্পনা করা হলেও, দেবতা তুষ্টিব জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হলেও, এ কথা মনে করবার কোন হেতু নেই যে, আর্যরা মূর্তি পূজা করতেন। মন্দিরের কোন উল্লেখ নেই কোন দেবতার জন্য। সাধারণ মানুষের কাছে ঋগ্বৈদিক ঋষিদের অত্যুচ্চ কবি কল্পনা হৃদয়-গম্য না হলেও সচল প্রকৃতির দেবতাকে অচল মূর্তিব রূপ দেননি তারা। দেবতাব সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্ক স্থাপিত হলেও সাধারণ মানুষ পর্যন্ত শুধুমাত্র আচারনিষ্ঠ হয়ে থাকেননি। দেবতা তখনও আত্মীয়স্বরূপ। স্বর্গ পিতা, ধরিত্রী জননী, অগ্নি ভ্রাতা, এই ধরনের ছিল সম্পর্ক। আর দেবতার উপর নির্ভরশীলতা ছিল আত্মীয়েব উপর নির্ভরশীলতারই মত। কোন দ্বিধা ছিল না তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় জিনিস প্রার্থনা করতে। কতকটা সেই খ্রীষ্টানদের 'Give us this day our daily bread'-এর মত। ঋগ্বৈদিক যুগে আর্য-ধর্ম বিশ্বাসের চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটেছে বোধহয় বরুণের নিকট প্রার্থনা করার মধ্যে। ভক্তির অর্থ যদি কোন দেবতার উপর একান্ত বিশ্বাস, তাঁর প্রতি ভালবাসা, সর্বস্ব অর্পণ করে মোক্ষের পথ প্রশস্ত করা—তাহলে আর্য-মানুষের বরুণ-স্তোত্র থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত যে. ভক্তির পরিপূর্ণ বিকাশও ঘটেছিল তাদের মধ্যে। হ্যাঁ, অত্যুচ্চ পরমার্থিক চিন্তা যদি সাধারণ মানুষের ধারণাগোচর না হয় তাহলে এইভাবে চিরকাল. সর্বদেশে ভক্তির মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে সমর্পণ করে আরাধ্য দেবতার পায়ে। কিন্তু ভক্তি কি ঈশ্বর সন্ধান দিতে পারে? নিঃশর্ত

(১) শব্দই যে সব সম্ভবত এই বিশ্বাসের সঙ্গে ঋগ্বেদীয় ঋষিরা নিবিড় ভাবে পরিচিত ছিলেন। এইজন্য 'শব্দ ব্রহ্মণ' ভারতীয় দর্শনের একটি দৃঢ় ভিত্তিভূমি। পাশ্চাত্যেও এই ধরনের বিশ্বাস ছিল—' In the beginning there was logos. logos was with God, and the Logo was God.

(২) কৃত (সত্য) যুগ-এ, সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, ত্রেতাতে তিনগুণের সাম্য। দ্বাপরে দুইগুণের প্রাধান্য-এবং কলিতে তমগুণের প্রাধান্য। অন্যগুণগুলি ফুলের কলির মত মুদ্রিত থাকে।

সত্যের বোধ জাগ্রত করতে পারে মানুষের মধ্যে? না, প্রকৃত ধর্মের পথ একমাত্র জ্ঞানেরই পথ, যা নাকি অস্তিত্বের যাথাথ তাব স্বরূপেই প্রকাশ করে দেয় মানুষের কাছে? এ তর্কের মীমাংসা দুষ্কর। ভক্তিসূত্র আলোচনাতেই তা কেবল জানতে পারা যাবে। আপাতত এ তর্ক থাক। শুধু এইটুকুতেই যথেষ্ট যে, মানুষ যখন তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সেই অচিন্তনীয় সত্যকে জানতে পারে না, তখন অবধারিত রূপেই কোন একটা কিছু কল্পনা করে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে রহস্যের সমাধান হিসেবে। এবং আর্য জনগণও তাই করেছিলেন।

সৎ কবি হৃদয়ের অনুরণন যাদের নেই, কিংবা নেই উচ্চকোটির দার্শনিকতা, তারা, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ চিরকালই জাতীয় প্রতিনিধিদের মহৎ কল্পনাকে নিজেদের মত করেই রূপ দিয়ে নেয়। আর্যচিন্তাতে অথর্ববেদের আগে নরক কল্পনা ছিল না আমরা জেনেছি। সুতরাং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ তবে কোথায় যায়? তারা কি হারিয়ে যায়? কিন্তু হারানোর কল্পনা যে বস্তুবাদীদের কল্পনা, অর্থাৎ দেহের পর আর কিছু নেই! অতীন্দ্রিয়ে আস্থা স্থাপনকারী আর্যদের পক্ষে কখনই তা সম্ভব হয়নি। তাই 'তারা অবধারিত রূপেই কল্পনা করে নিয়েছিলেন যে, মৃত্যুর পরে বিগত পুরুষেরা বাস করেন স্বর্গলোকে। এবং এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রাক্তন পুরুষেরা হয়ে ওঠেন দেবতা। সুতরাং দেবতাদের সঙ্গে তাঁরাও পূজা লাভ করেন মানুষের কাছ থেকে। এক এবং অদ্বিতীয় সৎ হিসেবে ঈশ্বরের চিন্তা সাধারণ মানুষের কাছে বড় কল্পনাতীত ব্যাপার। তাই তারা ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া হিসেবে দেখেন অসংখ্য দেবতাকে। যে সৎ কবি-কল্পনা বহুর মধ্যে একের সন্ধান পান, তাঁরা তা পান না বলেই বহুর পূজা বন্ধ হয় না। এবং সেই বহুর মধ্যেই দেবতারূপে কল্পিত হবামাত্র পিতৃপুরুষেরাও এসে পূজা লাভ করতে থাকেন। এমনি ভাবেই প্রাক্তন পুরুষদেরও পূজা দেখতে পাই আর্যদের মধ্যে। বিগত পুরুষেরা বাস্তব দেহে থাকেন না বটে, কিন্তু তাঁরা থাকেন এবং উত্তর পুরুষদের শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করতে নেমে আসেন আত্মারূপে। বেদের কিছু কিছু স্তোত্রে সেই জন্য দেখি মন্ত্র রয়েছে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে। দেবতাদের সঙ্গে সেই পিতৃপুরুষেরা আমন্ত্রিত হচ্ছেন পূজার বেদীতে। অবশ্য বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের অনেকেরই ধারণা এমন ধরনের কোন মন্ত্রের অস্তিত্ব ঋগ্বেদে নেই।

খ্রীষ্টানদের মত পাপবোধ ঋগ্বেদের মধ্যে নেই বটে, সম্পূর্ণভাবে পাপবোধের অভাব যে আছে, তাও নয়। জ্ঞানী-ব্যক্তির কাছে যেমন পাপের অর্থ সত্যকে না জানা, ঋগ্বৈদিক সাধারণ মানুষের কাছে পাপের অর্থ ছিল ঈশ্বর থেকে দূরে থাকা। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে একটা অতীন্দ্রিয় ইচ্ছার দ্বরা পরিচালিত সেটা সর্বজন স্বীকৃত। সেই অতীন্দ্রিয় ইচ্ছার স্বরূপ ঋষি-কবির কাছে যে ধরনের, সাধারণ মানুষের কাছে তা নাও হতে পারে। তথাপি মোটামুটি একটা ধারণা ছিল সবারই। একটা বিশ্ব-বিধানে সমগ্র জগৎ পরিচালিত—যাকে বলে ঋত।[১] সেই ঋতের পরিচালক হলেন দেবতারা। সেই ঋতের বিরুদ্ধাচারীর শাস্তি অনিবার্য। পাপ মানে দেবতার প্রতি

(১) ঋ = গতি, ঋত হল ছন্দময় গতি।

বাহ্যক্রিয়ার অভাবই শুধু নয়, নৈতিক অপরাধও পাপ। নৈতিক অপরাধের ধারণা অনেক সময়ই স্পষ্ট নয় বলে পাপস্খালনের জন্য হয়েছে আনুষ্ঠানিক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা।

সাধারণ মানুষের সীমিত কল্পনার জন্য অবস্থা যে রকমেরই দাঁড়াক না কেন, তখনও সৎ কবির অভাব ছিল না—যাঁরা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এ-সব কিছুর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন প্রচণ্ড রকমের একটা শূন্যতা। একটা স্তোত্রে তো স্পষ্টই মানুষ এবং দেবতা উভয়েরই আত্মস্বার্থপরতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বৈদিক ঋষিদের সুস্থ কবি-কল্পনার এই নিদারুণ বিকৃতি সত্যই বেদনাদায়ক। তবুও বোধহয় আনন্দ এইখানে যে, অসুন্দর সুন্দরকে গ্রাস করতে পারেনি সর্বোতভাবে। এবং সুন্দরের সৌন্দর্য বুঝি আরও বেশী খোলে তখনই যখন তা অসুন্দরের মধ্যে নিজের প্রতিভায় প্রজ্বলিত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। সীমিত লোকাচারের এই অজ্ঞানতার মধ্যেও, তাই বৈদিক কোন নির্ভীক কবিকণ্ঠ যখন শুধু মাত্র উপচিকীর্ষাকেই পরমার্থের শ্রেষ্ঠ পথ বলে বর্ণনা করেন, তখনই তা স্ব-মহিমায় ভাস্বর করে তোলে আর্য ধর্ম-সাধনাকে। অপরের কল্যাণ চিন্তাই পরমার্থের শ্রেষ্ঠ পথ, সে জন্য ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নেই। নির্মল শুদ্ধ-চিত্তের এই উপচিকীর্ষার কাছে ঈশ্বরও ম্লান। আনুষ্ঠানিক ধর্মের ঊর্ধ্বে স্বাধীন এক নৈতিকতাই সেখানে সর্বাপেক্ষা প্রবল।

অতীন্দ্রিয় সাধনায়, ঈশ্বর সাধনায়, কবি-হৃদয়ের সৎ অনুভূতিতে ধৃত সত্যের স্বরূপই হল অতীন্দ্রিয়ের যথার্থ বর্ণনা। জ্ঞান সৎ কবি-হৃদয়ের এই অনুরণনেরই ব্যাখ্যা করতে পারে মাত্র। ব্যাখ্যার জন্য তর্কের অবতারণা একটা সিঁড়ির ধাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই ধাপ অতিক্রম করে ছাদে উঠলে অসীম নীল আকাশ জ্ঞানীকেও বিমুগ্ধ চিত্ত কবি করে তোলে। আসল কথা একটা নির্মলচিত্ত কবি-মানসের অধিকারী হতে না পারলে ঈশ্বর বা সত্যকে জানা যায় না। কিন্তু সেই কবি-হৃদয় সবার হয় না। তাই জ্ঞানী যেমন তর্কের জাল বিস্তার করে সেই কাব্যের অঙ্গনে যেতে চান তেমনই সাধারণ মানুষও সেখানে যেতে চায়—অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, ভক্তির মাধ্যমে, কতকগুলো নৈতিকতার মাধ্যমে। অনুষ্ঠান যদি স্বার্থসম্পর্কশূন্য হয়, নির্ভেজাল আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়, তাহলে সত্য যে প্রতিভাত না হয়, তা নয়। কিন্তু, যেহেতু অনুষ্ঠানের জন্মই কৃত্রিমতা থেকে, সেখানে হৃদয়ের নির্ভেজাল সততার প্রকাশ সম্ভব নয়। বরং কবি-হৃদয়ের সান্নিধ্যে সাধারণ মানুষও সহজে যেতে পারে ভক্তির মাধ্যমে। ভক্তির পরেই নৈতিকতা। নৈতিকতার আছে দুটো চরিত্র—একটি নিস্কাম কর্তব্য, যেমন উপচিকীর্ষা, যেখানে কবি-হৃদয়ের এক সহমর্মীতাবোধ থেকে পরার্থকল্যাণব্রত, সেখানে তা ঈশ্বর ব্যাতিরেকেই সত্যার্থী। কিন্তু যেখানে শুধুমাত্র করণীয় কার্য হিসাবে প্রতিপাল্য, সেখানে তা অনুষ্ঠানের মতই কৃত্রিম। কিন্তু ত্রুটি বা গুণ যাই থাক না কেন, ঈশ্বর সাধনার জন্য সর্বকালে সর্বদেশে যেমন আছে দার্শনিকতা, ভক্তি ও আনুষ্ঠানিকতা, তেমনই আছে নৈতিকতা। দার্শনিকতা, ভক্তি, আনুষ্ঠানিকতা ও নৈতিকতা বাদ দিয়ে বোধহয় কোন জাতির ঈশ্বর সাধনার চরিত্র সম্যক পরিস্ফুট নয়। ছাদে ওঠার সিঁড়ির মত কবি-হৃদয়ধৃত সত্যের সন্ধানে এ সবকিছুরই প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর সন্ধানের অনুসঙ্গ হিসাবে ঋগ্বৈদিক

সত্য-সাধনার কালেও এই নৈতিকতার অভাব ছিল না।

ঋগ্বেদের নৈতিকতার কথা চিন্তা করতে গেলে প্রথমেই যে শব্দটি মনে আসে, তা হল ঋত। মহাবিশ্বজগৎ একটা নিয়মের অধীন। সেই নিয়মই হল ঋত। এই নিয়মের অধীন—কি মানুষ, কি দেবতা, সকলেই। সবাইকে মানতে হবে এ নিয়ম। উর্ধ থেকে কোন ভারি জিনিসকে ছেড়ে দেওয়া হলে জাগতিক নিয়মের বলেই তা নিচে পড়বে। এই নিয়মের হাত থেকে অব্যাহতি নেই। সুতরাং সমগ্র বিশ্বজগতে যে আছে একটা বিধান, সেই বিধান কেউ চাক, বা না চাক, তার নিয়ম অনুযায়ী কাজ হবেই। উপর থেকে ভাবি জিনিস নিচে পড়ার মতই প্রত্যেকটা কাজই সেই নিয়মের অধীনস্থ হয়ে অনিবার্যভাবে এগিয়ে যাবে। সুতবাং মানুষ যেভাবে যে কাজই করুক না কেন, ফল হবে তার নিয়ম অনুসারে। নিয়মের ব্যতিক্রমের জন্যও নিয়মই কাজ করে। কোন রকমেই বিশ্ব-বিধানের হাত থেকে রক্ষা নেই কারোই। সুতরাং জাগতিক নিয়ম যখন ক্রিয়াশীল তখন সেই নিয়মেব পরিপন্থী কোন কাজ কখনই শাশ্বত ব্যাপার হতে পারে না। নিয়মের কাছে তাকে নতি স্বীকার করতেই হবে।

শিলা যেমন জলে ভাসে না, ডোবে, তেমনই বিশ্বজগতেব বিধান অনুযায়ীই অকল্যাণেব কখনই জয় হয় না, জয় হয় কল্যাণের।[১] শিলা যদি জলে ভাসে তবে বুঝতে হবে তা খাঁটি শিলা নয়। অন্য কোন কারণ জড়িত আছে তার মধ্যে, যা তাকে ভাসিয়ে রেখেছে। শিলার শিলাত্ব প্রকাশ পেলেই তা ডুববে। তার ভাসমান অবস্থাটা একটা সাময়িক ব্যাপার। তেমনি পাপ ও অন্যায় অর্থাৎ অকল্যাণ যদি জয়ী হয় সেটাও একটা সাময়িক ব্যাপার। বিশ্বজাগতিক নিয়মে তার ব্যর্থতা অনিবার্য। শুভ—সূর্যেরই মত ভাস্বর, তা যদি কখনও আচ্ছন্ন থাকে, তবে সে জন্য ভয়ের কিছু নেই। বিশ্বজাগতিক নিয়মে একদিন সে নিজের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠবেই।

এই যে বিশ্বজাগতিক নিয়ম, এই নিয়মের উপর প্রগাঢ় আস্থা ছিল আর্যদের। আর এই নিয়ম বা ঋতই ভিত্তি রচনা করেছিল আর্য নীতি-বোধের। এই বিশ্বজাগতিক নিয়মের একমাত্র উপাদান হল সত্য। সত্যকেই সে ধারণ করে রাখে। সত্যই ঋত। সুতরাং যা বিশৃঙ্খল, যা অসত্য, তাই অনৃত। তার কোন চিরন্তনী প্রকাশ নেই। কল্যাণ-ধর্মী মানুষ হলেন তারাই যাঁরা এই ঋত-এর পথ অনুসরণ করে সত্যের পথে, শৃঙ্খলার পথে চলেন। সুশৃঙ্খল ব্যবহারকেই বলা হয় সত্যব্রত। সুসামঞ্জস্যই, হল শুভ জীবনের মূল চরিত্র। বৈদিক আর্য—যারা শুভ পথেরই পথিক, সেই কারণেই অনৃত পথের তাঁরা কখনও পথিক নন। এই বিশ্ব জাগতিক নিয়ম বা ঋৎ-এর নির্ভুল অনুসরণকারী হলেন পথিক। কবির সত্যানুভবকে যখন সাধারণ মানুষ ধরবার চেষ্টা করলেন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তখন এই ঋত-ই হল তাঁদের আদর্শ। যজ্ঞ হল প্রকৃতপক্ষে এই ঋতেরই প্রতিশব্দ।

এই নৈতিক জীবন, আদর্শ জীবন, ঋগ্বৈদিক স্তোত্র যে ভাবে প্রতিফলিত, তা হল এই : *দেবতার নিকট জানাতে হবে প্রার্থনা।* করতে হবে আনুষ্ঠানিক কার্যকলাপ।

(১) ইরানীয় অবেস্তর অহুর মজদ ও আহ্বাণের চিন্তার এখানে প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

মানুষ আর দেবতার মধ্যে আজকের মত দুস্তর ব্যবধান ছিল না সেদিন। সুতরাং দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আত্মীয়তার। দেবতার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। তাঁর সদা জাগ্রত দৃষ্টির নিচেই মানুষের জীবন। সুতরাং ঋতের পথে তাঁদেরই মত চলতে হবে মানুষকেও।

শুধুমাত্র দেবতার প্রতি দায়িত্ব পালন করলেই চলবে না। ঋগ্বেদেরই নির্দেশ মত, কর্তব্য আছে মানুষের প্রতিও। সেই কর্তব্য হল দয়া, আতিথেয়তা ইত্যাদি। বৈদিক স্তোত্রেই আছে—'দাতার ঐশ্বর্যের কখনও ক্ষয় নেই। যার খাদ্য আছে, সে যদি ক্ষুধার্তের প্রতি নির্মম হয়ে থাকে, সাহায্য প্রার্থীর প্রতি বিরূপ হয় এবং সেই সব ক্ষুধার্ত ও প্রার্থী মানুষের চোখের উপরই নিজে উপভোগ করে, প্রকৃতপক্ষে সান্ত্বনার তার কোন স্থান নেই। জাদু, তুকতাক, প্রলোভন, ব্যাভিচার বিষেরই মত পরিত্যাজ্য। পরিত্যাজ্য জুয়া। তাকেই বলে ধর্ম, যা কল্যাণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে, যার মধ্যে আছে মানুষের প্রতি ভালবাসা। যে কর্ম কল্যাণের পথে পরিচালিত করে না তাই অধর্ম। ঋগ্বেদেই আছে—'যে মানুষ আমাদের প্রতি সপ্রেম, তার প্রতি আমরা যদি অন্যায় করি যদি ক্ষতি করি বন্ধু বা সহকর্মীর, যদি আঘাত করি কোন প্রতিবেশীকে, এমনকি অপরিচিত আগন্তুককেও, হে ঈশ্বর আমাদের সেই ঋতভঙ্গের অপরাধ থেকে মুক্ত কর।' কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রার্থনা করলেই সব সময় তা পাওয়া যায় না। কোন কোন দেবতা আছেন যে ভাবেই তাঁদের পূজা করা হোক না কেন তাঁরা ঋতের পথ থেকে বিচ্যুত হন না। সেজন্য ঋতভঙ্গকারীদের তার ফলভোগের হাত থেকে অব্যাহতি নেই। ঠিক কর্মফলের মত। পরবর্তীকালে যেমন দেখানো হয়েছে মানুষ তার নিজের কর্মফল ভোগ করে। এই কর্মফলের হাত থেকে অব্যাহতি দেবার ক্ষমতা স্বয়ং ঈশ্বরেরও নেই।

বৈদিক সাহিত্যে উদ্দেশ্য-লাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনের কথাও উল্লেখ আছে। ইন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি নাকি কঠোর তপস্যাদ্বারা স্বর্গ জয় করেছিলেন। কিন্তু এ-সত্ত্বেও অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে এই সময় কৃচ্ছ্র সাধন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল এ-কথা বলা যায় না। বৈদিক স্তোত্রে সাধারণত আমাদের যা নজরে পড়ে, তা হল—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আনন্দ বোধ, প্রকৃতির গম্ভীর বিশালতায় বিস্ময় বোধ, আবার প্রকৃতিরই মধ্যে করুণ চিত্র দর্শনে বেদনার অনুরণন। বৈদিক যে যজ্ঞের আয়োজন, তার অন্তরালের মূল প্রেরণা হল পৃথিবীর শুভ জিনিসের প্রতি ভালবাসা। তবে গভীরতর আনন্দের মধ্যে অধ্যায়-সাধনা যতটা সাফল্যমণ্ডিত, বিষাদের মধ্যে ততটা নয়। আনন্দবোধের মধ্যে ধর্মসাধনার তাৎপর্য যতটুকু সফল — কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে তা নেই'। আনন্দে আছে ঈশ্বরের অনুভব, কৃচ্ছ্র সাধনে আছে তাকে আয়ত্ত করার প্রয়াস। উপবাস, সংযম প্রভৃতির মধ্যে অতিপ্রাকৃত শক্তি অর্জন করা যায় কিন্তু আনন্দের মধ্যে যায় নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে অবতরণ করানো। অবশ্য ঋগ্বেদে একধারে কঠোর তপস্বী ও পরামানন্দ-বিহ্বল ঋষির উল্লেখও আছে।

আর্য-মানসের মূল সূত্র যাই হোকনা কেন তার নৈতিকতার মধ্যে সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধনা যে একটা স্থান করে নিয়েছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে

এই কৃচ্ছ্রসাধনা আর্য-চরিত্রেরই একটি অংশ কিংবা অনার্য-ভাবধারায় প্রভাবিত ত চিন্তা করবার মত। যে অথর্ববেদের সময় অনার্য ভাবধারা স্থান পেয়েছে বেদে, তখনই কৃচ্ছ্র সাধনার নানা দৈহিক পদ্ধতির আবির্ভাব দেখি শাস্ত্রগ্রন্থে। এবং পূর্বেই বলেছি যে ঈশ্বর সন্ধানে যোগজাতীয় দৈহিক প্রক্রিয়ার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। ঈশ্বরসাধনার জন্য কতকগুলো দৈহিক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা কেন? এর সহজলভ্য জবাব আমাদের কাছে এই যে, মনঃসংযোগের জন্য।[১] মনঃসংযোগের প্রয়োজনীয়তা আসে কখন? যখন মন বিভ্রান্ত হয় তখন। মানুষের মন প্রকৃতিতে যতটা বিক্ষিপ্ত নয় সহর-জীবনে ততটাই বেশী। আর্য-ঈশ্বর সাধনার প্রথম স্তরে বিশাল হৃদয়ের স্পর্শে সত্যানুভূতির যে চিত্র আমরা দেখি তা কি সম্ভব হয়েছিল এই জন্য যে, বিশাল প্রকৃতির ছায়াতেই গড়ে উঠেছিল আর্য মানসিকতা? হরপ্পা-মহেন-জো-দড়োর মত মানুষের সৃষ্টি নগরের মধ্যে নয়? এবং নগর জীবনে সাধারণতই যে পরিবেশ তাতে মনকে সহজে আত্মস্থ করা যায় না। সে বিশাল প্রকৃতি তার গম্ভীর ব্যাপ্তিতে মনকে এক অতীন্দ্রিয় লোকে নিয়ে যায়, সেখানে বিরাটের স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্য কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন হয় না। হৃদয় পাতলেই হৃদয়ের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে সত্যের ঝঙ্কার। সেই ধ্বনি হৃদয়ে অনুভব করতে হলে নগরজীবনে নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় বহির্দ্বার রুদ্ধ করে।[২] নয়তো অন্তরের মধ্যে অন্তরতমের ধ্বনি ধ্বনিত হতে থাকলেও তার সাড়া পাওয়া যায় না। তাই আর্যসাধনায় কবি-হৃদয়ের মূল্যও যত, অনার্য হরপ্পা মহেন-জো-দড়ীয় সাধনায় ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের মূল্যও তত। একটা বাইরের বিপুল হৃদয়ের অনন্তকে জাগ্রত করে—আর একটাতে অন্তরতমকে জাগরিত করে বাইরের অসীমের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়।[৩] একটাতে ঔদার্য আর একটাতে স্বার্থপরতার যত চিহ্নই আমরা দেখি না কেন, কার্যত হয়তো দুইয়েই তার তুল্য মূল্যের। সেই জন্য ভারতের প্রাক-আর্যরা এসে আর্য ধারার সঙ্গে মিশে যেতে বাধ্য হয়েছে। সমুদ্রযাত্রী দুইনদী মহ'সঙ্গম সৃষ্টি করেছে মোহনাতে।

কৃচ্ছ্র-সাধনাটা নৈতিকতার মধ্যে পড়লেও বর্ণ ও আশ্রমও কি নৈতিকতার মধ্যে পড়ে? পূর্বেই এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা আছে সাধারণ মানুষের জন্য, বিশেষ করে সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধি পেতে পেতে ঐহিকতা যখন বেশী দেখা দেয় তখনই আশ্রমের

(১) কলিযুগে কিন্তু অধ্যাত্ম সাধনায় জন্য এই মনঃসংযোগের জন্য বহির্বিশ্বের কোন লক্ষ্য বস্তুর প্রয়োজন নেই। অধিমনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ অনুযায়ী বৃত্তিকে স্বাধীনভাবে চুপ করে বসে থেকে খেলতে দেওয়াই প্রকৃষ্ট উপায়। এ সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে জানতে গেলে লেখকের দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা গ্রন্থদ্বয় পড়ুন।

(২) ইন্দ্রিয়ের বহির্দ্বার রুদ্ধ করার জন্য সহজ যোগের পথই শ্রেষ্ঠ পথ। ঐতিহ্যবাহী যোগের পথ যথার্থ পথ নয়। রবীন্দ্রনাথের কথাই সত্য-'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।' লেখকের দিব্যজগত ও দৈবী ভাষা গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য।

(৩) এখানে কোয়াণ্টাম ফিজিক্সের মাত্রা সম্পর্কিত বিজ্ঞান ক্রিয়াশীল। দেহের শক্তি (কুল) মাত্রা উত্তোলিত হলে অর্থাৎ চতুর্মাত্রিক অবস্থা থেকে পঞ্চম মাত্রায় পৌঁছুলেই মানুষের অন্তর বাইরে চলে আসে। Carl Sagan-এর ভাষাতে inside turn out. এমন কি সময়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেলেও তা এমন ভাবে ভেঙেচুড়ে যায় যে সময়ের অন্তর্গত সব কিছু বাইরে চলে আসে।

প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তীব্রভাবে। অপরপক্ষে বর্ণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় সামাজিক সংঘাত এড়াবার জন্যই। ঋগ্বৈদিক যুগে এই আশ্রম ও বর্ণের কড়াকড়ি তেমন না থাকলেও পরবর্তীকালে অপরিহার্য রূপেই এ-সব এসে পড়েছিল অধ্যাত্ম সাধনার অঙ্গ হিসেবে।

ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করতে গিয়ে, স্বাভাবিক কারণেই মানুষ যেমন এসে পড়ে জগৎ-প্রকাশের কারণ সম্পর্কিত কৌতূহলে তেমনি প্রকাশ করে জীবনাতীত সম্পর্কেও কৌতূহল। সত্যের সন্ধান তখনই লাভ করা যায়, যখন জানা যায় সৃষ্টির আদি এবং সৃষ্টির পরিণতি সম্পর্কে। ঈশ্বর যদি নিঃশর্ত হন তাহলে সৃষ্টির উৎস শুধু মাত্র 'এক'। সৃষ্টির স্ফূরণ সেই একের সহজাত প্রকাশ, যে সম্পর্কে নাসদীয় সূক্তে আছে সার্থকতম কবি চিত্তের অনুভব। সৃষ্টি যদি 'এক'-এর সহজাত প্রকাশ-তবে মৃত্যু কি? মৃত্যুও কি তবে সেই 'একেরই' একটা সহজাত ঘটনা নয়? সার্থক অধ্যাত্ম চিন্তায় তাই চিরকালই আছে উৎস এবং অন্ত সম্পর্কে অপার কৌতূহল। আর্য চিন্তাতেও এই দুই সম্পর্কে অপার কৌতূহল। আর্য চিন্তাতেও এই দুই সম্পর্কে অপাব কৌতূহলের অন্ত ছিল না। জীবনের উৎস সম্পর্কিত আর্য ধারণার পরিচয় আমরা পেয়েছি। কিন্তু অন্ত অর্থাৎ মৃত্যু, বা মৃত্যুর পরের সম্পর্কে অর্থাৎ এই দৃশ্যমান অস্তিত্বের পববর্তী অবস্থা সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল কি? সেই ধারণা কি সত্যানুভবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? কিংবা উৎস সম্পর্কেও যেমন অন্ত সম্পর্কেও তেমনি লৌকিক ও লোকোত্তর, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ ও সত্যদ্রষ্টা ঋষির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য ছিল?

বৈদিক-আর্যেরা ভারতে প্রবেশ করেছিলেন একটা বিজয়ের গর্ব নিয়ে। একটা চঞ্চল প্রাণেরই উপাসক ছিলেন তারা। সুতরাং জীবনের বাইরে পরবর্তী অধ্যায় সম্পর্কে তেমন কৌতূহল প্রদর্শন করেননি প্রথম দিকে। জীবন এক ঋতময় প্রাণের স্পন্দনে উচ্ছ্বসতি ছিল তাদের কাছে। জীবনের প্রতি গ্লানি আর বিতৃষ্ণা ছিল না জীবনকে ক্লান্ত করে তুলতে। সুতরাং মৃত্যুর চিন্তা অভিভূত করতে পারেনি প্রাথমিক আর্যদের। মৃত্যু নয়, তাঁদের প্রার্থনা ছিল জীবনেরই জন্য, তাদের নিজেদের এবং উত্তর পুরুষদের জন্য শতায়ু কামনা করে। মৃত্যুর পরে জীবনের অবস্থা সম্পর্কে তেমন কোন কৌতূহল ছিল না। অবশ্য কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি যে এ-বিষয়ে একেবারে চিন্তা করেন নি, তাও নয়। পুনর্জন্মের চিন্তা তখনও অনেক দূরে।

মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা না করার কারণ হয়তো এই যে, আর্যরা বিশ্বাস করতেন যে, মৃত্যুতেই শেষ হয় না সব। রাত্রির পর যেমন আসে দিন তেমনি মৃত্যুর পর অবধারিত রূপেই আবার আসে জীবন। অস্তিত্ব যদি প্রকাশ পায় তাহলে অনস্তিত্বের মধ্যেই তার চির সমাপ্তি হতে পাবে না। অপ্রকাশিতের প্রকাশই যদি জীবন, তাহলে জীবনের অনস্তিত্বের অর্থ হচ্ছে সেই প্রকাশমান অপ্রকাশের মধ্যে ফিরে যাওয়া। মৃত্যু সম্পর্কে এ হল জ্ঞানের কথা, দার্শনিকতার কথা। এ হল লোকোত্তর অনুভব। কিন্তু সাধারণের মধ্যে মৃত্যুর ধারণা ছিল কি ধরনেব?

সূর্যের জীবনের প্রকাশ যদি তার উদয়, তাহলে জীবনের লীলাস্থল হল তার দিনের আকাশ। এবং অস্ত হল তার মৃত্যু। মৃত্যু এক বহুদূর ধুসর

লোক যেখানে সূর্য তার জ্যোতি হারিয়ে রাত্রির অন্ধকার সৃষ্টি করে। সেই অস্তাচলের ধূসর জগৎকে শুধু মাত্র সূর্যেরই নয়, মানুষেরও মৃত্যুলোক হিসাবে কল্পনা করেছে সাধারণ মানুষ। তাই সম্ভবত বৈদিক আর্যরাও চিন্তা করতেন যে, মৃত্যুর পর মানুষ যায় অস্তাচলের দিকে। সেই অস্তাচলেই আছে মানুষের পারলৌকিক ক্ষেত্র। প্রকৃতির স্তরে স্তরে যদি থাকেন অসংখ্য দেবতা, তাহলে অস্তাচলেরই বা কেউ থাকবেন না কেন। বৈদিক কল্পনায় সেই দেবতারও একটা পরিচয় বেরিয়ে পড়ল শব্দের মাধ্যমে। অস্তাচলের সেই ক্ষেত্রের অধীশ্বর হচ্ছেন যম।[১] কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে আর্য-চিন্তা ক্লান্তিতে বিষণ্ণ নয় বলে যমও ভয়াবহ কোন দেবতা নন। যম ও যমী হলেন প্রথম মৃত মানব ও মানবী। পরলোকের শূন্য ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ করে তাঁরা হয়ে উঠেছেন সেই অঞ্চলের অধীশ্বর ও অধীশ্বরী। সুতরাং সেই মৃত্যুলোক ভয়াবহ কিছু নয়। যেখানে স্থূল প্রথম মানব পুরুষ ও প্রথম মানব রমণী অর্থাৎ মনুষ্য জাতির মহাপ্রাচীন পিতৃপুরুষ রচনা করেছেন তাঁদের নিজেদের লোক, সেই পিতৃলোক ভীতির স্থান তো নয়ই বরং তা আরও সুখকর লোক এই পৃথিবী থেকে। ঋগ্বেদে এই পিতৃলোকের আছে এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা। যেমন—

'হে পভমান আমাকে মৃত্যুহীন অক্ষয় জগতে স্থাপন কর
যে জগতে স্বর্গীয় দীপ্তি চিরন্তন ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান।[২]
আমাকে সেই জগতে অমরত্ব দান কর, যেখানে মৃত্যুর অধিপতি বৈবস্বন
বাস করেন, যেখানে আছে গোপন স্বর্গের বেদী।[৩]
সুনির্মল বেগবতী বারি ধারা[৪]
আমাকে সেই জগতে অমরত্ব দান কর যেখানে সকলেই বিচরণ করে বেড়ায়
স্বাধীনভাবে অর্থাৎ দ্যুলোকের সেই গভীর অন্তঃপুরে,
স্বর্গে, যেখানে স্বচ্ছ জগৎ আলোয় উদ্ভাসিত।[৫]
আমাকে প্রাণবন্ত ইচ্ছা এবং নিবিড় আকাঙ্ক্ষার জগতে অমরত্ব
দান কর—[৬]
আলোদীপ্ত চন্দ্রের জগতে, যেখানে আছে পর্যাপ্ত
আহার এবং বিহার ;

(১) যম হলেন first man যিনি মৃত্যুর পর সূক্ষ্মলোকে মানুষের সূক্ষ্মাত্মার নিয়ন্ত্রণের অধিকার পেয়েছিলেন বলে বিশ্বাস। আসলে সূক্ষ্মলোকের নিজস্ব সুরছন্দ ছাড়া অন্য কোন নিয়ন্ত্রক দেবতা নেই।

(২) এখানে স্পষ্টভাবে জ্যোতির জগতের কথা উল্লেখিত হয়েছে-যে জগৎ সৃষ্টির অবতরণ মানে ঊর্ধ্ব থেকে ক্রম পর্যায়ে নিম্ন দিকে তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ আনন্দ পর্যায়ে। কিন্তু এ পর্যায় অক্ষয় নয়।

(৩) এ হল মৃত্যুর পর সক্ষ্ম স্তরের কথা। মৃত্যুর স্বরূপ জ্ঞানই অমরত্বে।

(৪) অনাহত পর্যায়ে যতক্ষণ সূক্ষ্মদেহীর সুপ্তবৃত্তি পুনরায় প্রকাশ না পায় ততক্ষণ সে স্বাধীন।

(৫) এই ইচ্ছা ও আকাঙ্খা হল পাশহীন বোধের গতি ও চিন্তা।

(৬) অনাহত চক্র মণ্ডলেই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার প্লাবন লক্ষ্য করা যায়। এই আলোদীপ্ত চন্দ্রের জগৎ-লালন ফকিরের 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে'-জগতের মত।

আমাকে সেই জগতে অমরত্ব দান কর যেখানে আছে সুখ
এবং স্বচ্ছন্দ গতি
যেখানে আছে আনন্দ ও সুযোগ
সম্মিলিত ভাবে, এবং যেখানে অভিলাষ
চির চরিতার্থ।[১]

ঋগ্বেদের ঋষিদের মনে মৃত্যুলোক সম্পর্কে এই যে কল্পনা এতে বিভীষিকার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। বরং আছে মৃত্যুর পর এক অনন্ত অস্তিত্বে অবস্থিতির চিত্র। অবশ্য সুকর্ম যারা করেন, তাঁরাই মাত্র এই অনন্ত সুখসমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী হতে পারেন। মৃত্যুর পর মানুষের ঘটে রূপান্তর। অন্য দেহ। মৃত্যুর পর মানুষ হতে পারে অমর। একই মানুষ যদি মৃত্যুর পর অমর হতে পারে তাহলে মৃত্যু কি? আর অমৃতই বা কি? মৃত্যু তাহলে পার্থিব দেহের অবসান মাত্র। এর বেশি আর কিছুই নয়।

মানুষ যদি দৈহিক মৃত্যুর পর মৃত্যুহীন হয়, অপরিবর্তনীয় অস্তিত্বে বিরাজ করতে পারে তাহলে সত্য এবং মানুষের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? অপরিবর্তনীয় এক অনাদি অবস্থাইতো সত্য, যাকেই লোকে বলে ঈশ্বর বা পরম ব্রহ্ম। তাহলে মৃত্যুর পর কি মানুষ ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়? এবং এই ঈশ্বরত্বে কি আত্মা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বাস করে? অপরিবর্তনীয় যদি বহু হয় তাহলে এক ঈশ্বরের চিন্তা মিথ্যা। সুতরাং যে নাসদীয় সূক্তে আর্য কল্পনা 'এক'-এর কাছাকাছি সেই আর্য কল্পনাই কি মৃত্যুলোকের চিন্তায় বিভ্রান্ত বহুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী? আর্য-লোকধারণা এবং লোকোত্তর ধারণা বোধ হয় এক্ষেত্রেও জড়িত। মহান আর্য কবিঋষির লোকোত্তর ধারণা বোধ হয় জীবনের পরবর্তীলোকে যে শাশ্বতের সন্ধান লাভ করেছিল পরব্রহ্মণাস্বরূপ। সেই কবিদের মতে অমৃতলোকে সবাই যেতে পারেন না, পাবেন শুধুমাত্র তাঁরাই যাঁরা সেই পথ সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু সেই পথ জানবার পরেও পরব্রহ্মত্বে লীন হতে দেখি না কাউকে। অমরত্বের সন্ধান কেউ যখন লাভ করেন পরবর্তীকালে ভারতীয় চিন্তাতে দেখি তিনি নিজেই হয়ে যাচ্ছেন পরব্রহ্মণ। সুতরাং স্বতন্ত্র অস্তিত্বে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই জন্যই ভারতীয় সত্য সাধনা যখন সিদ্ধ, তখন কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না। পাবার আকাঙ্ক্ষা তখন হবার বাসনায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু সেই অমৃতলোকের সন্ধান যাঁরা জেনেছেন তাঁরা কেউই ঋগ্বেদের চিন্তাতে স্বীয় অস্তিত্ব ত্যাগ করতে পারেন নি। সেই অমৃতত্বের পথ জেনে ছিলেন যম, জেনেছিলেন আঙ্গিরস ঋষিরা, জেনেছিলেন মরুৎ, ইত্যাদি অনেকেই, কিন্তু কেউ তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাননি। অর্থাৎ উৎসের চিন্তাতে আর্য মানস যে অগ্রগতি দেখিয়েছিল অন্তের চিন্তায় তা দেখাতে পারেনি বোধ হয়?

পরলোকে যাবার দুটো পথের কথা চিন্তা করেছিলেন আর্য-ঋষিরা—দেবযান ও পিতৃযান। এর একটি পথে অগ্রসর হলে আবার ফিরে আসার আর প্রশ্ন নেই, সেখানে অমৃতত্ব। কিন্তু আর একটি পথে গেলে শুভকর্মের ফলভোগ করবার পরই আবার প্রত্যাবর্তন। কিন্তু অমৃতত্ব যদি বহু হয়, তাহলে অমৃতত্ব ধারণার অমর্যাদা ঘটে। কারণ নিঃশর্ত সেই

(১) চতুর্থস্তরে সাময়িক সাম্য বা equilibrium-এর কথা বলা হয়েছে।

'এক' ছাড়া অমর কিছু নেই। এবং সেই 'একে'র অবিচ্ছিন্ন গুণ হিসেবে যদি দ্বৈত হয় (অগ্নি ও তার আলোর মত) তাহলে মৃত্যুলোকে অমৃত্বও একটা ছায়া মাত্র অর্থাৎ আগুনের আলোর মত। অর্থাৎ অগ্নি এবং আলোর মধ্যে সে সম্পর্ক সেই এক এবং অমৃতের মধ্যেও সেই সম্পর্ক। অর্থাৎ এই অমৃত্বও এক ধরনের অব্যক্ত সত্য।

আর্য-মৃত্যু কল্পনায় দেখা যাচ্ছে যে পার্থিব এই অস্তিত্বটাকে মিথ্যে বলে ধরা হচ্ছে। আত্মার নিজস্ব আবাস পরলোকে। কারণ ঋগ্বেদেরই কোন স্তোত্রে বলা হয়েছে ('পার্থিব জগতে তোমার যজ্ঞ ও শুভকর্মের ফল হিসাবে তোমার পিতৃপুরুষের সঙ্গে, যমের সঙ্গে ঊর্ধ্বলোকে মিলিত হও। সমস্ত ত্রুটি পশ্চাতে রেখে তোমার স্বগৃহে যাও। তোমার সত্যিকারের দেহের সঙ্গে মিলিত হও যা নাকি বীর্যে পরিপূর্ণ।)[১] অর্থাৎ একটা শাশ্বত জগৎ জগতের চিন্তা আছে, যদিও সেই চিন্তা তখনও পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। কারণ সেই শাশ্বত জগৎ সম্পর্কে ধারণার স্বচ্ছতা নেই। অবশ্য এই স্তোত্রে আত্মার পুনর্জন্মের একটা ক্ষীণ ইঙ্গিত আছে। কিন্তু সেটা কি পর্যাপ্ত প্রকাশ যে ঋগ্বৈদিক আর্যরা পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন? উৎস সম্পর্কে আর্য-কল্পনার যতটুকু অগ্রগতি, অন্ত কল্পনাতে তা নেই। বস্তুত ঋগ্বেদে আর্য কবি-দার্শনিকের কল্পনা আমাদেরই সৌর জগতের দূরবর্তী গ্রহের মত। কখনও সূর্য প্রদক্ষিণের সময় অত্যন্ত কাছে সরে আসছে, আবার দূরে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ সত্যের বৃত্তে ভ্রমণকালে কখনও আর্য ঋগ্বৈদিক কল্পনা অমৃত রসস্নাত হয়ে পরমুহূর্তেই আবার তা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে। অর্থাৎ এক কথায় এইটুকুই বলা যেতে পারে যে, ঋগ্বেদের পরমার্থ চিন্তা অনুসন্ধানের স্তর পার হতে পারেনি। যে ঈশ্বর অনাদি আদি, যে ঈশ্বর মধ্য, যে ঈশ্বর অন্তহীন অন্ত, সে ঈশ্বর কখনও কখনও কবি কল্পনার ছোঁয়া পাওয়া গেলেও বিশ্লেষণের আলোতে তিনি না জন্মে, না জীবনে, না মৃত্যুতে সন্দেহাতীতভাবে পরিস্ফুট।

অমৃতের চিন্তা মৃত্যু সম্পর্কিত কল্পনাতে যেমন স্পষ্ট নয়, তেমনই নয় অমৃতত্ব লাভের পথ। অমরত্ব লাভ করা যায় না, অমর হওয়া সম্পর্কেও যায়। সেই অমর হওয়ার একমাত্র পথ হল অমরত্বের স্বরূপ জানা। বাহ্যিক কোন আচার অনুষ্ঠান সেই সন্ধান দিতে পারে না। কবি হৃদয়ের গভীর অনুভূতিতে আন্তর সত্য উদ্ভাসিত হলে তবেই লাভ হয় অমরত্ব—যাকেই উপনিষদের যুগে বলা হয়েছে আত্মানং বিদ্ধি। বস্তু-জীবনের পরপারে সেই অমৃত লাভের সঠিক সন্ধান বোধহয় ঋগ্বেদে নেই। তাই অমৃত লাভের পথ হিসেবে কিছুটা নির্ভুল নিশানা যদিও আছে শুভ কর্মের মধ্যে (শুভ কর্ম যদি কতকগুলি নৈতিক আচার-নিষ্ঠা হয় তবে নয়। শুভ-এর অর্থ যদি হয় সত্য জ্ঞান তবেই শুভ কর্ম অমৃতের পাথেয়) তবু যখন বলা হয় যে-সৎ ব্যক্তি দেবতা আরাধনা করেন তিনিই অমৃতত্বের অধিকারী তখন তা অমৃত পথের মিথ্যা সন্ধান, যদি না আর্য ঋষি কবির অনেকেরই মত সেই দেবতা সীমা অতিক্রমকারী নিঃসীম বিশালের দিকে ধাবমান হয়।

(১) এই যজ্ঞ হল Sacrifice of ego. পিতৃপুরুষের সঙ্গ হল Absolute Being-এর সঙ্গ। তবে শেষ পর্যন্ত পরব্রহ্মণের কল্পনায় ঘাটতি থেকে গেছে। বীর্য অর্থাৎ তেজ বা এনার্জি ব্রহ্মণপূর্ণ পর ব্রহ্মণে গুণ বা বীর্য সুপ্ত।

যদি ধরা যায়, যে ঋগ্বৈদিক ঋষির শুভ অর্থ সত্য এবং দেবতা অর্থ সর্বব্যাপী মহান 'এক' তাহলেও যিনি অমৃতের জন্য এই সব না করেছেন অর্থাৎ শুভ কর্ম ও দেব আরাধনা, তাহলে তাব কি হবে? অমৃত স্বর্গ যদি শুধুমাত্র ভালর জন্যই, তাহলে তার কি হবে? অমৃত স্বর্গ যদি শুধুমাত্র ভালর জন্যই, তাহলে পাপী যে, মৃত্যুব পর তার পরিণতি কি? সে যদি স্বর্গে যেতে না পারে, তাহলে কি মিশে থাকে অনস্তিত্বে? এবং তা যদি না হয়, তাহলে অশুভ কর্মের অধিকারী ব্যক্তির জন্যও কল্পনা করতে হয় আর এক জগৎ। সুতরাং জীবনের পরপারে কোন বিভীষিকার জগৎ কল্পনা করতে না চাইলেও আর্য চিন্তায় অবশ্যম্ভাবীরূপে তা এসে গেছে। এবং অথর্ববেদের যুগে অনার্যরাই কি সেই নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছেন তাদের? অর্থাৎ নবকের? কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণেব নরক বর্ণনা না থাকলেও অন্ধকারময় এক জগতে কল্পনা করতে বাধ্য হয়েছেন আর্যরা। বৈদিক স্তোত্রেই আমরা শুনতে পাই বরুণ নিজে দুষ্কৃতকারীকে ঠেলে নামিয়ে দিচ্ছেন তমসাচ্ছন্ন নিম্নলোকে যেখান থেকে নিষ্ক্রমণের কোন পথ আব নেই।[১] অবশ্য ঋগ্বেদে এ ধবনের কোন শাশ্বত অন্ধকার জগতের কথা অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই স্বীকার করেন না। যদিও জন্ম জন্মান্তর দিয়ে, সংসার কল্পনা করে পরবর্তীকালে এই সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা হয়েছে, ঋগ্বৈদিক আর্যরা সে ধরনের কোন কল্পনা করেননি। তবে ঋগ্বেদেরই কোন এক অংশে আছে এ ধরনের চিন্তা, যেমন—'করণীয় কর্তব্য সমাধানের পরে মানুষ যখন বৃদ্ধ হয় তখন এই জগৎ থেকে সে প্রস্থান করে। কিন্তু এই প্রস্থানের পর আবার জন্মগ্রহণ করে, এটা হল তাব তৃতীয় জন্ম।'[২] এমন স্তোত্র আছে বেদে, হয়তো অনার্য প্রভাবেই, যাতে দেখা যাচ্ছে যে, অজ্ঞান ব্যক্তির আত্মাকে ফিবে আসার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে বৃক্ষ থেকে, আকাশ থেকে, সূর্য থেকে।[৩] কিন্তু এ-সব থেকে পুনর্জন্মবাদ সম্পর্কে ঋগ্বৈদিক আর্যদের স্পষ্ট চিন্তা ছিল এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তাহলে? তাহলে কি এ স্বীকার করে নিতে হবে যে, 'অন্ত' অন্তহীন সমস্যার মধ্যেই রেখে দিয়েছিল সংহিতা যুগের আর্য মানুষকে? তার লোক-সাধনা, লোকোত্তর সাধনা কোনটাই হদিশ করতে পারেনি জীবনের পরবর্তী অবস্থায়? বিশেষ করে অমৃত জীবনের?

কিন্তু পারলৌকিক কল্পনায় অমৃতত্ব সম্পর্কে ধারণার যে অস্পষ্টতাই থাক না কেন অমৃতের স্বরূপ যে একেবারেই ঋগ্বৈদিক আর্যদের হয়নি তা নয়। ঋগ্বেদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছে লোকসাধনার পর্যায়। কিন্তু যেখানেই বিশাল কবি হৃদয়কে ব্যাপ্ত করে দিয়ে সত্যকে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানেই এসেছে জ্ঞান। ঋগ্বেদের গল্পের উপাদান সম্পন্ন স্তোত্রগুলিকে যদি প্রতীক হিসাবে ধরে নিয়ে তার ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে হয়তো সেই সত্যের

(১) এখানে বৈদিক চিন্তা—খ্রীষ্টীয় ও ঐশ্লামিক নরক চিন্তা থেকে পৃথক নয়। কিন্তু এমন চিন্তা লজিক এবং বিজ্ঞান কোন দিক থেকেই সত্য হতে পাবে না।

(২) তৃতীয় জন্ম বলা হয়েছে এই কারণে যে, স্থূল জগতে প্রথম জন্ম, মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম জগতে তাব আবিভাব বা জন্ম এবং আবার সংস্কারের বশে স্থূল দেহে তার আবিভাব।

(৩) এখানে বৃক্ষ হল স্থূল পার্থিব আবহাওয়াব অঞ্চল। আকাশ হল দেশ (Space) সূর্য হল জ্যোতিসমুদ্র।

স্বরূপ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ইন্দ্রের বৃত্র সংহার, বলের এবং বৃহস্পতির ধেনু উদ্ধার হয়তো তেমনি ঘটনা। বৃহস্পতি যেমন ধেনু উদ্ধারক তেমনই তিনি সঙ্গীতজ্ঞও। সঙ্গীতের অর্থ জ্ঞান। সঙ্গীত যেমন জ্ঞান, ধেনুও তেমনি আলোর প্রতীক। ঋগ্বেদে জগৎ হল ত্রিলোক নিয়ে।(এই ত্রিলোক হল পৃথ্বী, অপস এবং তেজস। ইন্দ্র, বৃত্রকে বধ করে বৃষ্টিধারার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি অপস-এ পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবর্তী অঞ্চলের মেঘলোককে সরিয়ে দিয়ে পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে পার্থক্য দূর করেছিলেন।) তথাকথিত যজ্ঞের দ্বারা প্রতিবন্ধ দূর করা যায় বটে কিন্তু পরমের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। পরমের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন শুধুমাত্র সঙ্গীতের দ্বারাই সম্ভব। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা। এবং এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে যে-সকল দেবতা সঙ্গীত প্রিয় তাঁরা সবাই দ্যুলোকের অধিবাসী। তাঁরা তাই পরিচিত সূক্তভাজ নামে।(কর্মকাণ্ড মানুষকে দিতে পারে 'অপস'-এর মধ্যে প্রবেশাধিকার। যজ্ঞে বৃষ উৎসর্গ এই কথাই প্রমাণ করে। বৃষভ শব্দের অর্থ বর্ষণকারী। জ্ঞানের প্রতীক হল অশ্ব—তাই দধ্যক ঋষি অশ্বশিরের মাধ্যমে মধুবিদ্যা অর্থাৎ পরম জ্ঞান দান করেছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যাঁরা অশ্বের অধিকারী তাঁরা তাই পরমজ্ঞানের অধিকারী হিসাবে চিহ্নিত। এইজন্যই দধিক্রামণ নামে অশ্বের উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদে একটি স্তোত্র নিবেদিত আছে। এবং সেই স্তোত্রের শেষের দিকে বলা হয়েছে 'তিনি আমাদের বাক্য মধুর করুন, জীবন অতিক্রম করে তিনি আমাদের নিয়ে যান।'[১] এই জন্যই কর্মকাণ্ডে অর্থাৎ যজ্ঞে প্রয়োজন সোম (ইন্দ্রের প্রিয়) কিন্তু মধু[২] প্রয়োজন জ্ঞানের দেবতার জন্য। এবং এ ধারণা আর্যদের ছিল যে জ্ঞানের মাধ্যমেই নিঃশর্ত সত্যে পৌঁছানো সম্ভব। সুতরাং পরলোকে অমৃত জীবনের জন্য শুভ কর্ম ও দেব আরাধনা যে প্রচ্ছন্নভাবে জ্ঞানেরই বিকাশ নয় তা স্পষ্ট করে বলা যায় না। কিন্তু তবু কেমন যেন ঋগ্বেদের সত্যচিন্তা প্রকট হয়েও স্পষ্ট নয়।)

(বার বার যে-কথা বলবার চেষ্টা করছি, এখনও তাই বলতে চাই। সে-কথাটা হল এই যে, সত্য—একমাত্র সত্যকে জানবার অনুসন্ধিৎসা থেকেই প্রকাশিত হতে পারে। স্বার্থ দিয়ে সত্যকে বিচার করবার চেষ্টা করলে সত্যের বিকৃতি অনিবার্য। তাই অসীমের সাড়া বৈদিক পর্বে কখনও যদি মানুষের মনে এসে থাকে, তবে তা অবশ্যই এসেছে ঋগ্বেদের যুগে—যখন কবি তাঁর অনুভূতি-প্রবণ হৃদয়কে মেলে ধরে সাড়া পেতে চেয়েছেন সেই অবাঙ্‌মানসগোচরমের। অনন্তের সুর হৃদয় পেতে তিনি শুনেছিলেন বলেই বেদের এক নাম শ্রুতি।[৩])

ঋগ্বেদের পরবর্তী বেদে, যেমন সাম ও যজুর্বেদে, আনুষ্ঠানিকতা দেখা দিয়েছিল বলেই কবি-কল্পনার মহিমার সেখানে অভাব। মাঝে মাঝে

(১) চূড়ান্ত জ্ঞান অর্থাৎ পরব্রহ্মণ অর্থাৎ শুদ্ধ নির্গুণ চিৎসত্তায় নিয়ে যান।

(২) সোম হল সহস্রারস্থ রস, যা স্নিগ্ধ অনুভবে সিক্ত করে। কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ ব্যতীত তা সম্ভব নয়। সেইজন্য একে বলা হয়েছে ক্রিয়াযোগ। কর্মকাণ্ড। মধু ও কুল অর্থাৎ শক্তি। জ্ঞান সাধনায় তাকে আরো প্রচণ্ড ভাবে উদ্বোধিত করতে হয়। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য not of kind, but of degree.

(৩) সহজ যোগ হৃদয়কে আবরণ মুক্ত করে কবিহৃদয়েরই মত অনুভূতিপ্রবণ করে তোলে।

অতীন্দ্রিয়ের যে ইঙ্গিত ফুটে উঠবার চেষ্টা করেছে—উচ্চকোটীর অনুভব সেখানে তেমন নেই। ব্যতিক্রম অথর্ববেদ। অথর্ববেদের মধ্যে উচ্চকোটির দার্শনিকতা থাকলেও তুক্‌তাক্‌-ফুস্‌-মন্তরের জন্য তা অনার্য ভাবধারার ধারক ও বাহক হয় তাহলেও আর্য ঋষিদেব সংকলনে সেই ভাবধারার যথার্থতা ফুটে উঠেনি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবধারা ঋগ্বেদেও যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল তা নয়। ঋগ্বেদেও আছে—'এই রহস্যময় সম্মোহনী মন্ত্র, বশীকরণের চিন্তা, ডাইনী-বিদ্যার আভাস, জড় পদার্থেব পূজা, এমন কি দৈত্য দানো সম্পর্কে পঙ্‌তি। গৃহীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য চোরের মন্ত্র, অকাল গর্ভপাত রোধে শব্দের বিন্যাস, রোগদূরীকরণের জন্য ফুসফাস এইসব। ঋগ্বেদের সপ্তম ও দশম মণ্ডল খোঁজ করলে এ রকম নজিরও অনেক পাওয়া যাবে। সুতরাং অনার্য-ভাবধাবার আধার বলে যে অবজ্ঞার ভাব আছে অথর্ব-বেদের প্রতি, তার কতটা ঋগ্বেদীয় আর কতটা অনার্য সেটা ভাববার কথা। তবে অথর্ববেদের মধ্যে সত্যসন্ধানে দার্শনিকতার অভ্যুদয় মানুষের অধ্যাত্মজ্ঞানের ইতিহাসে বিরাট এক পদক্ষেপ।

বেদের অবিচ্ছেদ অংশ হিসেবে ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও যতটা আছে আনুষ্ঠানিকতাব ব্যাখ্যা ও অভিজ্ঞতার সংকলন ততটা সেই অপৌরুষেয়র অনুভব নেই। নেই সেই ঋগ্বৈদিক ঋষির শ্রুতি। সৃষ্টির আদি কল্পনাতে ব্রহ্মণের চিন্তা নিশ্চয়ই নাসদীয় সূক্তের উর্ধে নয়। সৃষ্টির কারণ হিসেবে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ধারণা, যে, আদিতে না ছিল দ্যু-লোক, না অন্তরীক্ষ-লোক, না ভূলোক। ছিল না কিছুই। অস্তিত্বে প্রকাশের বীজ হল ইচ্ছা।[১] (প্রজাপতি 'ইচ্ছা থেকে সৃষ্টি করেছেন এই দৃশ্যমান জগৎ---') এ ব্যাখ্যা কবি কল্পনার চাইতে শ্রেষ্ঠ নয় কখনই।

ববং ব্রাহ্মণ যুগে সত্য ধারণার জন্য কবি কল্পনা ও দার্শনিকতার বাইরে নৈতিকতা একটা উল্লেখ করববার মত পর্যায়, যেখানে সর্বজীবের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটেছে, আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য 'ত্যাগ' দেখা দিয়েছে বড় হয়ে। যেমন শতপথ ব্রাহ্মণেই উল্লেখ করা হয়েছে 'সর্বমেধ'-এর কথা, অর্থাৎ সর্বকিছু পরিত্যাগ করতে পারলেই মুক্তি। সত্যবাদিতা থেকে সৎচিন্তা পর্যন্ত নানা নৈতিক বিজ্ঞান দেওয়া হয়েছে অধ্যাত্মজীবনেব জন্য। অধ্যাত্ম সাধনায় সহায়তার জন্যই এসেছে শ্রেণীবিন্যাস, (যে কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি)। তবে আনুষ্ঠানিকতার ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসেবে কাজ করলেও, এবং বিশেষ শ্রেণী স্বার্থে (ব্রাহ্মণ) এই ব্রাহ্মণ রচিত হলেও আনুষ্ঠানিক সর্বস্বতাই এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। (বাহ্যিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আন্তর পবিত্রতাও যে অধ্যাত্মসিদ্ধির জন্য সমানভাবেই প্রয়োজনীয়) এ-কথার উপর জোর দিয়ে সাধনার পথকে সত্য থেকে বিচ্যুত হতে দেয়নি ব্রাহ্মণ। এবং আনুষ্ঠানিকতা ও নৈতিকতার বাইরেও মুক্তির সত্যিকারের দুর্জ্ঞেয় পথের উল্লেখ করে ঈশ্বর-সাধনার সঠিক নিশানা হারায় নি। শতপথ ব্রাহ্মণেই আছে এই কথা,

(১) বর্তমান ব্ল্যাকহোল চিন্তার সঙ্গে এর অপূর্ব মিল আছে। Black hole-এ দেশ, কাল, স্থূল জগৎ, কিছুই ছিল না। কিন্তু মাধ্যাকর্ষীয় অভিকর্ষের জন্য ছিল 'compression'-জাতীয় প্রচণ্ড তাপ (ইচ্ছা)।

যেমন ('যিনি সত্য পথের সন্ধান জানেন না, শুধুমাত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বলিদান বা তপোশ্চর্যার মাধ্যমে তিনি সেখানে যেতে পারেন না।[১] একমাত্র সেই অবস্থাতে (সত্য অনুভবে) পৌঁছতে পারেন তিনিই, যিনি এই (গুহ্য) জ্ঞানের অধিকারী।')

সত্য সাধনায় উৎস সম্পর্কিত ধারণার উপর যেমন নির্ভর করে ঈশ্বর-সম্পর্কিত ধারণার স্বচ্ছতা, তেমনি অন্ত (মৃত্যুর পরের অবস্থা) সম্পর্কিত ধারণার উপরও নির্ভর করে সত্য সাধনায় প্রাপ্তির গভীরতা। ঋগ্বৈদিক চেতনায় উৎস সম্পর্কিত সত্যের নিকটত্ব যেমন বিস্ময়কর মৃত্যুর পরে অবস্থা সম্পর্কে ধারণার তেমন গভীরতা নেই। অনুষ্ঠান নিয়ে যার ব্যস্ততা সেই ব্রাহ্মণে-এর চাইতে উচ্চকোটির কল্পনা অনুভব করা যাবে, এটা আশা করা যায় না। আর তা ছাড়া নানা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্পর্কে ধারণারও কোন সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্য সম্পর্কিত অনুভবের ইঙ্গিত মাঝে মাঝে এত চমকপ্রদ যে, অবশ্যম্ভাবীরূপে তা অধ্যাত্মচিন্তার চূড়ান্ত উৎকর্ষের কথা মনে করিয়ে দেয়। যেমন শতপথ ব্রাহ্মণেই আছে আনুষ্ঠানিকতার জয়গান—'যিনি যজ্ঞ করেন, বলিদান করেন, তিনি লাভ করেন শ্বাশত সমৃদ্ধি, তিনি অধিকার করেন আদিত্য এবং অগ্নির সঙ্গে একই স্থান'। ব্রাহ্মণের ধারণা, সচেতন ভাবে যিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি পালন করেন তিনি লাভ করেন অমরত্ব বা দীর্ঘ-জীবন। কিন্তু অনুষ্ঠান কার্যে যাদের অবহেলা আছে। পূর্ণ জীবন উপভোগের আগেই তাদের যেতে হয় পরলোকে। কর্মানুসারে তারা লাভ করে ভাল এবং মন্দ। ব্রাহ্মণে আনুষ্ঠানিকতার এমনও জয়গান আছে যে, বলা হয়েছে, অনুষ্ঠানকারী, ধার্মিক লোক পরলোকে তাঁর এই সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহ নিয়েই (সর্বতনু) জন্মগ্রহণ করেন।[২]

মৃত্যুর পরে পরলোক সম্পর্কিত চিন্তার স্বচ্ছতা, নেই, নেই, নেই—না ঋগ্বেদে না ব্রাহ্মণে। ঋগ্বেদের ধারণা মৃত্যুর পর পাপী অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে অনস্তিত্বে এবং পূণ্যবান লাভ করবেন অমরত্ব ; ব্রাহ্মণের ধারণা পাপী পুণ্যবান উভয়েই লাভ করবে পুর্ণজন্ম তাদের কর্মফল ভোগের জন্য। ব্রাহ্মণে আবার কোথাও দেখা যায় মৃত্যুর পর খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদেরই মত চিরন্তন এক জগতের কল্পনা। (যেমন শতপথ ব্রাহ্মণেই আছে এমন কথা—'মানুষ নিজের সৃষ্ট (কর্মফল দ্বারা সৃষ্ট) জগতেই জন্মগ্রহণ করে।' ঐ শতপথ ব্রাহ্মণেই আছে—'এ জগতে যেমন খাদ্য ভক্ষণ করবে মানুষ তেমন খাদ্য দ্বারাই ভক্ষিত হবে পরলোকে।' যদিও জন্মান্তরবাদের স্পষ্ট ধারণা নেই ব্রাহ্মণে, তবু পুনর্জন্মের কথা আছে কর্মফল ভোগের পর। যেন কর্মফল ভোগের জন্য মানুষ চিরকাল এক জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে বন্দী। যেখানে আছে চিরন্তন স্থিতি, সেই জগতের ধারণা নেই। জীবন এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করে যে অনন্ত জীবন তাইতো মানুষের সাধনা—সেই অমৃত জীবনের স্পষ্ট বর্ণনা

(১) এখানে যজ্ঞ, বলি ও তপস্যা স্থুল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তপস্যা স্থুল অর্থে একধরনের কৃচ্ছ্রতা। সূক্ষ্ম অর্থে কুলকুণ্ডলিনীর উত্থান জনিত তাপ।

(২) এখানে খ্রীষ্টান ও ঐশ্লামিক পরলোক চিন্তার সঙ্গে বেশ ভালরকম একটা মিল রয়েছে।

নেই ব্রাহ্মণেও। তবে কোথাও কোথাও আছে উচ্চতর এক ধারণার কথা। যেমন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে 'দেবতা উদ্দেশ্যে দান করলেই ততবড় জগতে যাওয়া যায় না যতটা যাওয়া যায় আত্মার উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করলে) দান করলে।' ঐ ব্রাহ্মণেই আছে 'যিনি বেদজ্ঞ তিনি পুনর্বার মৃত্যুব হাত থেকে মুক্ত, এবং লীন হয়ে যান পরব্রহ্মণের সঙ্গে।' নির্বিকল্প পরব্রহ্মণের কল্পনা আছে তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণেও। যেমন, সেখানে কোন এক জায়গায় বলা হয়েছে 'অগ্নি আছে বাক্যের মধ্যে, বাক্য হৃদয়ে, হৃদয় আমার মধ্যে আমি অমৃতের মধ্যে এবং অমৃত পরব্রহ্মণের মধ্যে)

ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণেও আনুষ্ঠানিকতার অসারতার কথা প্রমাণিত হচ্ছিল বোধহয়। কারণ শতপথ ব্রাহ্মণেই এমন ধারণা আছে, যার অর্থ—'না বুঝে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করলে অমরত্ব লাভের সম্ভাবনা নেই। তাকে পুনর্জন্ম লাভ করে মৃত্যুব শিকার হতেই হবে।' কোথাও আছে উপনিষদেরই মত অত্যুচ্চ পরিসমাপ্তি কল্পনা, যেমন, 'আত্মাই হল এ সমস্ত কিছুর শেষ। ... এই আত্মার কোন ইচ্ছা নেই, কিন্তু এতেই আছে আকাঙ্ক্ষিত সকল বস্তু, কারণ এই আত্মা কিছু আশা করে না।'[১] আত্মার এই অবস্থাতে মানুষ যেতে পারে তখনই যখন জ্ঞানের দ্বারা মানুষ হতে পারে আকাঙ্ক্ষা-রহিত। যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বা বলিদান করে সেখানে যাওয়া যায় না। যেখানে যেতে হলে চাই জ্ঞান। একমাত্র জ্ঞানের অধিকারীই সেখানে যেতে পারেন।

কিন্তু উপনিষদীয় এই উচ্চকোটির ধারণা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, ব্রাহ্মণ নিঃসন্দেহভাবে সন্ধান পায়নি সেই পারলৌকিক জীবনের উৎসের সঙ্গে যা এক। ব্রাহ্মণ স্পষ্ট ধারণা করতে পারেনি পুনর্জন্মবাদের। ব্রাহ্মণেব মূল লক্ষ্য ব্যক্তিসত্তার অমরত্ব। উৎস এবং অন্ত যেখানে এক, যেখানে আছে অনন্ত গতি ও স্থিতি, যা অনুভব করা যায়, বলা যায় না, সেই অবাঙমানসগোচরম জগতের সন্ধান, আনন্দমেব সন্ধান এসেছে আরও পরে। জ্ঞান দ্বারা, বিচার দ্বারা, অনুভব দ্বারা, সত্য সন্ধানেব সেই প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করা যাক এবার।

ঈশ্বর সন্ধানে ভারতঃ উপনিষদ

উপনিষদ, এই শব্দেব মধ্যেই রয়েছে এর চরিত্র নিহিত, যেমন 'উপ' অর্থ নিকট, নি অর্থ নির্ভুলভাবে এবং ষদ অর্থ বিদীর্ণ করে দেওয়া, লাভ করা বা ধ্বংস করা। তাহলে উপনিষদ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় এই রকম, যেমন, নির্ভুলভাবে নিকটে লাভ করা বা নির্ভুলভাবে লভিত হয়, কি সেটা? যদি লাভের মত লাভ করার কিছুমাত্র থাকে পৃথিবীতে, তাহলে 'সত্য' ছাড়া আর কোন্ জিনিস লাভ করার সার্থকতা আছে? সুতরাং বলা যেতে পারে যে, নির্ভুলভাবে নিকটে সত্য লাভই হল উপনিষদের অর্থ। আর যদি বিদীর্ণ অর্থেই ধরি তাহলে বলতে হয় নিকটে অর্থাৎ দূরত্ব এতটুকু না রেখে

(১) এখানে অতিশূন্যতার চিন্তা বর্তমান।

ভ্রান্তিকে নির্ভুলভাবে বিদীর্ণ করাই হল উপনিষদ। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, উপনিষদের মূল অর্থ হল সত্যজ্ঞান। শঙ্করাচার্য ষদ অর্থকে বিদীর্ণ করা অর্থে ধরে নিয়ে তাই বলেছিলেন ('যাঁরা মুক্তিসন্ধানী, যারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি অকর্ষণ-বিরোধী, তা এ জন্মেই হোক আর পরজন্মেই হোক, তাঁরাই উপনিষদ পাঠ করেন এবং তা অনুসরণ ক'রে পুনর্জন্মের কারণ হিসেবে যে অজ্ঞতা তাকে বিদীর্ণ বা ধ্বংস করেন।') তৈত্তিরীয় উপনিষদ উপনিষদ শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে 'উপনিষদ শব্দের অর্থ হল জ্ঞান, কারণ হয় এর দ্বারাই পুনর্জন্ম বা অবক্ষয়কে বিচূর্ণ করে দেওয়া যায়, অথবা এর দ্বারাই স্থিত হওয়া যায় সর্বোত্তম মঙ্গলে।' সুতরাং উপনিষদ কথার অর্থ হল জ্ঞান বা দর্শন। আর উপনিষদ বলতে যে-সকল গ্রন্থের কথা আমরা বুঝি, তা হল তার দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ যে সকল পুস্তকে জ্ঞানের সন্ধান, সত্যের সন্ধান আছে, তাই উপনিষদ।

উপনিষদ বেদান্ত হিসেবেও পরিচিত। এর কারণ এই যে, প্রত্যেকটি বেদই শেষ হয়েছে উপনিষদ দিয়ে। বেদের শেষাংশ বলেই হয়তো একে বলা হয় বেদান্ত। কিংবা উপনিষদেই বৈদিক চিন্তার চূড়ান্ত সিদ্ধি বলেই তাকে বলা হয় বেদান্ত। উপনিষদকে অনেকে অবশ্য 'রহস্য'-ও বলে থাকেন। এর কারণ হয়তো এই যে উপনিষদে আলোচিত যে দুর্বোধ্য গোপন সত্য, তা শুধু বিশেষভাবে দীক্ষিত ব্যক্তির নিকটেই আত্মপ্রকাশ করে বলে এর নাম রহস্য।

উপনিষদের সঙ্গে বেদের অন্যান্য অংশের পার্থক্য এই যে, বেদের স্তোত্র বা আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলি ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গেই বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, আর্য-চিন্তার সঙ্গে নয়। কিন্তু আর্য-চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হলেও উপনিষদ প্রাণহীন কোন তর্ক বিদ্যা নয়, এর মূল লক্ষ্য হল মানুষের মুক্তি এবং সত্যের স্বরূপ লাভ করে শান্তি। সত্যের যথার্থ স্বরূপ অনুধাবনের জন্য একটা আন্তরিক ব্যাকুলতা আছে উপনিষদ রচয়িতাদের মধ্যে। পশ্চিম জগতের দার্শনিক আলোচনার মত প্রথাসিদ্ধ কোন আলোচনা নয় উপনিষদ। বা উপনিষদ এমন একটা গ্রন্থ নয় যে, একটিমাত্র বিশেষ রচয়িতা এর স্রষ্টা। বা বিশেষ কোন একটা যুগেই যে উপনিষদের রচনা, তাও নয়। অনেক উপনিষদের মধ্যেই আছে চিন্তার বিশৃঙ্খলা। অনেকগুলিই হয়তো অবৈজ্ঞানিক; কিন্তু তাতে এর মূল্যের হেরফের হয়নি কিছু। কারণ এই উপনিষদের মধ্যেই আছে সত্য সম্পর্কিত গভীর মৌল ধারণা, যা নাকি সত্যিসত্যিই অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ের কাছে পরম তৃপ্তিদায়ক।

হ্যাঁ, (মানুষের যে অন্তর সত্যসন্ধানে মাতৃস্তন্য পিয়াসী গো-বৎসের মতই উদগ্রীব তাকে হৃদয় বলাই বাঞ্ছনীয়। কারণ উপনিষদের যথার্থ দৃষ্টিলাভ করা গেলে হৃদয় তার প্রকৃত অর্থে পূর্ণ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ হৃদয় হয় হৃদি-অয়ম, অর্থাৎ তিনি আমার হৃদয়ে। অর্থাৎ পর ব্রহ্মস্বরূপ আমার হৃদয়ের মধ্যেই আমি লাভ করি—কারণ সত্য একমাত্র আমার মধ্যে ছাড়া অন্য কোথাও নিহিত নেই। সেই জন্যই তো উপনিষদ শিক্ষাদাতার মূল কথা হল—আত্মানং বিদ্ধি, অর্থাৎ নিজেকে জান)

উপনিষদে যে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা নেই, তা নয়, কিন্তু সে বুদ্ধিবৃত্তি তর্কের বুদ্ধিবৃত্তি নয়, তা হল অনুভূতিজাত অভিজ্ঞতার বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ। সেই

জন্য কোন কোন পশ্চিমী পণ্ডিত যেমন উপনিষদকে বলবার চেষ্টা করেছেন—শূন্য গর্ভ বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণা বা empty intellectual conception' তা সত্য নয়। তবে উপনিষদের সেই অনুভূতিজাত সত্য বিশ্লেষণে যাবার আগে উপনিষদ সম্পর্কে সামান্য আব একটু বলে নেওয়াই হবে বোধহয় যুক্তিসঙ্গত, যদিও সে কথাটুকু ইতিহাসের কথা, উপনিষদের আঙ্গিক সম্পর্কিত আলোচনা, তার আত্মা সম্পর্কিত নয়।

বৈদিক সাহিত্যের আয়তন বিশাল। মহীরুহের মত তার শাখাপ্রশাখাও অসংখ্য। কিন্তু সেই বিশাল মহীরুহের সবটাই আজ আর আমাদের দেখবার উপায় নেই। যাদুঘরের ডাইনোসরের কঙ্কাল দেখে ডাইনোসর কল্পনা করে নেবার মতই সামান্য থেকে সেই অসামান্যের অনুমান করে নিতে হবে আমাদের। হয় বৌদ্ধবিদ্রোহের বন্যায় তার অনেকটাই গেছে ভেসে, কিংবা মহাপ্রাচীন সেই ব্রাহ্মণ সন্তানদের (যাঁরাই ছিলেন বেদের ধারক) প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের ফলেই সেই পূর্ণাঙ্গ বৈদিক সাহিত্য সম্ভার আজ আমাদের অধিকারের বাইরে। জোর করে আজ আমরা কেউ বলতে পারি না উপনিষদের সংখ্যা কত, আর কোন্ উপনিষদই-বা নিশ্চিন্তরূপে কোন্ বেদের সঙ্গে যুক্ত। বেদের স্তোত্র নয়, ব্রাহ্মণ অংশের সঙ্গেই উপনিষদ যুক্ত। এবং সেই কারণেই প্রায়শঃই ব্রাহ্মণেরই এক অংশ আরণ্যকের সঙ্গেও যুক্ত। একমাত্র ব্যতিক্রম হল ঈশাবাস্য উপনিষদ যা নাকি ব্রাহ্মণের সঙ্গে না হয়ে শুক্ল যজুর্বেদের শেষ অংশ হিসাবে যুক্ত।

উপনিষদের সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা এসেছে মুক্তিকা উপনিষদ নামে এক উপনিষদের কাছ থেকে। মুক্তিকা উপনিষদে পাওয়া যাচ্ছে একশ' আটটি উপনিষদের একটি তালিকা। সে তালিকায় আমাদের দরকার নেই। এই উপনিষদগুলি চারবেদের সঙ্গে ভিন্নভাবে যুক্ত। যেমন ঋগ্বেদেব সঙ্গে যুক্ত হল—ঐতরেয়, কৌশীতকি, নাদবিন্দু ইত্যাদি। শুক্ল যজুর্বেদের সঙ্গে যুক্ত—ঈশাবাস্য, বৃহদারণ্যক, জাবল; কৃষ্ণ যজুর্বেদের সঙ্গে—কেন, ছান্দোগ্য আরুণী এবং অথর্ববেদের সঙ্গে—প্রশ্ন, মুনডক, মানডুক্য এই সব।

এই উপনিষদগুলিব মধ্যেও সবগুলি যে সবার কাছে সমান মূল্যবান তা নয়। শঙ্করাচার্যের মতে এগারটি উপনিষদই সব চাইতে মূল্যবান যেমন, ঈশাবাস্য, কেন, কথবল্লী, প্রশ্ন, মুনডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয, ঐতরেয, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং নৃসিংহপূর্বতাপনী, যদিও এই এগারটি উপনিষদের বাইরে আরও অন্ততঃ ছ'খানি উপনিষদের সাহায্য নিয়েছেন তিনি তাঁর আলোচনাতে। আবার রামানুজ যখন তাঁর রচনাতে উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনিও প্রায় এগারটি উপনিষদকেই নির্ভরশীল বলে ধরে নিয়েছেন। তবে শঙ্করাচার্য যে এগারটি উপনিষদের নাম করেছেন তাঁর উপনিষদ ঠিক সেই এগারটিই নয়। পৃথক।

উপনিষদ একবারে রচিত হয়নি সবগুলোই। সময়ের ফারাকও হয়তো একের সঙ্গে অপরের অনেক। যেমন সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেও এদেশে উপনিষদ রচিত হয়েছিল, যার নাম অল্লোপনিষদ।

বেদের স্তোত্রগুলির মত পুরনো উপনিষদগুলিও মুখে মুখেই চলত এক সময়। ফলে বিভিন্ন উপনিষদে কখন যে একের বিষয় অপরের মধ্যে ঢুকে

গেছে বলা দুঃসাধ্য। সামান্য একটু রদবদল করে একই বিষয়ই হয়তো চলে গেছে অপরের মধ্যে। যেমন পঞ্চাগ্নি বিদ্যার দর্শন আছে ছান্দোগ্য আর বৃহদারণ্য উপনিষদ দুটোতেই এবং প্রাণ সম্পর্কেও আছে একই ধরনেব ধ্যানের কথা। আবার বৈশ্বানর বিদ্যা সম্পর্কে আছে একই ধরনের ধ্যানের কথা। আবার বৈশ্বানর বিদ্যা সম্পর্কে বৃহদাবণ্যক এবং কৌশীতকিতে। আবার কোথাও কোথাও একই উপনিষদেব দুই অংশে হুবহু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিও আছে। যেমন, বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক ও মৈত্রেয়ীর কাহিনী। এ-সবই হয়তো মুখে মুখে চলে আসার ফলে একে অপরের সঙ্গে জট পাকিয়ে গেছে। কিন্তু সত্য-সন্ধান যাদের বিষয়, এ-সব তাদের কাছে তেমন একটা ব্যাপারই নয়। কয়লার মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও হীরে আর কয়লা এক নয়। জহুরী যে সে ঠিকই হীরে চেনে। হীরে-সন্ধানী কয়লার খনিতে কয়লা না খুঁজে হীরের দিকেই চোখ মেলে থাকবে। এবং হীরে দেখলেই জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে দেখে বলবে—চিনেছি। তেমনি সত্যমিথ্যায় যতই জড়িয়ে থাক না উপনিষদ, সত্যসন্ধানী যে তাঁর চোখে সত্যই ধরা পড়বে, মিথ্যে নয়।

আমাদের লক্ষ্য সত্য। কতটুকু সত্যের সন্ধান উপনিষদ দিতে পেরেছে সেটা। ইতিহাস তো বিষয় নয়, বিষয় দর্শন ; দেহটা আমাদেব উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য প্রাণ কিংবা অনন্ত প্রাণ। দেখা যাক, ঋগ্বেদ যেটাকে হাতড়ে বেরিয়েছে, উপনিষদ কি তাকে নির্ভুলভাবে ধরতে পেরেছে? সত্যই কি দার্শনিক সোফেনহাওয়ারের কথামত উপনিষদ জীবনে শান্তি, মরণে শান্তি! সুতরাং ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণ থাক। জটিলের আবর্তের কোথাও যদি সরলতা থেকে থাকে, তার সন্ধান করা যাক। উপনিষদ কি সত্যই সেই অবাঙ্মানসগোচরম আনন্দলোকের ধারক?

কেউ মনে করেন বৈদিক স্তোত্রেই ছিল সত্যের নিশানা, কয়লার সঙ্গে মেশানো। উপনিষদ কয়লা থেকে হীরক বের করে নিয়েছে। তবে সেজন্য বস্তু-বিজ্ঞানের পথে চলেনি উপনিষদ। তার বিষয় বস্তু নয়, অবাঙ মানসগোচরম সত্য, যাকে বলা হয় শর ব্রহ্মণ, সুতরাং বিজ্ঞানের গতি যে পথে, উপনিষদের গতি সে পথে নয়। উপনিষদ তর্কবিদ্যা নয়, পর ব্রহ্মবিদ্যা। আমাদের জ্ঞানে আহরণের জন্য আছে কতকগুলি পদ্ধতি, যেমন Perception (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি), Inference(অনুমান নির্ভর সিদ্ধান্ত) ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়ের সরাসরি আলোড়ন থেকে যে জ্ঞান, যাকে বলে Perception, সে জ্ঞান হল একেবারে প্রাথমিক স্তরের জ্ঞান। আর অনুমান নির্ভর সিদ্ধান্ত থেকে যে জ্ঞান, যাকে বলে Inference, তা হল উন্নত ধরনের জ্ঞান ; কিন্তু তার ভিত্তিও সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। তবে উপনিষদ যে-জগতের জ্ঞানের বার্তাবহ সে জগতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা অচল। সে জগৎ অতীন্দ্রিয়।

যে জগতের জন্য কবি-হৃদয়ের অনুরণনে আকুলি-বিকুলি করেছে ঋগ্বেদের কবি-ঋষি, সেই জগতের একটা নির্দিষ্ট রূপরেখা টানতে চেয়েছে উপনিষদ। এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অতি-বুদ্ধিগ্রাহ্য ছবি। অর্থাৎ অসম্ভবকে সে সম্ভব করতে চেয়েছে। অনুভবকে প্রকাশ করে দেখাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমস্ত শিল্পের যেখানে সীমাবদ্ধতা, উপনিষদের দার্শনিক শিল্পীরা কি সেখানে সফল হয়েছেন?

উপনিষদের বিষয় হল এই ধরনের, যেমন, মৃত্যুর পরেও কি থাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র? স্বর্গ বলে কোন স্থান আছে কি, মৃত্যুর পর মানুষ যেখানে যায়? আবার কি মানুষ ফিরে আসে এই জগতেই? মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য কি? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চরিত্র বা পরিণতিই বা কোথায়? ঈশ্বর কি আর আত্মাই বা কি? আত্মা বা ঈশ্বরের সম্পর্ক কি, এই জগতের সঙ্গেই-বা তাদের ব্যবহার কি? বস্তুগ্রাহ্য যে জগৎ সে তো পরিবর্তনীয়, কিন্তু অপরিবর্তনীয় সত্য কি? ইত্যাদি।

উপনিষদের যা বিচার্য বিষয় যুক্তিতর্কের তা বাইরে। তবু তার জন্য চাই যুক্তিতর্ক। বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, সেখানেই বোধহয় আরম্ভ উপনিষদের। বোধহয় আধুনিকমানসে সেটাই তার সর্বাপেক্ষা অবহেলার কারণ। কিন্তু আজ? বিজ্ঞান সম্ভবত পৌঁছে গেছে উপনিষদেরই ধারে। এবং হতবাক বিস্ময়ে বস্তুগ্রাহ্য যুক্তিতর্ক হয়তো বলছে—না, আর অবিশ্বাস কিছু নেই, যা বস্তু, তাই অবস্তু।[1] পদার্থ-বিদ্যা বিশ্লেষণ করতে করতে হদিশ পাচ্ছে না পদার্থের। মনোবিদ্যা আত্মবিশ্লেষণ করতে করতে হারিয়ে যাচ্ছে এক মহামানসের মধ্যে। জ্যোতির্বিদরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের হিসেব নিতে নিতে পেয়ে যাচ্ছেন এক অনন্ত অসীম ইচ্ছার পরিচয়। হ্যাঁ, পদার্থবিদরা যখন পরমাণু বিশ্লেষণ করতে করতে হতবাক বিস্ময়ে দেখতে পাচ্ছেন শুধু এক গতিময় অস্তিত্ব, যার মধ্যে নেই বস্তুগ্রাহ্য চরিত্র, গতি বিশ্লেষণ করতে করতে অবাক বিস্ময়ে দেখছেন—গতি আর স্থিতি বোধহয় একই, আলো আর অন্ধকারও বোধহয় এক, শব্দ আর নৈশব্দের মধ্যেও নেই পার্থক্য, তখনই বোধহয় বলে উঠছেন Physics is the greatest enemy of Physics. জীববিজ্ঞানী আজ বিশ্লেষণ করতে করতে জীবনের ক্ষুদ্রতম ভিত্তি হিসেবে পেয়েছেন যে জীবকোষ, যার নাম জিন, এবং যখন তাকেও বিশ্লেষণ করে পেয়েছেন ভাইরাস ও সাব্‌ভাইরাস, এবং এইভাবে যখন সূক্ষ্মতম পর্যায়ের প্রান্তে এসে দোদুল্যমান হচ্ছেন জীবন এবং মহাজীবনের দোলায়, তখন হয়তো বা উপনিষদের অতীন্দ্রিয়ই হচ্ছে তাঁর শেষ নির্ভর। ডাঃ গ্রোডেক রোগ বিশ্লেষণ করতে করতে মনের হদিশ নিতে গিয়ে যেমন অকস্মাৎ হারিয়ে গেছেন এক মহামানসের মধ্যে, যেখানে দেখতে পাচ্ছেন, শুধু এক মহামানস ছাড়া আর কিছু নেই কোথাও, এই দেহও সেই মহামানসের প্রকাশ, দেহকষ্টও তারই, আবার মৃত্যু নামক তিরোধানও সেই মহামানস ছাড়া আর কিছু নয়, তখন অপার বিস্ময়ে কোন কিছুরই নামকরণ করতে না পেরে শুধু বলে উঠেছেন— The It. সেই The it কে যদি আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার উপরে, তাহলে হয়তো উপনিষদের দার্শনিকেরই মত নির্ভয়ে বলে উঠতেন, সোঽহং। মানবিক মানস হয়তো উপনিষদের অতিমানসকেই আজ স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে। কিন্তু উপনিষদের আলোচ্য বিষয় ও ধ্যানধরন না জেনে কোন সিদ্ধান্তই অনুচিত। সুতরাং আগে প্রবেশ করা যাক অতি-মানস বিশ্লেষণের জগতে।

---

[1] $E = mc^2$

হ্যাঁ, মূল তত্ত্বে যাবার আগে বস্তুগ্রাহ্য আলোচনাতে আর একটু আসা যাক। বেদ যেমন অপৌরুষেয়— তবু তা নামগোত্রহীন নয় লোকসঙ্গীতের মত, উপনিষদেরও তেমনি আছে রচনাকার। ব্যক্তির মধ্যেই ব্যক্তির অতীত ধরা দিয়েছিল এখানেও। ব্যক্তি যখন সীমার বন্ধন খুলে মিশে যায় বিশাল ব্যাপ্তিতে তখন সে ব্যক্তি না থেকে হয়ে যায় সত্য। ব্যক্তির সেই সত্যে পৌঁছানোর সন্ধান যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁরা নিজেদের জীবন সম্পর্কে এতটা উদাসীন ছিলেন যে, শুধুমাত্র নাম ছাড়া আর কোন পরিচয় জানাই অসাধ্য। অনেকে আবার নিজেদের রচনা দেবতার নামে চালিয়ে দিয়ে নিজেদের নামটাকে পর্যন্ত অবলুপ্ত করে দিয়ে গেছেন আশ্চর্য রকমে। যেমন—প্রজাপতি, ইন্দ্র, নারদ আর সনৎকুমারের নামে আছে কিছু রচনা। নিজেদের নামও যেমন আছে, যেমন মহিদাস, ঐতরেয়, সাণ্ডিল্য, সত্যকাম, জাবাল, জৈবলি, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, ভরদ্বাজ, গার্গ্যায়ণ, বালাকি, অজাতশত্রু, বরুণ, যাজ্ঞবল্ক, গার্গী, মৈত্রেয়ী ইত্যাদি, তখনও পরিচয় তেমন নেই। এই বুঝি হয়। মহাজীবনের যাঁরা সন্ধানী, তাঁরা ব্যক্তি-জীবনের কোন মূল্যই দেন না স্বতন্ত্রভাবে।

উপনিষদের মূল লক্ষ্য সত্য। কিন্তু সেই সত্যের স্বরূপ কি, বলা শক্ত। এ-ব্যাপারে মানুষ ঐতিহ্য আর স্বীকৃত বেদজ্ঞের মূল্য যত দিয়ে থাকে, নিজের স্বতন্ত্র ধারণার মূল্য তেমন দিতে চায় না। অথচ সত্যকে জানার জন্য নিজের অনুভূতির মূল্যই বেশী। উপনিষদ শিক্ষার ধারাতেও ছিল তাই। সত্যকে জানিয়ে দেওয়া হতো না, জানতে দেওয়া হতো। অর্থাৎ সত্য-সন্ধানীকে নিজেকেই জেনে নিতে হবে সত্যের স্বরূপ, অপরের মুখ থেকে নয়। সেই জন্যই উপনিষদের মূল কথা—আত্মানং বিদ্ধি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অদ্যাবধি মানুষ স্বীকৃত তাত্ত্বিকের মুখাপেক্ষীই বেশী। নিজেদের মতামত দিতে বড় কুণ্ঠিত। যেমন বিরাট এক সংখ্যা উপনিষদের মূল বক্তব্য কি সেজন্য শঙ্করাচার্যের মন্তব্যকেই চূড়ান্ত বক্তব্য বলে মনে করেন। অর্থাৎ উপনিষদের মূল বক্তব্য, মানে উপনিষদ, ভগবদগীতা, বেদান্তসূত্র সম্পর্কে মূল বক্তব্য হল—অদ্বৈত দর্শন। অর্থাৎ উপনিষদ হল অদ্বৈত দর্শনশাস্ত্র। আবার আর একদলের মত হল, উপনিষদ সম্পর্কে শঙ্করাচার্যের কথাই শেষ কথা নয়। উপনিষদের মূল কথা হল ভালবাসা আর ভক্তি। এ-নিয়ে তর্কের অভাব নেই, এবং নিজেদের ধারণা বোঝাবার জন্য যুক্তিজাল বিস্তারেরও অন্ত নেই। আসলে এইটুকু ধরে নেওয়াই বোধহয় ভাল যে, উপনিষদ কোন অনঢ় দর্শন প্রচার করেনি বা গোড়া কোন অধ্যাত্ম তত্ত্বও ব্যক্ত করেনি। সত্য-সন্ধানী উপনিষদ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত দিয়েছে শুধু। সত্যের প্রতি বিভিন্ন ঈশ্বর সম্পর্কিত অনুমান যে, যে-কোন সত্য-সন্ধানীই নিজের সত্যানুভবের সঙ্গে মিল খুঁজে পেতে পারেন এখানে। বীজ থেকে যেমন গাছ, তেমনই পরব্রহ্মণ থেকে এই বিশ্বজগতের উৎপত্তি, এ ধারণা গোঁড়া শঙ্করবাদীদের মতে ভ্রান্ত। এ-জগতের কোন বাস্তবিক মূল্য নেই, সবটাই একটা মরীচিকার মত, মায়া বা ভ্রান্তি—এটাই তাঁদের মত। কিন্তু এটা উপনিষদকারের নিজের কথা নয়, তাঁর ভাষ্য মাত্র। (সত্য সন্ধান করতে হলে ভাষ্যকারের ভাষ্যে বিশ্বাস না করে নিজের অন্তরের আলোয় সত্য সন্ধান করাই ভাল। সুতরাং আসুন না,

নিজের বোধের আলোতেই একবার বিচার করে দেখবার চেষ্টা করি উপনিষদকে ?)

বেদের সঙ্গে যুক্ত হলেও, ব্রাহ্মণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও, উপনিষদ কিন্তু আসলে স্বতন্ত্র এক ধরনের সাহিত্য। সে দীপ্যমান তার নিজের আলোতেই, বেদের স্তোত্র বা ব্রাহ্মণের আলোতে নয়। অর্থাৎ চন্দ্রের মত বেদ বা ব্রাহ্মণের কোন উপগ্রহ নয় উপনিষদ। বেদ সংহিতার যে দেবতা ছিল সরল বিশ্বাসের সূত্রে মানুষেব সঙ্গে যুক্ত, সেই সূত্রকে ছিন্ন কবে ব্রাহ্মণ এনেছিল আর্যধর্মবিশ্বাসের মধ্যে একটা যান্ত্রিক যাজকীয় পদ্ধতি। কিন্তু সত্য-সন্ধানী উপনিষদকার বৈদিক অনুভূতিজাত দৈববিশ্বাসকে যাজকীয় যান্ত্রিকতাব হাত থেকে মুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন তার সত্যিকারের আসনে। ঋগ্বেদে যে একম অদ্বিতীয়ম-এব ছায়াপাত ঘটেছিল নাসদীয় সূক্তেব মত ছন্দোবদ্ধ ঋষি-দৃষ্টিতে, তাকে দিবালোকের মত স্পষ্ট করে তুলবার প্রয়াসই হল উপনিষদের। বৈদিক-ঋষিব হৃদয়-সঞ্জাত বোধকে আরো গভীরতর হৃদয়ের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার সাধনাই হল উপনিষদের সাধনা। উপনিষদ হল পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে, আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে মূর্তিমান প্রতিবাদ। বেদের অপৌরুষেয়তাকে কুসংস্কাবের মধ্যেই ফেলে রাখতে চায় নি সে, বলিষ্ঠ অন্বেষায় তার যথার্থ তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে। সর্বশক্তিমান, অসীম, শাশ্বত, অবাঙ্মানসগোচরম সৎ, উৎস, মধ্য ও পরিণতি যে সত্য, তারই অন্বেষায় নিয়োজিত উপনিষদের সকল প্রয়াস। যে সত্য এই দৃশ্যমান জগতের আলো, উৎস, জীবন—এক ও অদ্বিতীয়, সেই নিঃশর্ত সত্যই উপনিষদের অনুধাবনের বিষয়, বেদে যা ছিল অর্ধ-ঈশ্বর, উপনিষদে তাই পেয়েছে পূর্ণতা। অন্ধবিশ্বাস নয়, অনুভূতিজাত প্রশ্নের মধ্যেই মিলে পূর্ণতার সন্ধান। তাইতো যাজ্ঞবল্ককে কেন্দ্র করে উপনিষদেব প্রশ্ন—(''হে যাজ্ঞবল্ক, বলুন, সত্যসত্যই কত দেবতা আছেন? যাজ্ঞবল্ক বললেন, শুধুমাত্র 'এক'। প্রশ্ন হল, অন্য আর একটি প্রশ্নের জবাব দিন; অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, কাল—যা নাকি প্রাণ, অন্ন, ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু,—কেউ বা এঁকে, কেউ বা ওঁকে ধ্যান করেন। বলুন, আমাদের পক্ষে এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর কে? যাজ্ঞবল্ক জবাব দিলেন, 'এসবই সেই সর্বোত্তম, শাশ্বত অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মণেব বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র।... এসবই পরব্রহ্মণ। এই অভিব্যক্তিগুলিকে কেউ ধ্যান করতেও পারেন, পূজা করতেও পারেন, আবার অস্বীকারও করতে পারেন।'')

এই হল উপনিষদ। সংস্কারমুক্ত নির্ভীক সত্যের সাধনা। স্বীকৃতি অস্বীকৃতি সত্যের কাছে দুইয়েরই মূল্য সমান। এই দৃশ্যমান জগত আর কিছুই নয়, সেই অসীমেরই সীমাব মধ্যে প্রকাশ। সীমার মধ্যে তিনিই বস্তু আবার অসীম অবস্থায় তিনিই পরমাত্মা। বিষয়রূপে যিনি দৃষ্ট, বিষয়ীরূপে তিনিই দ্রষ্টা। অর্থাৎ 'এক'ও যা 'বহু'ও তাই। সবই পরব্রহ্মণ। (বর্তমান পারমাণবিক বিস্ফোরণ কি সেই দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে না? যাজ্ঞবল্কের কাছে যা ছিল অনুভবগোচরীয় সত্য, তাই কি পরীক্ষা-উত্তীর্ণ সত্যরূপে প্রকাশ পাচ্ছে বিজ্ঞানে?)

উপনিষদের এ যে সত্য, বেদগ্রহণে সাধারণ মানুষের ভ্রান্তির উর্ধে তাকে

প্রতিষ্ঠা করাই ছিল উপনিষদকারদের মূল লক্ষ্য। নানা উপনিষদ নানাভাবে সেই একই লক্ষ্যে ধাবিত। আর্য ঋষি-কবিদের বহুদেবতা-বন্দনা শেষপর্যন্ত অনন্তস্বরূপের সন্ধানেই ব্যস্ত ছিল। পুরুষ সূক্তে, নাসদীয় সূক্তে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু সেই কবি-হৃদয়ের অধিকারী যাঁরা নন, সেই সাধারণ মানুষ কবিশ্লোকে আবির্ভূত বহুদেবতাকে বহু হিসেবেই দেখেছিল। আর এই বিশ্বাসটাই বসে যাচ্ছিল তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে। বিশ্বাসের মূলে শিকড় বসানো সেই ভ্রান্তি দূর করা ছিল এক দুঃসাধ্য কাজ। উপনিষদ সেই দুঃসাধ্য সাধনের দায়িত্বই গ্রহণ করেছিল। বহু দেবতাকে উপনিষদ নামিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল একের অধীনে। পরব্রহ্মণের স্বরূপ বোঝানোর জন্য তাই তার নানা বাক্য। নানা গল্পের অবতারণা। সেই যে তাঁর পরব্রহ্মণ ইচ্ছা ছাড়া অগ্নি একগুচ্ছ তৃণকেও পোড়াতে পারে না। (পরব্রহ্মণেরই ভয়ে অগ্নি দাহন করে, সূর্য আলো দেয়, বায়ু প্রবাহিত হয়, মেঘ বৃষ্টি দান করে, মৃত্যু তার দায়িত্ব পালন করে, এই সব গল্পাশ্রিত কথা। কখনও কখনও বহু দেবতাকে এক মহাবিরাটের অংশ বলে বর্ণনা করে সাধারণ মানুষের ভ্রান্তি অপসারণের চেষ্টা আছে উপনিষদে। যেমন উদ্দালক ও রাজা অশ্বপতির গল্প। উদ্দালকের নেতৃত্বে পাঁচজন গৃহী গেলেন রাজা অশ্বপতির কাছে। রাজা প্রত্যেককেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আত্মা হিসাবে তোমরা কাকে ধ্যান কর?' প্রথমগৃহী বললেন 'দ্যৌ'কে দ্বিতীয় সূর্যকে, তৃতীয়, বায়ুকে, চতুর্থ অন্তরীক্ষকে এবং পঞ্চম গৃহী বললেন জলকে। রাজা বললেন তোমরা প্রত্যেকেই সত্যের এক একটা অংশকে পূজা কর মাত্র।

বহু বস্তুকে একের মধ্যে দেখাবার জন্য উপনিষদে শিল্পী-মানস বিস্তারের অভাব নেই। সেই মহাবিরাটের স্বর্গ হল শির, সূর্য-চক্ষু, বায়ু-নিঃশ্বাস, অন্তরীক্ষ-দেহ, জল-মূত্রস্থলী এবং পৃথিবী-চরণ।) এইভাবে এক কেন্দ্রীয় সত্যকে বোঝাবার জন্যই তাঁর বর্ণনা। দার্শনিকের সত্যানুভবকে সাধারণের বিশ্বাসের কাছে নিয়ে আসার জন্য এ-ধরনের গল্প ফাঁদা ছাড়া আর উপাই-বা কি আছে। যিনি বুঝবেন, তিনি এরই মধ্যে পাবেন চিরন্তনের নির্বিকল্প সত্তা, আর যিনি বুঝবেন না তিনি অন্তত ধারণার মধ্যে আনতে পারবেন এক মহাবিরাটকে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে সেই বিরাটের বোধ আনার জন্য যদি প্রাক্তন বিশ্বাসকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয় প্রচণ্ড আঘাতে, মানুষের সংস্কারপন্থী মন অবিশ্বাস করতে পারে। সেজন্য উপনিষদকারেরা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মূলে একটা দর্শন জুড়ে দিয়ে তাকে উন্নীত করার চেষ্টা করেছেন ভ্রান্তি থেকে, তাকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেননি। এই অস্থির সীমিত দেহ বন্ধন থেকে অনুভূতিকে নিয়ে যেতে হবে শাশ্বতের কাছে। কিন্তু সেজন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি আর গভীর দার্শনিকতা সকলের পক্ষে সহায়ক নাও হতে পারে। তাই সুস্থ জীবন যাপন এবং বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করছেন তাঁরা। উপনিষদের ঈশ্বর-অন্বেষার যথার্থ স্বরূপ বুঝতে হলে এগুলোকেও মনে রাখতে হবে আমাদের।

মানুষের অধ্যাত্ম অন্তর্দৃষ্টির উৎস হল দুধরনের ঃ এক বস্তুগ্রাহ্য আর এক হল অন্তরগ্রাহ্য। বহির্বিশ্বে বিস্ময় এবং অন্তর্জগতের অনুরণন। বেদকে

বিস্ময়াভিভূত করেছে বর্হিবিশে। দেবতারা দেখা দিয়েছেন মহাজাগতিক শক্তির প্রতিনিধিরূপে। কিন্তু উপনিষদ সত্য সন্ধানে তাকিয়েছে নিজেরই অন্তরের দিকে। সত্য যদি এক হয় নিজের অন্তর সত্যের চাইতে বড় সত্য আর কিছু নেই। বহির্বিশ্বে 'একে'র সন্ধান করতে গেলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতই হতে হবে দিশেহারা। এবং বর্তমানে যেমন মহাবিশ্বের বিপুল রহস্যে অভিভূত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, যন্ত্র নয়, বিশ্লেষণ নয়, নিজের মনকে বিস্তৃত করে না দিলে পাওয়া যাবে না মূলের সন্ধান,[১] তেমনি এ ধারণা বহু আগেই এসেছিল উপনিষদকারদের মনে। সত্যের প্রতি যদি সত্যিকারের অনুরাগ দেখা দেয়, তাহলে জ্ঞানী মূর্খে কোন তফাৎ থাকে না। মহাবিশ্বের বিরাট বিস্ময় শেষ পর্যন্ত সকলকেই করে তোলে অন্তর্মুখীন। তাই মূর্খ বাউল কবি পর্যন্ত মহাবিশ্বের বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে নিজের অন্তরের মধ্যেই দেখতে পান পরম উৎস। তাই তো তার গান অপার আনন্দে ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে ঃ

'কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে
দেশ বিদেশে খুঁজে বেড়াই অন্ধকারে।'

কিংবা নিবিড় বিস্ময়ে তাঁর অন্তর থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠে এই কথাঃ

'এই মানুষে আছের মন,
যারে কয় মানুষ রতন।[২]

অন্তরের মধ্যে পরমের এই অনুরণই হল আন্তর সত্য। উপনিষদ সেই আন্তর সত্যের সন্ধান পেয়েই মানুষের মনকে অন্তর্মুখীন করার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল প্রথম থেকে। সেই জন্যই কঠোপনিষদ বলেছিল এই ধরনের কথা—'সেই আত্মাস্থিত অস্তিত্বই ইন্দ্রিয় ভেদ করে বহির্মুখী। মানুষ তাই বাইরে তাকায়, নিজের অন্তরের মধ্যে নয়। কিন্তু কিছু কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন, যাঁরা সেই আন্তর সত্যের খবর পেয়ে ধ্যান নিমিলত নেত্রে বর্হিবিশ্বের অন্তরালে দেখতে পান নিজের সেই অন্তরতমকেই। উপনিষদ মানুষকে ফেরাবার চেষ্টা করেছে বহির্বিশ্ব থেকে সেই নিজের হৃদয়ের গভীর অন্তঃপুরের দিকেই। না, মন দিয়ে বিচার করে তাকে পাওয়া যাবে না। মনের ক্রিয়ারও অন্তরালে সেই অন্তরতমের স্থিতি। সমস্ত মনের স্তর ভেদ করে যেতে হবে সেই অনন্ত প্রশান্তলোকে। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে যায় শূন্যতায়।

সত্য কে? পরব্রহ্মণ কে? সেই পরম সৎ-চিৎ-আনন্দ হল মানুষেরই অন্তরতম। তৈত্তিরিয় উপনিষদ সেই পরম সত্য অনুধাবন করেই বলে উঠেছে—ব্রহ্মণঃ কোয়োসি। তোমার এই বস্তুরূপ হল পরব্রহ্মণেরই কোষস্বরূপ। বৃহদারণ্যক তাই বলেছে—'যে দেবতাকে ভিন্ন সত্তাজ্ঞানে পূজা করে, সে অজ্ঞ।' এই মহাজাগতিক বিস্ময় আর সেই অন্তরতম একই

(১) নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিদ ব্রায়ান যোশেফসন এই বিশ্লেষণাত্মক বিজ্ঞান ছেড়ে ধ্যানে বসেছেন, সত্যকে জানতে।

(২) মানুষ রতন হল primordial being যাকে বলা যায় অতি-শূন্যতা।

জিনিস। পরব্রহ্মণই পরমাত্মন এবং পরমাত্মনই পরব্রহ্মণ। ছান্দোগ্য উপনিষদ তাই বলেছে—'সেই 'পরম শক্তি, যার মধ্য দিয়ে সকল কিছুর প্রকাশ, তা প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরতমের সঙ্গে এক।')

বৈদিক সংহিতা পর্বের বহির্বিশ্বমুখিতা থেকে এই যে আন্তর দৃষ্টি উপনিষদের, এই যে অন্তর্মুখীতা, এর মূল্যতো আপ্তবাক্যে উচ্চারিত হয় না! মানুষকে বোঝাতে হলে চাই কারণ, চাই উদাহরণ, চাই, বুদ্ধি, বক্তব্য। অথচ সৎ-চিৎ-আনন্দ যে, যা অকারণ, যা উদাহরণের, বুদ্ধির বাইরে, তারো জন্য করতে হবে তর্কের অবতারণা। এর চাইতে বড় দায়িত্ব আর কোথায়? তর্কবিদ্যা দিয়ে হবে না, মনোবিদ্যা দিয়ে হবে না। অথচ তারই জন্য করতে হবে তর্ক, করতে হবে মনোনিবেশ, বলতে হবে বিচারের জাল বিস্তার করতে। অথচ সেই দুরূহ তপস্যা না হলে উপনিষদের সাধনা সিদ্ধ হবার নয়। তাই উপনিষদ এক বিরাট বিস্ময়। কিন্তু সেই বিস্ময়ের চমক আমাদের বিমোহিত করবে না কিছুতেই, যদি না সেই বিস্ময়ের অনুরণন হৃদয়ে জাগাবার জন্য থাকে বাক্যজালের বিস্তার। অনন্ত স্বরূপের সন্ধানে লতানো গুল্মের মত সূর্যপ্রত্যাশী সেই বাক্যজালই শতাধিক উপনিষদ! গুল্ম কি সূর্যকে ছুঁতে পারে? না সত্যি সত্যিই ছুঁতে পারে সূর্য রশ্মির ভিতর দিয়ে? গুল্ম আর সূর্যরশ্মির মধ্যে তফাৎ নেই। সূর্যেরই আলো গুল্মের সবুজ, গুল্মের প্রাণ। তবু একটা বীজ না হলে সূর্যরশ্মি গুল্মের মধ্যে ধরা দিতে পারে না। গুল্ম সূর্য হতে গিয়েও হতে পারে না একটিমাত্র বীজের ব্যবধানের জন্য। উপনিষদ কি সেই দুরূহ দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিল? উপনিষদের বাক্যজাল সৎ-চিৎ-আনন্দ হতে পেরেছিল? উপনিষদের ধারা অনুসরণ না করলে সেটা বোঝা যাবে না। আসুন না, সেই ধারারই অনুসরণ করি এবার?

(সত্য সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসাই হল সত্যকে জানবার সব চাইতে বড় উপায়। উপনিষদের আরম্ভ সেই অনুসন্ধিৎসা দিয়েই। সেই সব দুরূহ প্রশ্নই হল সত্যের প্রতি প্রথম পদক্ষেপ যে প্রশ্ন আছে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে। যেমন, 'কোথা থেকে আমাদের জন্ম? কোথায়ই বা আমরা বাস করি, আর কোথায়ই বা আমরা যাই?' তোমরা যারা পরব্রহ্মণের স্বরূপ জানো—বল, কার আদেশে সুখ বা দুঃখে আমরা এখানে বাস করি। এই সমস্ত কিছুর কারণ কি? কাল অথবা প্রকৃতি? প্রয়োজন অথবা আকস্মিক ঘটনা? কিংবা মৌলিক কোন পদার্থ, যাকে বলা হয় উৎপত্তির কারণ? কিংবা তিনি পুরুষ, যাকে বলা হয় সর্বোচ্চ চেতনা?' 'কেন' উপনিষদেও ধ্বনিত হয়েছে একই কৌতূহল—'কার ইচ্ছাতে এই মন সক্রিয়? কার নির্দেশে প্রথম নিঃশ্বাস প্রবাহিত? কার ইচ্ছাতেই বা আমাদের এই বাক্য? কোন্ দেবতা পরিচালনা করেন দৃষ্টি এবং শ্রুতি? আর এই কৌতূহল থেকেই সত্য-সন্ধানী উপনিষদের সৃষ্টি।)

এই সব কৌতূহলের জবাব দিতে গিয়েই সমস্যার গভীরতম অংশে প্রবেশ করেছেন উপনিষদকারেরা। যেমন, এর জবাব খুঁজতে গিয়েই তাঁদের মনে হয়েছে, (যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের জ্ঞান—তাকে কি নির্ভুল বলে ধরা যেতে পারে? যে-মনের ক্রিয়া দ্বারা সঞ্চয় করি অভিজ্ঞতা সেই মন কি স্বয়ংনির্ভর

অস্তিত্ব? কিংবা মনের উৎসেও আছে আর কোন শক্তি? এই বস্তু জগতে যে কারণ-ফলাফলের খেলা তা কি সত্য? কিংবা আছে কোন এক এবং অদ্বিতীয়, এ সবকিছুরই উৎপত্তি সেখান থেকে? সেই এক এবং অদ্বিতীয়—যদি কিছু থাকে, তবে তার সীমা নেই, অন্ত নেই। তাহলে যা অসীম, তাকে জানা যাবে কি করে? ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, মনের দ্বারা, বিশ্লেষণী জ্ঞানের দ্বারা যা জানা যায়, তা সবইতো সীমিত। যা সীমিত তা অপরিবর্তনীয় হতে পারে না, যদি হয় তাহলে অসীমের পাশাপাশি তার ও আছে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। তাহলে সত্যের চরিত্র হয় দ্বৈত। এই যে মানুষ, মানুষও শাশ্বত নয়। জীবন নিত্য পরিবর্তনশীল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার নানা পরিবর্তন। পরিবর্তনের মধ্যেই থাকবে সংঘাত। সংঘাতের মধ্যেই আছে দুঃখ। দুঃখের ঊর্ধে যদি কিছু থাকে তবে তা আনন্দ। আনন্দই সবার লক্ষ্য। আনন্দ তখনই তার 'আনন্দ' অর্থে সত্য, যখন তার মধ্যে নেই পরিবর্তন। (কিংবা পরিবর্তন ও অপরিবর্তনে মিলে সে এক আশ্চর্য রহস্যময় লীলা? বৈষ্ণবেরা যে তত্ত্বের উপাসক? সে-কথা যথাসময়ে হবে। এখন থাক।) পরিবর্তন না হলে নিশ্চয়ই তাকে হতে হবে সীমাহীন, শ্বাশ্বত। এই শ্বাশ্বত তবে কি? উপনিষদকারেরা করেছেন এই শ্বাশ্বত সত্যের স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা, এই পরিবর্তনশীল বিশ্বের অন্তরালে অপরিবর্তনীয় সত্যের সন্ধান। সত্য ছাড়া তার পরিতৃপ্তি নেই। সেই জন্যই তার প্রার্থনা—''আমাকে অসৎ থেকে সৎ-এ নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও—অসতো মা সদগময, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতোর্গময।' সেই অমৃতের স্বরূপ উপনিষদকারেরা কী অনুভব করেছিলেন সেটাই প্রথম দেখা যাক)

বৈদিক ঋষিরা সত্যের সন্ধান করেছিলেন বহির্বিশ্বে। উপনিষদ সেই সত্যের সন্ধান করেছনে অন্তর্লোকে। বৈদিক স্তোত্রে সর্বোচ্চ ধারণা ছিল 'একম সৎ'। বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই এক করেন নিজেকে উপভোগ। এই 'একম সৎ'-এ ধারণা উপনিষদে আরও শক্তিশালী হয়েছে পরমাত্মনের বিশ্লেষণে। এই পরমাত্মন কি? এ শব্দের উৎপত্তিই বা কখন, জানি না। ঋগ্বেদে পরমাত্মনের অর্থ হল পরমনিঃশ্বাস, মূল সত্তা। হয়তো ধীরে ধীরে এই অর্থই রূপ নিয়েছে পরমাত্মনে।

(এই পরমাত্মনই হল প্রকৃত সত্য। আর সবই মিথ্যা। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই আত্মনেরই স্বরূপ প্রকাশ করা হয়েছে প্রজাপতি আর ইন্দ্রের কাহিনীতে। দৈহিক আত্মন ধীরে ধীরে উন্নীত হয়েছে সর্বাত্মক আত্মনে। মানুষের আত্মার স্বরূপ কি, যে-আত্মা তার প্রকৃত সত্তা? প্রজাপতি ইন্দ্রকে সেই আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন—'পাপ থেকে যে মুক্ত, বার্ধক্য থেকে, মৃত্যু থেকে, দুঃখ থেকে, ক্ষুধা থেকে, তৃষ্ণা থেকে, যা আশা করা উচিত, অথচ যে তা আশা করে না, যা কল্পনা করা উচিত অথচ যে তা কল্পনা করে না, সেই তাকেই আমাদের অনুধাবন করবার চেষ্টা করতে হবে।')

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রজাপতির এই 'পরমাত্মন' বর্ণনাকেই বৃহদারণ্যক উপনিষদে এইভাবে বলা হয়েছে ('এই পরমাত্মনই সমস্ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অপরিবর্তনীয়, জাগরণে, স্বপ্নে, নিদ্রায়, মৃত্যুতে, পুনর্জন্মে, এবং মুক্তিতে, কোথাও তার বিকার নেই।' এই হল সেই সত্য, যাকে কিছুই

ধ্বংস করতে পারে না। মৃত্যু একে স্পর্শ করে না। পাপ একে বিকৃত করতে পারে না। এই পরমাত্মন হল স্বয়ং সম্পূর্ণ! এর বাইরে দ্বিতীয় আর কিছু নেই। এই পরমাত্মন হল দ্রষ্টা, দৃষ্ট নয়। ব্যক্তিসত্তা বলতে কতকগুলি গুণের যে সমষ্টি বোঝায়, এ তাও নয়। এ হল এমন এক অহং যা সকল গুণের অতীত।

এই পরমাত্মনের স্বরূপ সহজভাবে ইন্দ্রকে বোঝাতে গিয়ে প্রজাপতি একের পর এক কতকগুলি সমস্যা তুলে ধরলেন ইন্দ্রের কাছে—যাতে নিজের চেষ্টাতেই পরমাত্মনের স্বরূপ তাঁর কাছে প্রকাশিত হতে পারে। ইন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করলেন এই আত্মন তবে কি? প্রজাপতি তাকে পরমাত্মনের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে প্রথম সমস্যা দিলেন এইরকম—'পরমাত্মন হলেন প্রকৃতপক্ষে তিনিই—যাঁকে অপরের চোখে তাকালে, জলের পাত্রে তাকালে বা দর্পণে তাকালে দেখা যায়।' কিন্তু এটা যে পরমাত্মন নয় সেটা ইন্দ্রকে বোঝাতে গিয়েই প্রজাপতি বললেন, 'যাও নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে, সুবস্ত্র পরিধান করে, জলপাত্র বা দর্পণে দৃষ্টিপাত কর।' ইন্দ্র তাই করলেন এবং দেখলেন তাঁর যথাযথ প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে। কিন্তু সেই প্রতিবিম্ব দেখেই ইন্দ্রের মনে সন্দেহ দেখা দিল। ইন্দ্র ভাবলেন— 'জলে বা দর্পণে পরমাত্মনের প্রতিবিম্ব তখনই সুসজ্জিত হয়ে উঠে যখন দেহ সুসজ্জিত হয়। তখনই সুবেশিত দেখায় যখন দেহ সুবেশিত থাকে। তখনই পরিচ্ছন্ন দেখায় যখন দেহ থাকে পরিচ্ছন্ন। কিন্তু যদি এই দেহ হয় অন্ধ, তাহলে তো পরমাত্মনও হবে অন্ধ। যদি দেহ হয় বিকল, পরমাত্মনও তাই হবে। যদি দেহ ধ্বংস হয় পরমাত্মনও ধ্বংস হবে। তাহলে? তাহলে এই পরমাত্মনের মূল্য কি? ইন্দ্র প্রজাপতির কাছে গিয়ে তার সন্দেহের কথা বললেন। প্রজাপতি তখন তাকে, দ্বিতীয় সমস্যা দিলেন, 'যিনি স্বপ্নে সুখে বিচরণ করেন, তিনিই পরমাত্মন।' প্রজাপতির দ্বিতীয় সমস্যা দেবার উদ্দেশ্য হল এই, তিনি ইন্দ্রকে বোঝাতে চাইলেন যে, সত্যিকারের পরমাত্মন কখনও দেহ নয়, যেদেহ দুঃখ ভোগ করে, অপূর্ণ, বা বস্তুগ্রাহ্য। দেহ হল একটা চেতনা কর্তৃক ব্যবহৃত মাধ্যম মাত্র, কিন্তু এই চেতনা নিজে বস্তুগত দেহের পরিণতি নয় বা দেহ দ্বারা সৃষ্ট নয়।

সামান্য একটু চিন্তা করবার পর ইন্দ্রও তাই বুঝলেন। দ্বিতীয় সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ করতেই ইন্দ্রের মনে হল—যদি দেহের ত্রুটিতে পরমাত্মার ত্রুটি না হয়, যদি দেহের আঘাতে পরমাত্মা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়? তাহলে স্বপ্নের মধ্যেই বা সেই ত্রুটি থেকে সে মুক্ত কোথায়? সত্য না হলেও স্বপ্নেও তো সেই ব্যথা বেদনার একটা অভিনয় আছে? তাহলে এই সীমিত আত্মার স্বরূপ জেনেই বা হবে কি? আর স্বপ্নতো জাগ্রত অভিজ্ঞতার বাইরে সম্পূর্ণরূপে অভিনব কিছু নয়!

প্রজাপতি দ্বিতীয় সমস্যাটির ক্ষেত্রে স্বপ্নের অবস্থা বেছে নিয়েছিলেন এই কারণে যে, স্বপ্ন দেহ থেকে অনেকটাই মুক্ত। স্বপ্নের মধ্যে দেহের উর্ধে মনের অনেকটা স্বাধীন বিচরণের ক্ষমতা আছে। এখানে তিনি পরমাত্মনকে দেহের উর্ধে একটা মানসিক স্তরের মধ্যে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু স্বপ্নের এই মানসজাত অবস্থা দৈহিক অস্তিত্বের অভিজ্ঞতার দ্বারা সীমিত। সে স্বাধীন নয়। সুতরাং পরমাত্মন যদি দৈহিক সীমার বন্ধন মুক্ত না হয়, তাহলে

তা বিষয় হয়ে উঠে, বিষয়ী হতে পারে না। প্রত্যক্ষ দেহের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হলেও স্বপ্ন স্বয়ম্ভু নয়। কিন্তু পরমাত্মন স্বয়ম্ভু। সুতরাং স্বপ্ন কখনও পরমাত্মন হতে পারে না। ইন্দ্র পুনর্বার প্রজাপতিকে তাঁর সন্দেহের কথা জানালেন। প্রজাপতি এবার তাকে নতুন সমস্যা দিয়ে বললেন—'মানুষ যখন গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন, কোন স্বপ্ন দেখে না, তখন যে অবস্থা, সেই অবস্থাই হল আত্মার যথার্থ স্বরূপ।'

ইন্দ্রকে এই নতুন সূত্র দেওয়ার কারণ হল এই যে, পূর্বের সমস্যা বা সূত্রগুলিতে পরমাত্মন সীমিত হয়েছিল কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমষ্টির মধ্যে মাত্র। কিন্তু যা চিরন্তন, যা শাশ্বত তা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সমষ্টিমাত্র হতে পারে না। সুতরাং পরমাত্মনের শাশ্বত অবস্থান বোঝানোর জন্যই নতুন সূত্র দিলেন তাঁকে। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চাইলেন যে, বস্তুগ্রাহ্য দুনিয়ার অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হচ্ছে এক শাশ্বত চেতনার মধ্যে—যার মধ্যে কোন যতি নেই, বিরাম নেই, যা অনন্ত প্রবাহ অথচ স্থির। তিনি এইটুকু বোঝাতে চাইলেন যে, বিষয় নির্ভর করে বিষয়ীর উপর, বিষয়ী বিষয়ের উপর নয়। পরমাত্মনের সঙ্গে অর্থাৎ বিষয়ীর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হলে বিষয়ের কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বিষয়ী বিষয় ব্যতিরেকেও আপন অস্তিত্বে বিরাজমান। বিষয়ী থেকেই বিষয় কিন্তু বিষয় থেকে বিষয়ী নয়। এই বিষয়ী ব্যতিরিকে কোন জ্ঞানই সম্ভব নয়।

(বিষয়ভুক্ত ধারণাতে, ইচ্ছাতে, কল্পনাতে, প্রত্যেকটি ব্যক্তির অভ্যন্তরস্থ বিষয়ী আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ব্যক্তিসত্তা তাই জানতে পারছে না আপন অন্তরতমের যথার্থ স্বরূপ। কিন্তু এই অন্তরতম বিষয়ীর অস্তিত্ব তখনই জানা যায় যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভব থাকে নিষ্ক্রিয়। গভীর নিদ্রায় ইন্দ্রিয়ের কোন সক্রিয়তাই থাকে না। কিন্তু তার মানে কি মৃত্যু? তার মানে কি প্রাক্তনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ? গভীর নিদ্রার পরে জেগে উঠেও রাম রামই থাকে। রামের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত অভিজ্ঞতাও তেমনি থাকে। অভিজ্ঞতা যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহলে কে ধরে রাখে এই অভিজ্ঞতা? তাহলে এ-কথাই কি প্রমাণ হয় না যে, ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বেও এক চেতনা আছে সদা জাগ্রত? সেইই একমাত্র ধারক? সেই অনন্ত প্রসারিত চেতনার কথা বোঝাতে গিয়েই যাজ্ঞবল্ক বলেছিলেন—' যখন ডুবে যায় সূর্য, ডুবে যায় চন্দ্র, অগ্নিও হয় নির্বাপিত, পরমাত্মনই তখন একমাত্র আলো।')

কিন্তু গভীর নিদ্রার অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রজাপতি ইন্দ্রকে যা বোঝাতে চেয়েছিলেন ইন্দ্র তা বুঝতে চান নি। তিনি সমস্ত কিছুরই বিচার করছিলেন মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা। ইন্দ্র ভাবলেন, ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতাশূন্য যে পরমাত্মন তা অর্থহীন। পরমাত্মন যদি না জানে, না অনুভব করে, না প্রতিক্রিয়াশীল হয়, বিষয়শূন্য হয়, তাহলে তাঁর থাকে কি? কিছুই থাকে না। সমগ্র বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া মানে অনস্তিত্বের মধ্যে গিয়ে পড়া। একটা গাছের পত্র ছিনিয়ে নেবার পর, কাণ্ড অপসারণ করবার পর, মূলোচ্ছেদ করবার পর আর কি থাকে? পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শেষ পর্যন্ত আর কিছুই থাকে না। গভীর নিদ্রায় মনের কোন অস্তিত্বই থাকে না, থাকে না সময় এবং অভিজ্ঞতার পারম্পর্য। চেতনার সামনে কোন চেতনালাভের বিষয় না

থাকলে চেতনার অর্থ কি? বিষয়শূন্য-বিষয় সঙ্গতিহীন শব্দ। বিষয় ছাড়া বিষয়ী হতে পারে না। গভীর নিদ্রায় যখন মনন, অনুভব এবং ইচ্ছা লুপ্ত তখন যদি আত্মন থাকেন, কিভাবে থাকেন তিনি? ইন্দ্র তাই প্রজাপতিকে এসে বললেন—পরমাত্মনের তখন কোন অস্তিত্বই থাকেনা। পরমাত্মন ধ্বংসপ্রাপ্ত হন—বিনাশমেবা পীতো ভবতি।' অর্থাৎ বহির্বিশ্বের দৃশ্য যদি মরে যায়, অন্তরের ঈশ্বরও তখন হয়ে যান অস্তিত্বহীন। কাল ও মাত্রাহীন হলে, বিষয়ের চেতনা থেকে মুক্ত হলে, ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

প্রজাপতি ইন্দ্রকে যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা হল এই যে পরমাত্মন চেতনাহীন নন, অবশ্য তাই বলে তিনি নিজেও বস্তুগ্রাহ্য চেতনা নন। কিন্তু ইন্দ্র তা বুঝতে চাননি। তাই তিনি প্রজাপতিকে বললেন—'সেই স্বপ্নহীন নিদ্রামগ্ন পরমাত্মন নিজের অস্তিত্বও অনুভব করতে পারেন না। অন্য কোন বিষয়ের অস্তিত্বও বুঝতে পারেন না। তিনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যান। সুতরাং এমন পরমাত্মনের কোন অর্থ আমার কাছে বোধগম্য নয়।'

প্রজাপতি ইন্দ্রকে তখন আত্মার যথার্থ স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বোঝালেন, অস্তিত্ব অনস্তিত্ব দুইই এক। এই পার্থক্যের মধ্যেই রয়েছে ঐক্য। 'পূণ' এই বিশ্বজগতের মধ্যে আত্মানুভব করছেন। ইন্দ্রকে তিনি তাই বললেন, 'হে মঘবণ! দেহ মৃত্যুশীল, দৃশ্যমান সবই মৃত্যুর অধীন। পরমাত্মাই অমৃত এবং বৈদহী। তিনিই দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণকারী, চোখ হল দেখার মাধ্যম মাত্র। যিনি ঘ্রাণ বোধ করেন তিনিই পরমাত্মন, নাসিকা হল ঘ্রাণের মাধ্যম মাত্র। ইত্যাদি।'

প্রজাপতি ইন্দ্রকে যেটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তা হল এই যে, পরমাত্মন শুধুমাত্র পূর্ণতার প্রতীক নয়, তা হল সক্রিয় সর্বাত্মক চেতনা, নিজের মধ্যে এবং নিজের জন্য বিদ্যমান। অনন্ত পরমাত্মন এমন কোন পরমাত্মন নয় যার অর্থ বোঝায় না-সসীম। এই পরমাত্মনই সীমিত অথচ সকল দৃশ্যমানের ভিত্তি। এই পরমাত্মন হল সর্বাত্মক, প্রকাশমান আবার প্রকাশোত্তর। আমাদের ক্ষুদ্র সত্তা এরই মধ্যে বিধৃত, আবার এই পরমাত্মনের জন্যই সীমাত্তোরীত। এই কেন্দ্রীয় আলোকের চতুর্দিকেই চেতনারও অস্তিত্ব থাকে না। এর বাইরে দ্বিতীয় আর কিছুর নিজস্ব অস্তিত্ব নেই। বৃহদারণ্যক ও কৌশীতকি উপনিষদের বর্ণনা মত—'শ্বাসকার্যে তিনিই শ্বাস, কথোপকোথনে বাক্য, দর্শনে চক্ষু, শ্রবণে কর্ণ, ধারণাতে মন। এ-সবই তাঁর ক্রিয়ার বিভিন্ন নাম।' বৃহদারণ্যকের কথাতে 'যখন তিনি দেখেন না, তখনো দেখেন, যদিও সত্যিই দেখেন না, কারণ তাঁর দেখাতে কোন ছেদ নেই, যেহেতু তিনি অক্ষয়। পৃথক করে দেখবার জন্য তাঁর পার্শ্বে দ্বিতীয় কেউ নেই, তাঁর থেকে পৃথক কেউ নেই।'

আপনার কি মনে হয়? পরমাত্মনের চরিত্র যদি এইভাবে সর্বাত্মক হয়, তাহলে আপনি কে? তাহলে আপনি কি বলে উঠতে বাধ্য হচ্ছেন না যে, আমি, আমিই সব? এই পরমাত্মন—আমি ছাড়া আর কেউ নয়। এক মাত্র সত্য আমি, আমি, আমি!

হ্যাঁ যা, উপনিষদের শিক্ষা সর্বব্যাপী এই আমিত্বকে জাগ্রত করবার জন্যই। বস্তুত উপনিষদকারেরা তাই বলে উঠেছিলেন—'অহম এব ইদম

সর্বোস্মি।'

উপনিষদের এই অনন্ত আত্মবোধ ঋগ্বেদের যুগেও এসেছিল। কিন্তু সেটা এসেছিল কবির অনুভূতির মধ্য দিয়ে। ঋষি বামদেব তাঁর এই সর্বাত্মক 'আমি'-অনুভূতি থেকেই বলে উঠেছিলেন—' আমিই মনু, আমিই সূর্য, আমিই বুদ্ধিদীপ্ত কক্ষীবত. . . আমিই কবি উষনস, আমাকে দেখ। আমি পার্থিব জগত আর্যদের দান করেছি। আমিই যজ্ঞে আহুতিদানকারীকে দিয়েছি বৃষ্টি, আমিই করি বজ্রনির্ঘোষে ধারাপাত। সকল দেবতা আমারই নির্দেশ পালন করেন।' মহিলা ঋষি বাক্‌ও ঋগ্বেদে এই একই সুরে স্তোত্র রচনা করে বলেছিলেন—'আমি সমগ্র জগতের অধিশ্বরী, সর্বসম্পদ প্রদায়িণী। আমিই সত্যদ্রষ্টা, পূজনীয়দের মধ্যে আমিই সর্বাগ্রা। দেবতারা আমাকে নানা লোকে স্থাপন করে দেখেন, কারণ আমার অধিষ্ঠান নানা লোকে। বিভিন্ন প্রাণের মধ্যে আমিই বাস করি।'

ঋগ্বেদের এই যে সর্বাত্মক আমিত্ববোধ, যা এসেছিল কবির অনুভূতির মধ্য দিয়ে, উপনিষদ তাকেই জ্ঞানের আলোতে প্রস্ফুটিত করতে চেষ্টা করেছে। কবিহৃদয়ের সেই অনুরণিত সত্যবোধের সঙ্গে যদি উপনিষদের জ্ঞানের আলো মিশিয়ে নিজের মধ্যে সর্বাত্মক 'আমি'কে অনুভব করা যায়, তাহলেই বোধ হয় সত্যের সম্যক রূপ অনুভূত হয়। প্রজাপতি ইন্দ্রকে এই সর্বাত্মক আত্মবোধের মধ্যেই নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এবং যে পদ্ধতিতে তিনি তাকে নিতে চেয়েছিলেন উপনিষদের শিক্ষার এটাই ধারা। তুচ্ছ থেকেই তুচ্ছাতীতে যেতে হয়। কিন্তু কেউ কাউকে নিয়ে যেতে পারে না। নিজেকেই যেতে হয় নিজের অনুভব এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা বিস্তার করে। বিশ্লেষণ ক্রমশঃ বিস্মিত করে এবং অনুভব তখন আপনাকে সর্বাত্মক করে তোলে। বরুণ ও ভৃগু উপাখ্যানেও একই ভাবে বরুণ অন্নকোষ থেকে আরম্ভ করে আনন্দময় কোষে ভৃগুকে সত্যের অনুভূতি দিতে পেরেছিলেন। ভৃগুকেও ইন্দ্রেরই মত নিজে নিজেই সমস্যা সমাধান করে সত্যে উপনীত হতে হয়েছিল। প্রজাপতি বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রকে যেমন পরমাত্মনের স্বরূপ বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন—

মাণ্ডুক্য উপনিষদে ও আছে পরমাত্মার তিন অবস্থার বর্ণনা, যেমন জাগ্রত, স্বপ্নময় ও স্বপ্নবিহীন নিদ্রামগ্ন। কিন্তু এই তিনটি স্তরই বিধৃত এক চতুর্থ অবস্থার মধ্যে যাকে বলা হয় তূরীয়।[১]

জাগ্রত অবস্থাতে আত্মন বহির্বিশ্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। নিদ্রামগ্ন অবস্থাতে বস্তুজগতের অভিজ্ঞতা দিয়ে এক সূক্ষ্ম জগত সৃষ্টি করে তাই অনুভব করেন। পরমাত্মন তখন দেহ-বন্ধন দ্বারা সীমিত নয়। গভীর নিদ্রাতে—যাকে বলা হয় সুসুপ্তি, তখন তিনি এক মহাবিশাল স্নিগ্ধতাতে মগ্ন। কিন্তু পরমাত্মনের যথার্থ চরিত্র এই স্বপ্নবিহীন গভীর নিদ্রাতেও নেই। সেজন্য চাই চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ তূরীয় অবস্থা। এই চতুর্থ অবস্থা হল এক অন্তস্থিত চেতনা—যেখান আন্তর অথবা বহির্বিষয়, কোন কিছুরই ধারণা নেই।

(১) তূরীয় এখানে পরমাত্মন হিসেবে কাজ করছে।

এই চতুর্থ অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইভাবে, যেমন, 'এই চতুর্থ অবস্থা আত্ম সম্পর্কেও সচেতন নয়, বহির্জগত সম্পর্কেও সচেতন নয়, কিংবা অন্তর এবং বাহির মিলে যে সমন্বিত বোধ, সে-সম্পর্কেও নয়। সাধারণ চেতনাবোধ বলতে যা বোঝায়, যেমন নেই সেই চেতনা বোধ, তেমনই নেই সার্বিক চেতনাবোধও। কিংবা নিঃসীম অন্ধকার বোধও তার নেই। এ এক অদৃশ্য, উত্তরণশীল, ইন্দ্রিয়াতীত, অননুমেয়, অচিন্তনীয়, অবর্ণনীয় পূর্ণ আত্মবোধ—যা নাকি চির শান্ত ও আনন্দময়।' এই চতুর্থ অবস্থাই হল পরমাত্মনের যথার্থ রূপ। ওঁ-কার এই চতুর্থ অবস্থারই প্রতীকী ধ্বনি—যেমন, অ—জাগরণ, উ—স্বপ্ন এবং ম—নিদ্রা। অ-উ-ম (ওঁ) এর সর্বশেষ যে নিদ্রার প্রতীকতা তা পরিণতিতে বিধৃত আত্মার চতুর্থ অবস্থার সঙ্গে যাকে বলা হয়েছে তূরীয়।)

উপনিষেদের এই যে তুরীয় অবস্থা তাকে কি সবাসরি উপভোগ করা যায়? দেবী ভাগবতের মতে 'চেতনাহীন অবস্থাকে সরাসরি কখনও উপভোগ করা যায় না, ধারণা করাও যায় না। সেরকম যদি কখনও হয়ও সেক্ষেত্রে ভোক্তা স্বয়ং এর পশ্চাতে থাকেন সেই চেতনারই শাশ্বত প্রবাহ হিসাবে।'

আত্মনের যে তিন অবস্থা তাকে বলা হয় বিশ্ব (জাগ্রত) তৈজস(স্বপ্ন) ও প্রজ্ঞা (স্বপ্নবিহীন গভীর নিদ্রা)। এ সবই বিধৃত সেই তূরীয়ের মধ্যে। কিন্তু বর্ণনা যেরকম দাঁড়াচ্ছে, তাতে এরকম বোধ হওয়াই কি স্বাভাবিক নয় যে, আত্মনের বিশ্ব, তৈজস ও প্রজ্ঞার অধ্যায় অনিত্যের অধ্যায়? কিন্তু তবু তারা অনস্তিত্ব নয় যেহেতু তারা এক আনন্দময় অস্তিত্ব দ্বারা বিধৃত। কিন্তু অস্তি থেকে নাস্তি কি সম্ভব? নাস্তি থেকেই নাস্তি সম্ভব। না থেকে হ্যাঁ হয় না, আবার হ্যাঁ থেকেও না হয় না। গৌড়পাদের কারিকাতে যে সম্পর্কে বলা হয়েছে-''যা আদতে 'না,' অন্তেও 'না', মধ্য অবস্থাতেও তা অবশ্যই 'না' হবে।'' ঠিক উল্টো রকমে বলতে গেলে এইটুকুই বলতে হয় যে মাণ্ডুক্য উপনিষদের তূরীয় যদি এক আনন্দময় অনাদি আদি আত্মন, তাহলে তার নিদ্রার স্বপ্ন ও স্বপ্নহীন নিদ্রার অবস্থাও অনস্তিত্ব নয়, সবই সত্য। সত্যের মধ্যে মিথ্যার কোন অস্তিত্ব নেই, মিথ্যার কোন ধারণা নেই। আমি এক মহান উপস্থিতি, আমি তূরীয়, আমি সত্য, সত্য, সত্য। উপনিষদে এই জন্য আত্মনের স্বরূপ বর্ণনার জন্য যে আদি মধ্য অন্তের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা সবই মিথ্যা। যে উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতমের কল্পনা করা হয়েছে তাও মিথ্যা। এক পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে কোন তারতম্য থাকতে পারে না। সুতরাং শুধু সত্য, সত্য, সত্য, সবই সত্য। পরমাত্মন সবই সেই একই পরমআত্মন। হয় সবই সত্য না হয় মিথ্যা। তাহলে মিথ্যাও এক অপরিবর্তনীয় অস্তি। তখন সত্যেরই মত বলা যেতে পারে মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। তাতেও আনন্দের অভাব নেই। মিথ্যাই বিশ্ব, মিথ্যাই তৈজস, মিথ্যাই প্রজ্ঞা, মিথ্যাই আনন্দ (তূরীয়)।

মৃত্যুর পর কী থাকে? কঠোপনিষদে নচিকেতার এই ধরনের প্রশ্ন দিয়েই সম্ভবত পরমাত্মস্বরূপের অনুসন্ধান আরম্ভ। উপনিষদ সেই পরমাত্মস্বরূপেব যাথার্থ বুঝতে পেরেছে তূরীয় অবস্থাতে। এই পরমাত্মানুসন্ধান বিষয়ীর প্রশ্নে, কিন্তু বিষয়ের উৎস সন্ধানেও উপনিষদ নিষ্ক্রিয় থাকে নি।

বিষয়ের উৎস সন্ধান করতে গিয়েই তার পরব্রহ্মাণের কল্পনা। এই যে দৃশ্যমান জগত—আত্মা যা অবলোকন করে, তারই বা মূল সত্য কি ? দৃশ্যমান জগৎ স্থির নয়, পরিবর্তনশীল। তাহলে কোন্ অপরিবর্তনীয় উৎসে এর স্থিতি ? উপনিষদকারদের এই প্রশ্ন থেকেই পরব্রহ্মণের উৎপত্তি—পরব্রহ্মণ অর্থাৎ অনাদি সত্য, যা থেকে এবং যার মধ্যে এই দৃশ্যমান জগত।

ব্রহ্মণ শব্দের মূল হয়তো আজ আর আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।[১] কিন্তু এ শব্দ উচ্চারিত হলেই আমাদের হৃদয়ে এক অপরিবর্তনীয়, অচিন্ত্য, অনাদি এবং অনিঃশেষ স্থিতির দুর্বোধ্য ভাব অনুরণিত হয়ে উঠে। তবুও নানা পণ্ডিতজন নানাভাবে এর উৎপত্তি ধরতে চেষ্টা করেছেন। কারো মতে 'বৃহ' অর্থাৎ স্ফীত হওয়া অর্থাৎ বৃদ্ধি পাওয়া অর্থ থেকেই ব্রহ্মণ। আবার কারো মতে ব্রহ্মণ হল ইচ্ছাশক্তি——যাকে প্রেরণ করা হতো দেবতাদের উদ্দেশ্যে, পরে পরিণত হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং সর্বশেষে পূর্ণতাবোধে। আবার আর একদলের মতে, বৈদিককালে যখন ছিল নানা দেবতার কল্পনা, এবং ছিল রহস্যময় প্রাকৃতিক শক্তির সুখ ও দুঃখ সৃষ্টির অসীম ক্ষমতা, সে যুগে যাঁরা জাদুমন্ত্রের দ্বারা ইচ্ছানুরূপ অবস্থা তৈরীর ভূমিকা নিতেন তাঁদের থেকেই এই ব্রহ্মণ শব্দের উৎপত্তি—যার অর্থ জাদু শক্তি। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের যুগে আহুতিতে যজ্ঞ-মন্ত্র হিসেবে ছিল এই ব্রহ্মণ। এবং এই আহুতি মন্ত্রকেই জাদুক্রিয়াতে কাজে লাগানো হত বলেই জাদুক্রিয়া ছিল ব্রহ্মণ রূপে পরিচিত। ধীরে ধীরে যেভাবেই হোক, সম্ভবত অর্থের রূপান্তর ঘটতে ঘটতে ব্রহ্মণ হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বের মূল শক্তির প্রতীক। কিন্তু বিরাট এক অংশ আজো 'বৃহ' এই মূল শব্দ থেকেই ব্রহ্মণ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। ব্রহ্মণ হল প্রার্থনা মন্ত্র, যা নাকি আত্মাকে করে উন্নীত, স্ফীত, এবং সেই উন্নীত আত্মা যে-সত্য অনুভব করে, তাই পরব্রহ্মস্বরূপ। কিন্তু ব্রহ্মণ শব্দের উৎপত্তি যেখানেই হোক, যেভাবেই হোক, পরব্রহ্মণ আজ প্রকৃত সত্যস্বরূপ। বিশ্বজগতের রহস্য ভেদের জন্যই পরব্রহ্মাণে'র কল্পনা।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে এই পরব্রহ্মাণের স্বরূপ প্রকাশের জন্য এক চমৎকার গল্পের অবতারণা। পুত্র পরব্রহ্মজ্ঞানী পিতার কাছে জানতে চাইলেন সত্যের স্বরূপ। জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমস্ত বিষয়ের উৎপত্তি কোথা থেকে এবং পরিণতিতে কোথাই বা তারা যায় ? আমাকে বলুন।' পিতা তাঁকে এক সমস্যা দিয়ে বললেন, এই সমস্যার সমাধান করলেই জানতে পারবে সেই সত্যকে, ব্রহ্মণকে। বললেন, যা থেকে এই সবের উৎপত্তি, জন্মের পর যাতে সব বাস করে, এবং মৃত্যুর পর যাতে সব প্রবেশ করে, সেই পরব্রহ্মণই হলেন এই সত্য। তুমি নিজে এই পরব্রহ্মাণের স্বরূপ অনুধাবন করার চেষ্টা কর—আত্মানং বিদ্ধি।

পুত্র ভাবতে লাগলেন, কিন্তু সর্বপ্রথম তিনি নিজের মনে এ সম্পর্কে যে জবাব পেলেন তা হল এই যে, বস্তুই হল সেই সত্য, বস্তু থেকেই উৎপত্তি, বস্তুতেই স্থিতি এবং বস্তুতেই লয়। প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর রূপান্তর

(১) বর্তমানে ব্রহ্মন শব্দের উৎপত্তি 'বৃ'-ধাতু থেকে ধরা হয় যার অর্থ To grow সেই অর্থে ব্রহ্মন সর্বব্যাপ্ত নয়। বৃহ (স্ফীতমান) + মন (চিৎ) = ব্রহ্মন। এই জন্য পরব্রহ্মন শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে।

ঘটে মাত্র আর কিছু নয়।

কিন্তু সামান্য একটু চিন্তা করবার পরই তাঁর মনে হল—এ-সিদ্ধান্ত মিথ্যা। কারণ, শুধুমাত্র বস্তুই নয়, প্রাণও আছে। বস্তু থেকে প্রাণের উৎপত্তি হতে পারে না। প্রাণের উৎপত্তির জন্য চাই ভিন্ন কারণ। তখন তার মনে হল, বস্তু নয়, মূল সত্য হল প্রাণ। প্রাণ থেকেই উৎপত্তি, প্রাণেই স্থিতি প্রাণেই লয়। প্রাণ বস্তু ছাড়া নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু প্রাণের মধ্যে আছে এমন এক সঞ্জীবনী শক্তি যা দবারা সে বাস্তুকে স্পন্দিত করতে পারে। সঞ্জীবনী শক্তিই অন্ন থেকে মানুষের মধ্যে শোণিত, অস্থি, স্নায়ু এই সব সৃষ্টি করে। এই সঞ্জীবনী শক্তি মহাজগতে পরিব্যাপ্ত, এবং এই শক্তিই সৃষ্টির সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করেছে। প্রাণ বস্তু থেকে ভিন্ন, যদিও দেহের সারই হল প্রাণ।[1]

কিন্তু প্রাণ সম্পর্কিত এই সিদ্ধান্ত স্থায়ী হল না। কারণ আর একটু চিন্তা করতেই পুত্র দেখতে পেলেন যে, প্রাণের মধ্যে আছে একটা মন। শুধুমাত্র প্রাণশক্তির দ্বারা এর ব্যাখ্যা করা যায় না। এই মন বা মনস প্রাণ ও বস্তু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাণ প্রবাহের শিরোভূষণ হিসাবে রয়েছে মন। এই মন না থাকলে প্রাণ বা বস্তু সম্পর্কিত ধারণাও সম্ভব হত না। সুতরাং যে মন সমস্ত কিছুকে বুঝতে পারে, তার চাইতে বড় নিশ্চয়ই প্রাণ বা বস্তু নয়। সুতরাং পুত্র সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মনই হল সেই সর্বোত্তম শক্তি, যা থেকে উৎপত্তি, যাতে স্থিতি এবং যাতে লয়।

কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে এই সিদ্ধান্তও ভুল বলে মনে হল পুত্রের কাছে। পুত্র দেখলেন, মনের বাইরেও আছে আর এক অবস্থা। মানসিক ক্রিয়ারও ব্যাখ্যা যে করে, তার নাম বুদ্ধি। মনের উর্ধেও এই বুদ্ধির স্থান। এই বুদ্ধিকে সংস্কৃতে বলা হয় বিজ্ঞান। সুতরাং পুত্র সিদ্ধান্তে এলেন যে, মন নয়, বিজ্ঞানই প্রকৃত সত্য, বিজ্ঞানই পরব্রহ্মণ।

কিন্তু বিজ্ঞানই যদি পরব্রহ্মণ হয়, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিই যদি সর্বোত্তম সত্য হয়, তাহলে বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য থাকবে কেন? অপরিপূর্ণতা থাকবে কেন? পুত্র আবার চিন্তা করতে লাগলেন।

উপনিষদ বুদ্ধিবৃত্তিকেও সর্বোচ্চ মর্যাদা দিতে রাজী নয়। কারণ বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেও আছে দ্বৈত ও বহিরাশ্রয়ী চরিত্র। বিজ্ঞান বা জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আছে জ্ঞাতা-জ্ঞাতব্যের সম্পর্ক। যেখানে এই দ্বৈতভাব নেই, যেখানে অস্তিত্বের রূপ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা জ্ঞাতব্য হিসাবে বিচার হয় না, সেই অবস্থা বুদ্ধিবৃত্তির চাইতেও শক্তিশালী। সেই নিঃশর্ত অস্তিত্ব, যাকে বলা যায় সত্য, তা এই চিন্তাকেও বিধৃত করে থাকে। পুত্র বৃদ্ধিবৃত্তিরও আধার হিসাবে সেই মহান সত্য সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে পেয়ে গেলেন তূরীয়ের পরব্রহ্মণ খবর! এই তূরীয় অবস্থা (যার কথা একটু আগেই বলেছি) সেই অবস্থা—যা চিন্তা ও চিন্তনীয়ের পার্থক্যকে উত্তীর্ণ হয়ে এমন এক নিত্যসত্যে চলে যায়, যেখানে ব্যক্তি ও সত্যের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সেই অবস্থার নামই

(১) বর্তমান কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞান এমনতর ধারণাই সত্য বলে জেনেছে। সেই জন্য জগতের অর্থ - যা গতিশীল।

তুরীয় অবস্থা। অবর্ণনীয় এক স্নিগ্ধ আনন্দময়। সেই জন্যই পুত্র শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, পরব্রহ্মণ হল আনন্দ স্বরূপ—যেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য এবং জ্ঞান এক হয়ে মিশে থাকে। এই আনন্দ হল স্বয়ংক্রিয় নিঃশর্ত পুলক অনুভব—অনস্তিত্ব নয়, কিন্তু অবাঙ্‌মানসগোচরম্।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতে পারেন যে, পরব্রহ্মণ যদি অবাঙ্‌মানস গোচরম তাহলে এত বর্ণনা কেন? বর্ণনাতীতকে বর্ণনা দিলে তাঁর আর মর্যাদা থাকে কোথায়? সত্যিই থাকে না। তবুও দেখুন কেউ কেউ বর্ণনা দেবার চেষ্টা করেছেন। যেমন রামানুজ বলেছেন, এ হল প্রামাণিক সত্য। চিন্তার আলোতে শঙ্করাচার্য বলেছেন—পরব্রহ্মণ হল নিরুপাধিক—নির্গুণ। আসল কথা বলে গেছেন রামকৃষ্ণ পরমহংস—নুনের পুতুল সাগরে গেলে ফিরে এসে আর বলতে পাবে না সাগর কি, গলে যায়। উপনিষদেও এ জন্য গল্প আছে—দুই পুত্রকে ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভের জন্য পাঠালেন পিতা, শিক্ষান্তে ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলেন—কে কি শিখেছ বল। ছোট তড়বড় করে শাস্ত্র আউড়ে গেল। বড়কে জিজ্ঞেস করতে সে হেটমুণ্ড হয়ে বসে রইল। পিতা বললেন, 'পরব্রহ্মণের স্বরূপ তুমিই বুঝেছ।' পরব্রহ্মণকে বর্ণনা করা যায় না, পরব্রহ্মণ হতে হয়। যিনি পরব্রহ্মণের স্বাদ অনুভব করেন তিনি হয়তো শুধুমাত্র এই বলে চিৎকার করতে পারেন আমি, আমি, আমি। কিন্তু তার সেই শব্দ উচ্চারিত হয়ে কেউ যদি শোনে তাহলে আর কিছু হল না।

পরব্রহ্মণ ব্যাখ্যাতীত। কিন্তু তবু তাকে ব্যাখ্যা দেবার জন্য এই চেষ্টা কেন? বলা যেতে পারে—যেমন, সমুদ্র দর্শন করতে হলে একটা গাড়ি আপনাকে পুরী নিয়ে যায়, তেমনই এই তর্ক, যুক্তিজালবিস্তার হল সেই গাড়ি, সমুদ্রের কাছে নিয়ে আপনাকে ছেড়ে দেবার জন্য।

প্রশ্নের অন্ত নেই। বলতে পারেন, সমুদ্র দর্শনের এই প্রয়াস কেন? সবই যদি পরব্রহ্মণ, তবে কেই-বা এই প্রয়াস করেন, কার জন্য করেন? প্রশ্নটা স্বাভাবিক। এ-কথা নিশ্চয়ই আলোচনা করতে হবে সত্যের স্বরূপ বুঝতে হলে। সে-কথায় আসছি পরমাত্মন ও পরব্রহ্মণের সম্পর্ক আলোচনাতে, সৃষ্টি রহস্য আলোচনাতে।

এই বাক্‌জাল বিস্তারের কারণ হল এই যে, আমরা কেউ ব্রহ্মণ নই, অন্তত যতক্ষণ আমাদের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করতে না পারছি, যতক্ষণ বিচিত্রকে বিচিত্র করেই দেখছি। স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন আমরা বুদ্ধিগ্রাহ্য না হলে কিছুই বুঝতে চাই না। তাই এই আলোচনা। এবং আমরা বিশেষ করে এই বিংশ শতাব্দীর মানুষেরা, বিজ্ঞান নামক কোন শাস্ত্রের কাছে এ বিষয়ে যদি কোন ইঙ্গিত পাই তাহলে তাকে অভ্রান্ত বলে ভাবি। সুতরাং এ প্রসঙ্গে আমার আলোচনা শেষ করার আগে আমাদের বস্তুবিজ্ঞান সম্পর্কে দুটো কথা বলে নিই, হয়তো বা তাতে মনে হতে পারে যে এতক্ষণ যা আলোচনা হল বর্তমান বস্তুবিজ্ঞানও তাকে প্রায় স্বীকার করছে। যেমন, গভীর স্বপ্নবিহীন নিদ্রা দিয়ে যখন আত্মনের স্বরূপ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন উপনিষদকারেরা তখন নাকি আত্মন একটা অনন্ত প্রসারিত অস্তিত্ব। মন এবং বুদ্ধি দুইই এর মধ্যে বিধৃত। বর্তমান পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানী হয়তো মন এবং বুদ্ধির অগোচরে এই অবস্থার সন্ধান পাননি। তবে মনের স্তর বিশ্লেষণে তিনি

এমন এক সার্বিক মানসিকতার প্রসার দেখতে পেয়েছেন প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে যা তাকে ব্যক্তির যাথার্থ নিরূপণে নতুন আলো দান করেছে। এবং পৃথিবীতে কম বেশী সকলেই প্রায় সেই যাথার্থে আজ বিশ্বাস করে। এই মনোবিজ্ঞানীর নাম ফ্রয়েড। ফ্রয়েড বলেছেন 'মানসিক কার্যপদ্ধতি মূলত অচেতন; যেগুলোকে সচেতন বলে মনে করি তা হল সমগ্র মানসিকতার পটভূমিতে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ঘটনা, অংশ। . . . 'Mental processes are essentially unconscious and that those which are concious are merely isolated acts and parts of the whole psychic entity [the whole mental life of the individual'] ডঃ গ্রোডেক নামে এক চিকিৎসক এই সামগ্রিক মানসের সন্ধান পেয়ে বিহ্বল হয়ে উঠেছিলেন। এর নামকরণ করতে না পেরে একে বলেছিলেন The It[১] এবং বলেছিলেন মানুষের দুঃখ, বেদনা, রোগ, আরোগ্য সবই তার নিজের অন্তরস্থিত এই The It-এর ইচ্ছা মাত্র।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের আর একটা কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে, যা সম্ভবত পরব্রহ্মণ কল্পনাতে আমাদের সাহায্য করবে। আপেক্ষিক তত্ত্বের উদগাতা আইনষ্টাইন বলেছেন—'কোন পদার্থের পরমাণুস্থিত বস্তুগুণ কখনও স্থির নয়। গতির তারতম্যের উপর তার অস্তিত্বের চরিত্র নির্ভর করে। গতি যত বাড়ে অস্তিত্বও বৃদ্ধি পায় '. . .the mass of an object is not constant; instead the mass gradually increases as the object moves faster and faster.' কিন্তু এই পরমানুস্থিত বস্তুগুণ যদি স্থির হয়ে যায়? তাহলে আইনস্টাইনের মতে সেই বস্তুগুণে বস্তুর কোন অস্তিত্বই থাকে না—' If these particles were brought to rest, they would have no mass at all.' এই বস্তুগুণ সমন্বিত পরমাণুগুলি কখনও স্থির নয়। কিন্তু কোথাও যে স্থির নয় এ-কথা কি বলা যায়? পরমাণু যে বস্তুগুণহীন হবে না তাই বা কে বলবে—কারণ বিজ্ঞানীরাও তো এমন পরমাণুর অস্তিত্ব কল্পনা করছেন! তাঁদের কথাতেই আছে—বস্তুগুণহীন পরমাণুর ধ্বংস হয় না। তাদের স্পন্দন অনন্ত, কারণ তাদের চাইতে ক্ষুদ্র আর কেউ নেই—'. . . massless particles do not decay. Their infinte lifetimes are due to the fact that there are no lighter particles into which they can decay.' এই বস্তুগুণহীন পরমাণু হল উপনিষদের সূক্ষ্মতম অস্তি। এবং বিজ্ঞান যদি আর একটু বিশ্লেষণ করে, তাহলে দেখতে পাবে যে, এই সূক্ষ্মতম অস্তিত্বেই আছে সর্বাপেক্ষা বেশী গতি এবং গতিহীনতা। এবং এই বস্তুহীন সূক্ষ্মতমই ব্যাখ্যাতীত গতির তারতম্যে বস্তুজগত ও অবস্তুজগত হিসাবে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। এবং এই সূক্ষ্মতমই বিশালতম ব্যাপ্তি।

পরমাত্মন এবং পর ব্রহ্মণ দুই-ই এক। এক হল বিষয়ীর সত্যতা, আর এক হল বিষয়ের দিক থেকে সত্যতা। দুইয়েরই চূড়ান্ত উৎস এক—সেই পরব্রহ্মণ বা পরমাত্মন। তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলেছে—পরব্রহ্মন পরমাত্মন। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও মুণ্ডক উপনিষদ বলেছে—'মানুষের মধ্যে

(১) It শব্দ তিনি ব্যবহার করেছিলেন এই বোঝাবার জন্য যে 'It'-এর কোন Conmotation নেই - অর্থাৎ অর্থপ্রকরণ।

যিনি পরব্রহ্মণ' এবং সূর্যের মধ্যে যিনি মূল সত্য, দুইই এক।' ঋগ্বেদে যাকে লোকোত্তর হিসেবে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে, উপনিষদে তাই হয়েছে স্বপ্রকাশ। সীমিত প্রকাশের মধ্যেই রয়েছে সেই অসীম অস্তি। অনন্ত বিশ্বে উত্তরণের মধ্যে যার সন্ধান করেছেন কবি ঋষিরা, নিজের গভীর হৃদয়ের মধ্যেই তাঁর সন্ধান করেছেন উপনিষদকারেরা। অন্তরের অন্তস্থলেই তাঁরা পেয়েছেন অনন্তব্যাপ্ত বিশালকে।[১] তাই তাঁরা শিক্ষার্থীকে বলেছেন—তৎ ত্বম অসি—তুমিই সেই। বাইরে সেই সত্যকে খুঁজে বিভ্রান্ত হবার প্রয়োজন নেই। নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখ, দেখবে তুমিই সেই। দেখবে, বিষয়ের আনন্দস্বরূপ হল তোমারই আত্মস্বরূপ। দুইই তূরীয় অবস্থাতে এক। উৎসের সন্ধান মিললে বিষয় আর বিষয়ীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। দ্রষ্টা, দৃষ্টি এবং দ্রষ্টব্য এক হয়ে আছে তূরীয়তে। আত্মসচেতন ব্যক্তি যেমন পরমাত্মন, আত্মসচেতন বিষয়ও তেমনি পরব্রহ্মণ। বিষয় ছাড়া বিষয়ীর আত্মসচেতনতা যেমন অধরা কল্পনা, তেমনই প্রতিফলনের মানস না থাকলে বস্তুজগতের ব্রহ্মণও আলোহীন ছায়ার মত। ধর্মীয় চেতনার সর্বোচ্চ বিষয় হল এই পরব্রহ্মণ ও পরমাত্মন।

পরব্রহ্মণের সঙ্গে পরমাত্মনের পার্থক্য থাকে তখনই যখন মানুষ নিজের আত্মস্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা করতে পারে না। মানুষের আত্মন অনুভবকে যখন প্রাণ ও মনের সঙ্গে এক করে দেখানো হয় তখন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হিসেবে বস্তুজগতে ব্রহ্মণের স্বরূপ প্রকাশিত হয় হিরণ্যগর্ভ রূপে। বিষয়ীর আত্মন এবং বিষয়ের ব্রহ্মণের মধ্যে তখনও একাত্মতা সম্ভব নয়। আত্মনের কল্পনা যখন প্রাণ-মনকে কেন্দ্র করে, তখন তা যেমন আমাদের প্রচলিত ধারণা মত তৈজস হিসেবে দেখা দেয়—তেমনি মহাজাগতিক মানস হিসেবে কল্পনা করলে ব্রহ্মণ হয়ে থাকেন হিরণ্যগর্ভ। অর্থাৎ বিষয়ীর তৈজসের মত হল এই বস্তুজগতের হিরণ্যগর্ভ।

শুধু মানুষের নয়, এই বিশ্বজগতেরও আছে মন ও ইচ্ছা। এটাই প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের ধারণা। দেহের যেমন আছে মন, তেমনই জগতেরও আছে মানসিক ক্রিয়া। আধার যত বড়, মানসও তত বড়। মহাজাগতিক মানস হল এই হিরণ্যগর্ভ। ঋগ্বেদের এই হিরণ্যগর্ভ হয়েছে উপনিষদে 'কার্যব্রহ্মা' অর্থাৎ অন্য কোন মহামানসসৃষ্ট মানস। সেই স্রষ্টা মহামানস হল 'কারণ ব্রহ্মা' অর্থাৎ সৃষ্টির যিনি কারণ। এই 'কারণ-ব্রহ্মাই' ঈশ্বররূপে বর্ণিত। কার্যব্রহ্মা হল সৃষ্ট অস্তিত্বের সার্বিকতা, অর্থাৎ সৃষ্ট বিষয়ের সবই রয়েছে তাঁর মধ্যে। সকল সীমিত বিষয় হল 'তাঁরই অংশ মাত্র। সৃষ্ট অস্তিত্বের সামগ্রিক মানসই হল ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ। এই হিরণ্যগর্ভ যে পরব্রহ্মণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তা নয়। পরব্রহ্মণ হল অ-জটিল আত্মসমাহিত এক, দ্বিতীয় বিহীন। তিনিই কখনও 'কারণ ব্রহ্মা' বা ঈশ্বররূপে স্রষ্টা, আবার কার্যব্রহ্মা হিসাবে অর্থাৎ সৃষ্ট মানস হিসাবে হিরণ্যগর্ভ। আর এই যে ব্রহ্মা, কার্যরূপেই হোক কিংবা কারণরূপেই হোক—পরব্রহ্মণ থেকেই তাঁর

(১) মানুষ যদি তার কুল (শক্তি)-কে বর্দ্ধিত করতে পারে অর্থাৎ-গতিময়-তাহলে নতুন মাত্রা লাভ করে নিজের অন্তরের মধ্যেই বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করে।

উৎপত্তি। পরব্রহ্মণ হল একমাত্র উৎস, সত্য। সমগ্র মহাজগত এই পরমমানসেই বিধৃত। যখন সীমিত সত্তা বুদ্বুদের মত মিশে যায়, বিশ্বজগতের মানস হিসাবে তিনি তখনও বিশ্বচিন্তায় বর্তমান। আমাদের আত্মনকে যখন আমরা দেহ হিসাবে কল্পনা করি, ব্রহ্মণ তখন প্রতিভাত হন মহাবস্তুজগত হিসাবে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'বিরাট'। বিরাট হল বস্তুজগতেব সর্বধারক। বিরাটের প্রকাশ হিরণ্যগর্ভের পরে। হিরণ্যগর্ভই বিরাটরূপে বস্তু আকারে প্রকাশিত।

ব্যাপারটাকে বুঝতে গেলে আরও একটু স্পষ্ট হতে হবে আমাদের। পূর্বেই বলেছি—বিষয়ীর সত্য হল পরমাত্মন এবং বিষয়ের সত্য হল পরব্রহ্মণ কিন্তু বিষয়ীর পরমাত্মন অনুভব করতে যেমন জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্বপ্নহীন নিদ্রার স্তর অতিক্রম করে যেতে হয় তূরীয়তে তেমনি বস্তুজগতকেও পরব্রহ্মণত্ব লাভ করতে হয় অনুরূপ কতকগুলি পর্যায় অতিক্রম করে। মানুষ যখন আত্মন সন্ধানে জাগ্রত দেহসত্তা বোধে, বস্তুজগত তখন বিরাটে; মানুষ যখন স্বপ্নের মানসক্রিয়াতে, বস্তুজগত তখন হিরণ্যগর্ভে; মানুষ যখন স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায়, অর্থাৎ মহামানসে, বস্তুজগত তখন ঈশ্বরে; মানুষ যখন তূরীযতে, বস্তুজগত তখন পরব্রহ্মণে। অর্থাৎ মানুষের মানসিক স্তর ভেদে বস্তুজগতের স্বরূপ তার কাছে অনুরূপভাবে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি বস্তুজ্ঞান হারিয়ে বস্তুর মধ্যে পরব্রহ্মণের সন্ধান পান, অর্থাৎ আত্মনের মধ্যে আর পরব্রহ্মণের মধ্যে কোন তফাৎ নেই বলে মানুষ ও প্রকৃতিতে তখন কোন প্রভেদ থাকে না। পরমাত্মন ও পরব্রহ্মণের মধ্যে এই হল সম্পর্ক। মূলত বস্তু ও ব্যক্তি এক, কিন্তু মানসিক তারতম্যে প্রকার ভেদ। একটা চার্টের মাধ্যমে বোধহয় পরমাত্মন ও পরব্রহ্মণের মধ্যে যথার্থ সম্পর্কটা এইভাবে স্পষ্ট করে বোঝানো যায়। যেমন—

ব্যক্তি (যার মূল সত্য পরমাত্মন)	বস্তু (যার মূল সত্য পরব্রহ্মণ)
১ ব্যক্তি যখন (দেহ ও প্রাণ নিয়ে) জাগ্রত	১ বস্তু তখন বিরাট
২ ব্যক্তি যখন (মনের স্তরে) নিদ্রায় স্বপ্নমগ্ন	২ বস্তু তখন হিরণ্যগর্ভ
৩ ব্যক্তি যখন (মহামানসে) স্বপ্নহীন নিদ্রায়।	৩ বস্তু তখন ঈশ্বর
৪ ব্যক্তি যখন (অবাঙ্‌মানসগোচরম্‌) তূরীয়ে	৪ বস্তু তখন (অবাঙ্‌মানসগোচরম্‌) পরব্রহ্মণে।

পরব্রহ্মণ হল উপনিষদে সত্যের প্রতীক। কিন্তু এ পরব্রহ্মণ অধরা একটা প্রতীক মাত্র নয়, নিস্তব্ধ মহাশূন্যতা নয়, এ হল পূর্ণতা। পরবর্তীকালে এই পূর্ণতাকে বোঝাবার জন্যই অউম—(ওঁ) নাদ প্রতীক হিসেবে এসেছে ভারতীয় হিন্দুদের কাছে। অ—হল স্রষ্টা ব্রহ্মা, উ—পালনকর্তা বিষ্ণু, এবং ম—লয়কারী শিব। এই তিন গুণ একত্রে যাঁরা মধ্যে স্থিত, তিনিই পরব্রহ্মণ।

ঈশা উপনিষদ সপ্রকাশ এবং অপ্রকাশ উভয়কে নিয়েই পরব্রহ্মের পূজার কথা বলেছে—উভয়ম সহ। এই পরব্রহ্মণের মধ্যেই রয়েছে পার্থক্য। কিন্তু পার্থক্য সত্যিকারের পার্থক্য নয়, পার্থক্যের মধ্যেই আছে ঐক্য। পরব্রহ্মণ অসীম, এর অর্থ এই নয় যে, সসীমকে তা বাদ দিয়ে। অসীম থেকেই সসীম এবং দুইই যথার্থ দৃষ্টিতে এক। পরব্রহ্মণ শাশ্বত, কিন্তু এই অর্থে নয় যে, এতে সাময়িক কিছু আছে বা এটা সকল সময়ের উর্ধে। পরব্রহ্মণের মধ্যে কাল ও মাত্রা বলে কিছু নেই। এক ব্যাখ্যাতীত ইচ্ছার তরঙ্গ নিজেরই মধ্যে তীব্রতার তারতম্যে (যদিও ব্রহ্মণের তারতম্য হতে পারে না) সৃষ্টি করে বস্তু। পরব্রহ্মণ যখন নির্গুণ হিসেবে তখনও সে শূন্যতা নয়। তাঁর সহজাত চরিত্রই হল নির্গুণ-গুণ, গতি-স্থিতি, এই সব। মৃত্যুর মত নাস্তি নেই সেখানে, জন্মের প্রাণস্পন্দনও নেই শুধু। জন্ম এবং মৃত্যু সেখানে এক। স্বয়ম্ভু পরব্রহ্মণের স্বরূপ বোঝা গেলে সব কিছুকেই পূর্ণ মনে হয়। তখন শুধু সীমিত শব্দগুলার মধ্যেও একটি শব্দই মনে আসে—পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ। এই পূর্ণ হল—সৎ (অস্তিত্ব), চিৎ (চেতনা) এবং আনন্দ-এর আধার তূরীয় বা তূরীয়াতীত। যে-কোন শব্দের মধ্য থেকে ধারণাযোগ্য অর্থকে নিষ্কাসিত করা গেলে এবং শব্দকে ধ্বনি ও অক্ষরহীন করা গেলে, একমাত্র তাই দিয়েই বোধহয় শুধু ব্রহ্মণ-স্বরূপ বলা যায়। না হলে অন্য যে-কোন অর্থবোধক শব্দই নেতিবাচক, পূর্ণতাবাচক নয়; এই কারণে যে, ধারণা যুক্ত হলেই তা এ-ধারণা নয়, ও-ধারণা নয়, এইভাবে নিজের এক বিশেষ অপূর্ণ ধারণা হিসেবে দেখা দেয়। সমস্ত শব্দ থেকে যদি অর্থ, ধ্বনি ও অক্ষর সরে যায়, তাহলে বোধহয় সেই বোধাতীত শব্দ পরব্রহ্মণস্বরূপ হয়ে ফুটে উঠতে পারে শুধু তার অচিন্তনীয়তাতে। সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে যে শব্দের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম, তা বোধহয় এই ধরনের শব্দ যাকে বলে পরাশব্দ। পরব্রহ্মণের যেমন শব্দে অক্ষর নেই, ধ্বনি নেই, অর্থ নেই, তেমনই বাক্যেও ক্রিয়া নেই। ধ্বনি, অর্থ ও অক্ষরসহ বাক্য ও ক্রিয়াপদ বাক্যে পরব্রহ্মণের স্বরূপ কোনদিন পাওয়া যাবে না। অর্থহীন শব্দ যদি ধ্বনিহীন হয় এবং তা যদি অক্রিয়াপদ বাক্যে থাকে এবং সেই সব শব্দ, ধ্বনি ও বাক্যের জন্য যদি কোন অক্ষর না থাকে, তাহলেই শুধুমাত্র সেই ধরনের ভাষাতে পরব্রহ্মণ এর ব্যাখ্যা চলে। নতুবা এটা নয়, ওটা নয়, পরব্রহ্মণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুধু নেতি নেতি করা ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু অনন্ত বিশ্বে আদি শব্দের যাই চরিত্র থাক না কেন, শব্দ আজ বিশেষ একটা অর্থের প্রতীক মাত্র। তার মধ্যে ধ্বনি আছে এবং অক্ষর হয়ে তার আত্মপ্রকাশ। যদি শুধুমাত্র ধ্বনি নিয়ে রেখাঙ্কিত অক্ষরই থাকতো পরস্পর যুক্ত হয়ে, অর্থময় শব্দ সৃষ্টি না করত, তাহলেও বোধহয় সেই ধ্বনিময় অক্ষর সত্যবোধে সহায়ক হত। এবং বস্তুত এই ধ্বনিসর্বস্ব আক্ষরিক চরিত্রের সীমিত মাত্রা উচ্চারণ করে বুদ্ধিবৃত্তিহীন পশুজগত যখন অনুসরণ সৃষ্টি করে, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন বিচার বিশ্লেষণপরায়ন মানুষের ভাষা অপেক্ষা অনেক বেশী সেই সত্যের কাছাকাছি তারা যেতে পারে কিনা তাই বা কে বলবে। কারণ, উপনিষদ বিচার বিশ্লেষণকে তার্কিকের লেবরেটরিতে ব্যবচ্ছেদ করতে করতে প্রাণহীন গিনিপিগের মত আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এই

সত্য আবিস্কার করেছে যে, তার্কিক ও তীক্ষ্ণধী ব্যক্তির বিচার বিশ্লেষণের চাইতে শিশুর সরলতা সত্যের নিকটে যাবার পক্ষে অনেক বেশী সহায়ক। বুদ্ধিবৃত্তি গলদঘর্ম হয়ে শেষপর্যন্ত যেখান থেকে অবসন্ন ক্লান্ত খেলোয়াড়ের মত ফিরে আসে, শিশুর সরলতা সেখানে অক্লান্ত খেলার আনন্দে করতালি দিতে থাকে।

বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে যে একটা মৌলিক ঐক্য সেটা প্রমাণ করাই ছিল বুদ্ধিবৃত্তির লক্ষ্য। কিন্তু সেই লক্ষ্যে সে পৌঁছুতে পেরেছে কি? না, পারেনি। কারণ বুদ্ধির মধ্যেই রয়েছে সহজাত সীমাবদ্ধতা যা দিয়ে অসীমকে জানা সম্ভব নয়। বুদ্ধিবৃত্তির দৌড় একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত মাত্র, যেমন কিছু প্রতীক, সত্যের ভাসাভাসা কিছু ছায়া এইসব ব্যবহার পর্যন্ত। এর বাইরে সেই আবাঙ মানসগোচরম সত্যে যাবার তার ক্ষমতা নেই। অর্থময় শব্দ ও বাক্য. এবং অর্থান্বেষী মন তার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে সেখানে যেতে পারে না। তাইতো তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—'সেখান থেকে মনোক্রিয়াসম্পন্ন সকল বাক্য ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।' কেন, মনড়ুক এবং কঠোপনিষদ বলেছে—'দৃষ্টি সেখানে যেতে পারে না, মন পারে না। আমরা জানি না। আমরা বুঝতে পারি না, কি করে এবিষয়ে কেউ শিক্ষা দিতে পারে।'

মানুষের বুদ্ধি বা বিচার বিশ্লেষণী ক্ষমতা বিষয়রূপে কিছু না পেলে তাকে সম্যক বুঝে উঠতে পারে না, তার বর্ণনা দিতে পারে না। কিন্তু সত্য তো বিষয় নয়। সত্য হল বিষয় ও বিষয়ীর সমন্বিত রূপ। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তির কাছে কিছু তার ধরা পড়লেও কিছুটা থেকে যায় অধরা। সেই জন্য বুদ্ধিবৃত্তির কাছে সত্যের ছায়া ধরা পড়ে মাত্র— প্রতীকের মাধ্যমে, তার বাইরে নয়। কারণ যিনি বিষয় হয়ে বাইরে ধরা দেন, তিনিই অন্তরতম হয়ে সকল দর্শন করেন। তাঁর দর্শনীয়টুকু দৃষ্ট হয় কিন্তু দার্শনিককে কে দেখবে? সেই জন্যই বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—'যাঁর দ্বারা সব জানা যায় তাঁকে জানবে কি করে? হে বৎস, জ্ঞাতব্য জানা কি করে সম্ভব?' যিনি নিজে বিষয়ী, জ্ঞাতা, তাকে জ্ঞাতব্য করা অসম্ভব। বহদারণ্যক উপনিষদে তাই বলা হয়েছে—'তিনি নিজে অদৃশ্য কিন্তু সব দেখেন; অশ্রুত, কিন্তু সব শ্রবণ করেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু সবই অনুভব করেন। তিনি অজ্ঞাত কিন্তু সবই জানতে পারেন।' এই যে পরমাত্মন, তাকে বিষয় হিসেবে দেখা যায় না বলে তিনি যে অনস্তিত্ব, তা নয়। বৃহদারণ্যকেই বলা হয়েছে যে, যদিও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা তাঁকে ধারণা করা যায় না তথাপি এই বুদ্ধিবৃত্তি তাঁকে আশ্রয় করেই আছে। 'কেন' উপনিষদে বলা হয়েছে—'যাঁকে মন দ্বারা চিন্তা করা যায় না, অথচ যাঁর দ্বারা মন চিন্তা করে, জানবে একমাত্র তিনিই পরব্রহ্মণ।'

এই যে পরব্রহ্মণ তাকে এবার যতভাবেই ব্যাখ্যা করা যাক না কেন, নিঃশেষে কেউ ব্যাখ্যা করতে পারবে না—কারণ, মানুষের অর্থবহ বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষাতে এবং বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা চলে না। তা সত্ত্বেও যদি তাঁকে ব্যাখ্যা

---

(১) অর্থাৎ সময় অনন্ত নয়, তা সীমিত। সময়ের চেতনা আপেক্ষিক। কোয়ান্টাম ফিজিক্স-এবং আইনস্টাইন একথা প্রমাণ করেছেন।

করবার চেষ্টা করা হয় তবে সেটা হবে অনিঃশেষ কথার অবতারণা মাত্র। কারণ, যার উপরে আর কারণ নেই, সেই মূল কারণই তিনি। কিন্তু আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে কারণেরও কারণ থাকে। সুতরাং মূল কারণ সম্পর্কে যদি কেউ প্রশ্ন করেন— মূল কারণের কারণ কি? তাহলে ভাষা দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা চলে না। নতুন তর্কের অবতারণা হতে পারে মাত্র। কিন্তু সে তর্কও হবে অনিঃশেষ। কাজেই পরব্রহ্মজ্ঞ ঋষিকেও ভাষা দিয়ে বোঝাতে গেলে এক সময় হার স্বীকার করতে হয়। যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদেই গার্গী যখন যাজ্ঞবল্ককে জিজ্ঞাসা করছিলেন তখন ঘটনা এইভাবেই দাঁড়িয়েছিল। গার্গী যখন বহু প্রশ্নে যাজ্ঞবল্কের জবাব পাবার পর তাঁর চূড়ান্ত প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিলেন তখন যাজ্ঞবল্কও এর কোন জবাব দিতে পারেন নি। গার্গী বললেন, দেবতারা, ইন্দ্রের মধ্যে, ইন্দ্র দেবতার মধ্যে, সেই পিতৃদেবতা ব্রহ্মার মধ্যে, কিন্তু ব্রহ্মা কার মধ্যে? যাজ্ঞবল্ক আর কোন জবাব দিতে পারেন নি। শুধু বলেছিলেন—'খুব বেশী জিজ্ঞাসা কোর না গার্গী।'

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি—স্থান-কাল-কারণের মধ্যে যে মহাজাগতিক ঘটনা তার হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু যিনি কালাতীত, মাত্রাতীত, কারণাতীত, তাঁর কোন ব্যাখ্যা চলে না। যাঁর মধ্যে মাত্রা রয়েছে অথচ নিজে যিনি মাত্রাতীত; যাঁর মধ্যে সময়, অথচ নিজে যিনি কালাতীত; যাঁর মধ্য থেকেই কাবণ অথচ যিনি কারণের অতীত; তাঁকে আমরা কার্য-করণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারি না। আর যতক্ষণ আমরা বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে দেখতে চাই ততক্ষণ তাই তাঁর কোন সন্ধান মেলে না। যাজ্ঞবল্কের মত ঋষিও তাই কথার বুদ্বুদ তুলেছেন মাত্র, বোঝাতে পারেননি। গার্গীকে বলেছেন—'হে গার্গী যিনি দ্যুলোকেরও উপরে, যিনি পৃথিবীবও নীচে (বিজ্ঞান সম্পর্কে মহাকাশ সম্পর্কে ধারণার অভাব ছিল সম্ভবত। কারণ মহাবিশ্বে বিচার করলে উপর নিচ কিছু নেই।) মানুষ যাকে বলে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, এ-সবই মাত্রাভুক্ত ও বিস্তৃত। [১]

কিন্তু এই মাত্রার (Dimcnbm) উৎপত্তি কোথায়? হে গার্গী জানবে, বস্তুত এই অক্ষয় 'একে'র মধ্যেই মাত্রার সৃষ্টি ও দেশের বিস্তৃতি।' কঠোপনিষদে বলা হয়েছে—'আরম্ভ এবং শেষহীন এক শাশ্বত হল এই ব্রহ্মণ। স্বয়ম্ভু, নির্দিষ্ট কোন কালের মধ্যে নন তিনি। তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎমুক্ত অস্তিত্ব।' স্বয়ম্ভু কথাটাই মানুষেব বুদ্ধিবৃত্তিব কাছে বিভ্রান্তিকর, কারণ কোন কারণ ছাড়া প্রকাশ আমরা কল্পনাই করতে পারি না। [২] সুতরাং বুদ্ধি দ্বারা যদি সেই পরমাত্মন বা পরব্রহ্মণের স্বরূপ বোঝা না যায়, তাহলে তাকে বোঝা যাবে কি করে? তাকে বোঝা যাবে তখনই, যদি আমরা পরব্রহ্মণ হতে পারি। কিন্তু বুঝতে গেলেই দ্বৈত চাই। অর্থাৎ একজন আছেন যাকে আর একজন বোঝেন। কিন্তু পরব্রহ্মণ হলে তাঁকে আর বোঝার প্রশ্ন থাকে কি? তাহলে? এই পরব্রহ্মস্বরূপ উপায় কি?

আছে, পরব্রহ্মস্বরূপেরও উপায় আছে। তারই নাম দিব্যানুভূতি বা

(১) অর্থাৎ সময় অনন্ত নয়, তা সীমিত। সময়েব চেতনা আপেক্ষিক। কোয়ান্টাম ফিজিক্স এবং আইনস্টাইন একথা প্রমাণ করেছেন।

(২) বর্তমান কোয়ান্টাম ফিজিক্স কিন্তু বলেছে নাস্তি থেকে অকস্মাৎ অস্তি রূপে পার্টিকুলের আবির্ভাব হচ্ছে।

দিব্যদর্শন, কার্যকারণ সম্পর্কে যা যুক্ত নয়। সে এক আপন-আপনি স্বতঃস্ফূর্ততা। সেই স্বতঃস্ফূর্ততাই মূল সত্য যা আছে প্রত্যেকেরই মধ্যে। বুদ্ধির অগম্য এক অনুভবেই কেবলমাত্র তা ধরা পড়ে। সেই দুর্জ্ঞেয় দুর্বোধ্য রহস্যের স্পর্শে দিশেহারা হয়ে উঠে বৈজ্ঞানিক Pascal তাই বলে উঠেছিলেন—'The heart has its reason of which reason knows nothing.'

উপনিষদ বলেছে, সেই আধ্যাত্মিক সত্য লাভেরও উপায় আছে। অধ্যাত্ম জগতের সন্ধান অধ্যাত্মতার মধ্য দিয়েই করতে হবে। সেই জন্যই যোগের ব্যবস্থা। যোগের দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া স্তব্ধ করে দিয়ে অন্তরের গভীর রহস্যের দিকে নিজেকে ছেড়ে দিলেই মন-বুদ্ধির অগোচরে এক বিশাল নিস্তরঙ্গ পরমস্নিগ্ধ অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এই জন্যই মরমিয়া সাধকই মাত্র সেই সৎ-চিৎ-আনন্দের ঐক্যবদ্ধ শান্ত অবস্থার সন্ধান পেয়েছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে—'এই অতীন্দ্রিয় অনুভবেই অশ্রুত শ্রুত হন, দুর্বোধ্য বোধ্য হন, অজ্ঞাত জ্ঞাত হন।' যুক্তি তর্ক যখন উত্তরণের সাহায্যে অধ্যাত্ম[1] অনুভূতিতে প্রবেশ করে, তখনই সত্য ধরা পড়ে। সেই সত্য অত্যন্ত সহজ, কিন্তু যে-কোন চেষ্টাকৃত প্রয়াসের কাছে অত্যন্ত কঠিন। শিশুর কাছে মা যেমন সহজ বুদ্ধিমান বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের চিন্তাতে তিনি তেমন সহজ নন। অত্যন্ত সহজভাবে ঘটনাটাকে ধরলেই সহজ, তা না হলেই কঠিন। এবং কচ্ছপের মত সেই সত্য, যুক্তিতর্কের হাতিয়ার দিয়ে যতই তাকে আঘাত করা যাবে ততই ভেতরে হাত পা গুটিয়ে নেবে। পিটিয়ে কচ্ছপের হাত পা বের করা যাবে না—কোন প্রয়াস না করে শুধুমাত্র দেখবার মানসে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেই সে হাত পা বের করে স্বমূর্তিতে দেখা দেবে।[2] তাইতো উপনিষদকারেরা বলেছেন, তাঁকে যদি জানতে চাও তোমার বুদ্ধি-বিচারকে দূরে ঠেলে দাও; আত্মসচেতনতাকে দূরে ঠেলে দাও; শিশুর মত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাও। বৃহদারণ্যক উপনিষদ তাই বলেছে—পরব্রহ্মণকে জানতে বিদ্যার অহংকার বিসর্জন দিয়ে শিশুর মত নিস্পাপ হতে হবে। ঈশ্বরের রাজত্বে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ক্ষুদ্র শিশুর মত হতে পারা যাবে। সেই সর্বোচ্চকে সহজতম মন ছাড়া ধরবার উপায় নেই। এই জন্যই বৃহদারণ্যকে উপনিষদ বলেছে—'অনেক কথার পিছনে ছুটো না, কারণ তাতে শুধু তোমার জিহ্বাতেই ক্লান্তি বোধ করবে।' কঠোপনিষদ বলেছে—'শিক্ষা দ্বারা পরমাত্মনকে লাভ করা যায় না; প্রতিভা দ্বারাও নয়, পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারাও নয়।' মরমিয়া সাধকেরা তাঁদের অন্তরের আলোতেই তাঁকে দেখতে পান। এ জ্ঞানের কোন মাধ্যম নেই। মা যেমন কারো বকলমায় পুত্রের মুখে মা ডাক শুনে তৃপ্ত হন না, তেমনই পরমাত্মন বা পরব্রহ্মণ চান সরাসরি সম্পর্ক। অন্তর প্রসারিত করে দিলে সেই পরম স্নিগ্ধ জ্যোতি আপনি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, সমস্ত স্বাতন্ত্র্যবোধ, চিন্তা ও ব্যক্তিসুখকে সেই পরমের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। এবং তখনই অন্তরস্থিত সত্যের আলোতে বিশ্ব হয়ে উঠে আপন। দুঃখ বেদনা সব দূরে চলে যায়। গীতার সেই কথার

(১) অধি (beyond) আত্ম (জীবাত্মা) – অধ্যাত্ম, a still state beyond universe.

(২) সহজ যোগের ব্যবস্থাও এই ধরনের। এই যোগব্যবস্থা জানার জন্য লেখকের দিব্য জগৎ ও দৈবী-ভাষার দ্বিতীয় খন্ডের শেষ অধ্যায় পাঠ করুন।

মত মানুষ হয় 'বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতধর্ম নিরুচ্চতে'। মানুষের বুদ্ধি, আবেগ ইচ্ছা সব মিশে যায় এক কেন্দ্রে। তখনই সে বৃহদারণ্যক উপনিষদের মত বলে উঠে—'এসাস্য পরমা গতিঃ এসাস্য পরমা সম্পত, এসাস্য পরমা লোকঃ, এসাস্য পরমো আনন্দ।' অর্থাৎ, এই হল সে সর্বোচ্চ, এই হল সেই পরম সম্পদ, এ হল সেই পরম স্থান, এই হল সেই আনন্দ। আর এই যে অতীন্দ্রিয় বোধ তা ভাষার দ্বারা অপরের কাছে ব্যক্ত করা যায় না। মরমিয়া অন্তর্দৃষ্টি অব্যক্ত। আমরা বহির্জগতে যাঁরা দৃষ্টিবান, অন্তর্জগতে হয়তো তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই অন্ধ। জন্মান্ধকে যেমন রামধনুর এবং সূর্যোদয় সূর্যাস্তের বর্ণনা দিয়ে কখনই তার সৌন্দর্য বোঝানো যাবে না, তেমনই মরমিয়ার দিব্যজ্যোতির সৌন্দর্যও তাত্ত্বিককে বোঝানো যাবে না। চোখে না দেখলে কথার দ্বারা কিছু বোঝানো যায় না। অন্ধের হস্তীদর্শনের মত আংশিক একটা ধারণা হতে পারে মাত্র, তার বেশী নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাঁহারে দেন, তাঁর পক্ষে বেদনা অপার।' সেই বেদনাই আনন্দ। অপরকে তা বোঝানো যাবে না। কে একজন বলেছিলেন না, 'ঈশ্বর এটা আমার মাথায় দিয়েছেন, আমার পক্ষে এটা তোমার মাথায় তুলে দেওয়া সম্ভব নয়।' মরমিয়া অনুভবের এটাই হল শেষ কথা। রাজা বাসকলি বাহ্ব ঋষিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'আমাকে পরব্রহ্মস্বরূপ বলুন। ঋষি তাঁর জবাবে নিরুত্তর থাকলে রাজা যখন আবার তাঁকে একই অনুরোধ করেছিলেন, তখন ঋষি বলেছিলেন 'আমিতো আপনাকে বললুম, কিন্তু আপনি তা বুঝতে পাবেন নি। শান্তো ইয়ম পরমআত্মা।' এই পরমাত্মন (পরব্রহ্মণ) হল শান্ত।

মরমিয়া এই আত্মানুভব উপনিষদের আগেই এসেছিল সেই বেদ-স্তোত্রের যুগে, যখন ঋষি-কবির হৃদয় নেমেছিল সত্যের সন্ধানে। সেই সময়ই যজুর্বেদে ছিল এই ধরনের কথা—'যাঁর মহিমা সত্যসত্যই বিশাল, তিনি পরিমাপের অতীত।' বৃহদারণ্যক বলেছে, পরমাত্মন হল 'সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর।'

কঠোপনিষদ বলেছে—'ইহা গতিশীল আবার ইহাই গতিহীন। ইহাই দূর, ইহাই নিকট। ইহা সব কিছুর মধ্যেই আছে, আবার সব কিছুরই বাহিরে।' এই যে গতি এবং স্থিতি এই যে দূর এবং নিকট, এই যে ভিতর এবং বাহির, এ শুধু অসঙ্গতিপূর্ণ উক্তি নয়, অন্তরের অন্তস্তলে এ হল চূড়ান্ত সত্য। বুদ্ধিতে এটা ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে অনুভূতিতে। এই অনুভূতি ইন্দ্রিয়াতীত। এই যে সত্য, একে যখন জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধির দ্বারা ধরবার চেষ্টা হবে, তখন তা পরিপূর্ণ সত্য নয়। আবার যাঁরা মনে করেন যে, এই সত্যকে তাঁরা জানেন না তাঁরাও আংশিকভাবে তাকে জানেন। পরব্রহ্মণকে জানেন বলে যাঁরা বাকজাল বিস্তার করেন এবং জানেন না বলে যারা কথা বলেন, তাঁরা সবাই অর্ধসত্য জানেন। এটা জ্ঞানের এমন এক অবস্থা, যা বুদ্ধিগ্রাহ্যতার নিকট সর্বদাই অর্ধজ্ঞান ও অর্ধ-অজ্ঞানতা। 'কেন' উপনিষদ তাই বলেছে—'ইহাকে যাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন না, এবং যারা জানেন না, তাঁরা জানেন।'

সত্যসত্যই বুদ্ধির আলোতে পরমাত্মন বা পরব্রহ্মণের স্বরূপ ধরা পড়ে না বটে, তথাপি উপনিষদে যে পরব্রহ্মণসন্ধানে জ্ঞানের পথ সম্পূর্ণরূপে

পরিহার করতে বলেছে, তা নয়। এই বুদ্ধি সেই সত্যস্বরূপবোধের একটা মূল্যবান উপায়। সত্য সম্পর্কে বুদ্ধি দ্বারা যা বলা যায়, তা মিথ্যা নয়, তবে সত্য বা পরব্রহ্মণের পরিপূর্ণতা এতে থাকে না। বুদ্ধি বা বিচার বিশ্লেষণকে অস্বীকার করবার প্রশ্নই আসে না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এইটুকুও মনে রাখতে হবে যে এই জ্ঞানেরও পরিপূরক দরকার। সেই পরিপূরকই হল অনুভূতি। সত্যের সন্ধানে জ্ঞান এবং অনুভূতি দুয়েরই প্রয়োজন আছে। জ্ঞান যেখানে ব্যর্থ সেখানেই অনুভূতির আলোতে অগ্রসর হতে হবে। অনুভূতির দ্বারা যে সত্যলাভ হবে তাকেই জ্ঞানের দ্বারা বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করতে হবে। এবং এই অনুভূতি এবং বিচার দুয়ের পারস্পরিক সংশোধন ও পরিপূরণেই ক্রমশঃ সেই পূর্ণসত্যের দিকে যাওয়া সম্ভব। এই জন্যই বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—'না জেনে যাঁরা আরাধনা করেন তাঁরা অন্ধ তামসে প্রবেশ করেন ; যাঁরা জ্ঞানেরই বড়াই করেন শুধু, তাঁরা আরও বেশী অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন।'

আলোচনা অনেক হল। আগেই বলেছি—বুদ্ধি দ্বারা সত্যকে ধরবার চেষ্টা করলে তর্কের শেষ নেই, কথার পৃষ্ঠে কথা, অনন্ত কথার মালা রচিত হবে শুধু, কথা শেষ হয়ে অবাঙমানসগোচরম সত্যে গিয়ে নিস্তব্ধ হতে পারবে না কখনও। সুতরাং কথা এবার থাক। কিন্তু এই শেষ করবার আগে আরও দু-একটি কথা বলা বোধহয় অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না।

ঈশ্বর এক দুর্বোধ্য আধ্যাত্মিক বিষয়। সে বিষয়ে পূর্ণ ধারণা হলে কেউ নিশ্চয়ই আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না, বা কেউ কলম ধরে আর কিছু লিখতেও যাবেন না। তবু লেখা, বলা এবং পড়ার মধ্যে থেকে যদি ঈশ্বর বিষয়ে অর্ধজ্ঞানও হয় তথাপি সাধারণ বুদ্ধির কাছে এর পরিপূরক হিসাবে আর একটি প্রশ্ন বড় জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকে। সে হল এই প্রশ্ন যে, পরব্রহ্মস্বরূপ সম্পর্কে না হয় অর্ধধারণাই করলাম, না হয় অন্তত এইটুকু বুঝলাম যে, তিনিই সত্য, আর সবই মিথ্যা ; কিংবা কিছুই মিথ্যা নয়, সবই সত্য ; শুধুমাত্র 'এক' আছে, 'দুই' নেই, তবুও এই দ্বৈত একটা ভাব কেন ? অপ্রকাশ কেন প্রকাশ ? ধরে নিলাম, অনুভূতির আলোতে দেখলে দেখতে পাব যে, আমাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, তবুও এই অস্তিত্বের ভাব কেন ? অর্থাৎ এক কথায়, সব মানুষই ধর্ম চর্চার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে যে কৌতূহল প্রদর্শন করবে, তা হল এইযে, এই সৃষ্টি তবে কেন ? এবং কোত্থেকে ? অর্থাৎ একটা আধ্যাত্মিক চিন্তা সীমার মধ্যেও প্রায় পরিপূর্ণতা লাভ করে তখনই, যখন সৃষ্টিরহস্যের গোপন দুয়ার তার কাছে খুলে যায়। উপনিষদেও রহস্যের আলোচনা আছে। কিন্তু সে আলোচনা কেমন ?

উপনিষদ বস্তুবাদী নয়। বিশ্বাস করে না যে বস্তু থেকেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। বিশ্বাস করে না যে, বস্তু সত্য। আবার উপনিষদের গভীর তত্ত্বে প্রবেশ করলে একথাও বলা যাবে না যে, বস্তু অসত্য। বস্তুর চরিত্র কি, সেটা নিয়েই প্রশ্ন। বস্তু প্রাণ সৃষ্টি করতে পারে না। মনও সৃষ্টি করতে পারে না। অর্থাৎ বস্তুর মধ্যে প্রাণের মৌল সম্পদ নেই। সেজন্য এ-কথা অবশ্যই

বলা যায় না যে, কোন মহাপ্রাণ বস্তুরূপে দেখা দিতে পারে না। আবার এ কথাও নিশ্চয় বলা যায় না যে—বস্তু যদি কোন মহাপ্রাণ বা মহামানস, বা মহাবিজ্ঞান, মানে আমি বলতে চাই—পরমাত্মন বা পরব্রহ্মণ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে, তবে তা পরিণতিতে সেই মহাপ্রাণ বা মহামানস বা মহাবিজ্ঞান কিংবা পরমাত্মান বা পরব্রহ্মণ হতে পারে। কিন্তু এটা আমার ব্যক্তিগত মতামতের প্রশ্ন নয়। উপনিষদ এ সম্পর্কে কি চিন্তা করেছে, সেটাই বিচার্য।

যা থেকে উৎপত্তি তাতেই পরিণতি হবে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। উপনিষদ মূল হিসাবে পরমাত্মান বা পরব্রহ্মণের যে কল্পনা করেছে, বলাই বাহুল্য সে সম্পর্ক এত দীর্ঘ আলোচনার পর জগত সৃষ্টির উৎস নিয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। মূল যখন আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মণ তখন এ-কথা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে, উৎপত্তি হয়েছে পরব্রহ্মণ থেকেই। কিন্তু প্রশ্নটা উৎপত্তি কোথা থেকে হল সেটা নয়, কেন হল, কি করে হল, সেটাই।

শান্তস্বরূপ আনন্দ-স্বরূপ বর্ণনার অতীত। তা বস্তুও নয়, অবস্তুও নয়। অথচ তা এমন এক জিনিস—যা আছে। সেই তা থেকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে যে বস্তুজগত এসেছে, তা এল কেমন করে? এর কি কেউ স্রষ্টা আছেন? যদি থাকেন, তিনি হাত পা-ওয়ালা মানুষের মত ছোট ও সীমিত হয়ে যান। তা যদি না হয়, তিনি তবে এ সৃষ্টি করেছেন কেন? কোন অপূর্ণতা ছাড়া সৃষ্টি করে না কেউ। আর পরব্রহ্মণ যদি সর্বব্যাপী হন তাহলে সৃষ্টি করবেন কোথায়। 'করা' এই ক্রিয়াপদটিই বোঝায় নিজের বাইরে কিছু করা। এতে পরব্রহ্মণের ধারণা ছোট হয়ে যায়। তবুও আমরা আমাদের ধারণার মধ্যেই যে বিরাট বিশ্ব দেখি, বিচিত্র বিশ্ব দেখি, এটা তবে কি?

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কেউ সৃষ্টি করেনি। উপনিষদের কোথাও কোথাও কোন গল্পে যদি এ-রকমের ধারণা হয়েও থাকে, তবে তা ভ্রান্ত। উপনিষদের মূল সুর এই যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই পরব্রহ্মণের অনির্বচনীয় প্রকাশ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে —'আপনা দ্বারা আপনি সৃষ্ট।' কিন্তু যখনই এসব কথার মধ্যে ক্রিয়াপদ এসে যোগ দেয় তখনই একটা দ্বৈতের গন্ধ ফুটে ওঠে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেছে-'তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করে এর মধ্যে প্রকাশ করেন।' এ-ধরনের কথা আরও দুর্বল। যেন, বিশ্ব ও ঈশ্বর 'দুই' কিছু। এমনও ধারণা আছে-স্রষ্টা প্রজাপতি আপন একাকিত্বে অসহ্য হয়ে নিজের ভেতর থেকেই সৃষ্টি করেন এই বিশ্ব। নিজেকে তিনি দ্বিধাবিভক্ত ক'রে করেন পুরুষ ও রমনী।[১] এ ধরনের চিন্তা আরও কাঁচা, কারণ এতে স্বীকার করা হচ্ছে যে, স্রষ্টার মধ্যে অপূর্ণতাজাত অভাব ছিল, তাই একাকিত্ব তাঁর কাছে অসহ্য বোধ হয়েছিল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্যাপারটাকে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে এইভাবে যে, ব্রহ্মণ এবং বস্তু একই,[২] দুই আকারে প্রকাশ। যেমন সমুদ্রের জল ও নুন। সমুদ্রের জল থেকেই নুনের উৎপত্তি, কিন্তু জলে মিশে গেলে আর তার

১) কোয়ান্টাম ফিজিক্সের Newtron field তত্ত্বের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এই চিন্তা। তবে এতে যখন কারণ যুক্ত হয় তখনই ব্যাপারটা ছোট হয়ে যায়।

২) কৃষ্ণ হল energy-র ক্রমবর্ধমান। বস্তুই এই শক্তিরই ঘনীভূত রূপ। আইনস্টাইনের EMc২ সে সত্যই প্রমাণ করেছে।

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এ-ধরনের ধারণার মধ্যেও আছে সীমাবদ্ধতা। কারণ, নুন হিসাবে যখন কল্পনা করা হয় তখন তা সমুদ্রের বাইরে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যদি সমুদ্রের জল ছাড়া আর কিছুই না থাকতো, নুনের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে প্রকাশ পাবার কেন উপায়ই ছিল না। সেখানে প্রকাশ পেতে হলে কারণের প্রয়োজন হত-(যেমন জলে বরফ হয় আবহাওয়ার জন্যে।) ডাঙ্গা আছে বলেই নুন হিসাবে নুনের আত্মপ্রকাশ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও পরব্রহ্মণ যদি এমন হয় যে, জল পরব্রহ্মণ এবং নুন তার গুণ, স্বতন্ত্র অস্তিত্বে নুনের প্রকাশ নেই, গুণ হিসাবেই আছে তাহলে এক রকমের ধারণা হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, পরব্রহ্মাণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে এই যে গুণ, তাকে কে উপভোগ করে? কারও কাছে যদি জল-এর বৈশিষ্ট্যএবং লবনাক্ত স্বাদের ধারণা না থাকে, তাহলে নুন যে সমুদ্রের জলের গুণ তা চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই। সুতরাং ছান্দোগ্যের বর্ণনা অনেকটা উন্নতমানের হলেও যথার্থ নয়।

পরব্রহ্মণই যখন একমাত্র সত্য, বস্তু তবে কি? বস্তু তবে মিথ্যা হতে পারে না। তাহলে? শঙ্করাচার্য তাই বস্তুজগতের নাম দিয়েছেন মায়া। এই মায়া অনির্বচনীয়। কিন্তু মায়া বলতে এই বস্তু-জগতের কেউ যদি ভ্রান্তি বলে মনে করেন, নিশ্চয়ই সেটা ভুল। কারণ সত্যের মধ্যে কোন কিছুই ভ্রান্ত হতে পারে না? মায়া হল পরব্রহ্মাণের অবিচ্ছেদ্য গুণ। পরব্রহ্মণ এবং এই গুণের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক নেই। দুইই এক। এ এমন এক দুরূহ তত্ত্ব, যা ব্যাখ্যা করে বলা যায় না, তাইতো একে বলা হয় অনির্বচনীয়।

কথা দিয়ে এই অনির্বচনীয়কে ধরা যায় না বলেই উপনিষদ কখনও হাঁ-বাচক শব্দে এই রহস্য ব্যাখ্যা করতে সাহস করেননি। সব সময়ই সত্যকে বোঝাবার জন্য সে সাহায্য নিয়েছে নেতির। তবুও কখনও কখনও হাঁ-বাচক ভঙ্গী না দেখিয়েছে তা নয়। উপনিষদ বলেছে, পরব্রহ্মণ কিছু সৃষ্টি করে নি। কিন্তু এই বিশ্বজগত তাঁরই স্বেচ্ছা বন্ধন। যেন অনন্ত সমুদ্র। হয়েছে বরফ। জলের আয়তন যতখানি ততটুকুই বরফ হতে পারে। আবার গলে গেলে ততটুকুই জল হয়। এই বস্তু-জগত জলব্রহ্মাণের বরফ স্বরূপ। জল আর বরফ এক, যখন যেরকম মনে হয়। জলের বরফাকৃতি ধরার মতই হল ব্রহ্মাণের স্বেচ্ছাবন্ধন। জলের আয়তনের মধ্যেই যেমন বরফ সম্ভব তেমনই ব্রহ্মের মধ্যেই বস্তুত সম্ভব।

উপনিষদের নানা অংশে সৃষ্টিকে সেই ব্রহ্মাণের ক্রমবিকাশ হিসাবে দেখানো হয়েছে। বিকাশ বা ক্রমবিকাশ এই দুই শব্দই পরব্রহ্মাণের সীমাবদ্ধতাসূচক। সুতারাং এ-ধরনের মন্তব্য অচল। কিন্তু যখন একে বলা হয়েছে আত্মপ্রকাশ তখন অনেকটা সত্য, জলের বরফ-আকৃতি ধরার মত। কিন্তু প্রশ্ন আসে, জল বরফাকৃতি ধারণ করে তখনই, যখন বাহ্য কারণ থাকে। পরব্রহ্মাণের বরফাকৃতি ধরার বাহ্য কারণ কি? তার ব্যাখ্যা ভাষায় দেওয়া যাবে না। বলতে হবে ওটা তাহলে বরফ নয়। যখন মনে করবেন বরফ, তখনই বরফ, নইলে নয়।[১] এই জন্যই গাগ্যায়ন প্রণবনাদ[২] দিয়ে সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা

১) যেমন কোয়ান্টাম ফিজিক্সে মানস শক্তি দ্বারা অনুধাবন না করলে electron আদির অস্তিত্ব ধরা যায় না ভৌতিক (Ghostly) অবস্থায় থাকে ঘটনাটা তেমনই।

২) প্রণবনাদ সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব চিন্তা ঐতিহ্য মন্ডিত চিন্তার সঙ্গে এক নয়। এ বিষয়ের তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার দিব্যজগৎ ও দেবী ভাষা গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে।

করবার চেষ্টা করেছেন। উপনিষদের সেই যে কথা—'অহম এতৎ ন' আমি এটা নই। 'অহম' হল আত্মসচেতন ঈশ্বর। 'এতৎ' হল প্রকৃতি অর্থাৎ অনাত্ম। এই দুয়ের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করছে 'ন'।

অর্থাৎ পরম আত্মা অনাত্মা নয়। এবং এই সম্পর্কই সূচিত করছে অউম (ওঁ) শব্দ। অ হল পরম আত্মা, উ হল অনাত্মা এবং ম হল ন। এই তিনে মিলে হল অউম(ওঁ)। অর্থাৎ প্রণব। অর্থাৎ এই বিশ্বজগত হল পরমআত্মানের নঙর্থক চিন্তা। কিন্তু যখনই আরও ব্যাখ্যা করে বলতে যাব যে, এতৎ হল অবাস্তব ছায়া। এবং এহম হল একমাত্র সৎ, তখনই শব্দের সীমাবদ্ধতার অর্থ হারিয়ে যাবে। সত্যের মধ্যে অবাস্তব অর্থাৎ মিথ্যার ছায়া পড়তেই পারে না। শব্দের এই সীমাবদ্ধতার জন্যই এউম(ওঁ) একটা প্রতীক হয়ে আছে মাত্র ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে। যে-কোন ধরনের ত্রীয়র প্রতীক হল অউ ম(ওঁ) যেমন, এরই অর্থ অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব, প্রকাশ; জন্ম, জীবন, মৃত্যু; প্রকৃতি, জীবাত্মা, পরমাত্মা, সত্ত্ব, রজ, তম; অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি।

উপনিষদ নেতিবাচক শব্দে সৃষ্টি-রহস্যের বর্ণনার প্রয়াস পেলেও এই বস্তুজগতকে যে অস্বীকার করেছে, তা নয়। উপনিষদ এ-কথা কখনই বলতে চায়নি যে, জীবন একটা দুঃস্বপ্ন এবং এই বিশ্ব-প্রকৃতি অনুর্বর শূন্যতা। বরং এ কথাই বলবার চেষ্টা করেছে যে—এক অমৃতময় প্রাণস্পন্দনে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত। সত্য এক, তথাপি দুই। এর কোনটাই উপনিষদের কাছে মিথ্যে নয়। এই দুইয়ের মধ্যে সে এক পূর্ণতার অবতারণা করতে চেয়েছে। বলেছে—'আনন্দরূপম অমৃতম যদ্ বিভাতি।' এই আনন্দরূপ অমৃতের স্বাদ উপনিষদের ঋষিরা লাভ করলেও মানুষের সীমিত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা যায় না বলে মানুষ নেতিবাচক ভঙ্গি গ্রহণ করেছে। শঙ্করাচার্যের মত সাধকও তাই বলেছেন—সত্য অদ্বৈত, নঙর্থক। কিন্তু, এই নঙর্থক যে হাঁ-বাচক সেটা তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না। সেই হাঁ-বাচককে না-বাচক দিয়ে বুঝিয়েছেন উপনিষদ, যেমন সৃষ্টিতেই শুধু মাত্র আছে 'এক' একথা না বলে বলেছে —'দুই' নেই। যখনই সে একের কথা বলতে চেয়েছে তখনই অলংকারিক ভাষা ব্যবহার করেছে, যেমন 'বাচারম্ভমন বিকারো নামধেয়ম মৃত্তিকেতি এব সত্যম।' সবই হল একই বিষয়। পার্থক্য শুধু নামকরণের জন্য। যতটুকু পার্থক্য আমরা দেখি তা সবই নামের পার্থক্য। এক যে বহু হয়েছে সে শুধু নাম ও রূপের জন্য। বৌদ্ধশাস্ত্রে রূপের অর্থ হল বস্তু-দেহ এবং নামের অর্থ সূক্ষ্ম মন। উপনিষদে এই নাম ও রূপ ব্রহ্মণকে দিয়েছে ব্যক্তিসত্তা। বস্তু ও মানুষ সেই পরব্রহ্মণেরই অস্তিত্বের বিভিন্ন ধরণ। এই জন্যই উপনিষদে মুক্তি বলতে বোঝানো হয়েছে—নামরূপ থেকে মুক্তি, অর্থাৎ এক থেকে পার্থক্যসূচক অনুভব বন্ধ করা। মুনডক উপনিষদ তাই বলেছে—'যিনি শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি স্রোতস্বিনী যেমন সমুদ্রে গিয়ে স্থির হয়, তেমনই নামরূপ পেছনে রেখে মহাজাগতিক[১] প্রাণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।'

---

১) মহাজগত শব্দ এখানে অভিশূন্যতা রূপ চিৎসত্তা রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

কোন কোন উপনিষদ-বেত্তার মতে উপনিষদে আছে সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চারটি বিশেষ ধারণা, যেমন (১) বস্তুর অস্তিত্ব স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। বস্তুও শাশ্বত, ঈশ্বর তাতে রূপ দিয়েছেন, কিন্তু বস্তু সৃষ্টি করেন নি। (কিন্তু বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যে আর নেই, বর্তমান বিজ্ঞান তা প্রমাণ করেছে। এবং উপনিষদে সত্যসত্যই এই দ্বৈতের স্বীকৃতি নেই) (২) ঈশ্বর শূন্য থেকে এই বস্তুজগত তৈরী করেছেন।[১] কিন্তু সেই বস্তুজগত নিয়মের অধীন, ঈশ্বরের অধীন নয়[২] (৩) ঈশ্বর নিজেকে রূপান্তরিত করে এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। এবং (৪) ঈশ্বর অদ্বৈত সত্য, সৃষ্টি বলতে কিছু নেই। তবে এই সব উপনিষদ-বেত্তারাও মনে করেন যে, চতুর্থ শর্তই উপনিষদের মূল সত্য। কিন্তু এই চতুর্থ সত্য সম্পর্কে তাদের ধারণা হল এই যে, এ জগত মায়া। ভ্রান্তি। কিন্তু উপনিষদ যে এই মায়া বা ভ্রান্তিতে স্বীকার করে না তা পূর্বেই বলেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদ তাই বলেছে—'সসীম আছে অসীমে। এই আত্মনই হল সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।' মুনডক, কঠ, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে বলা হয়েছে—'ইহাই প্রাণ, বাক্য, মন। ইহাই বিশ্বজগতের সব কিছু। তুচ্ছ ধূলিকণা থেকে ক্ষুদ্রতম বস্তু সর্বত্রই ঈশ্বর বিরাজমান।' রবীন্দ্রনাথ যেমন বুঝেছিলেন এই সৃষ্টি ছাড়া স্রষ্টাও অর্থহীন—'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।'

এই যে 'আমি' আমি যে মিথ্যে নই এ-কথা প্রমাণ করার জন্যই ছান্দোগ্য উপনিষদ গল্পের আকারে সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করেছে এইভাবে : ব্রহ্মজ্ঞানী পিতার কাছে পুত্র জগত-রহস্যের কারণ জানতে চাইলে পিতা তাকে ন্যাগ্রোধ বৃক্ষের ফল আনতে বলে বললেন—'ওখান থেকে ন্যাগ্রোধ বৃক্ষের একটি ফল আনয়ন কর। পুত্র ফল এনে বলল, এই যে। পিতা বললেন ওটা ভাঙ। পুত্র ভেঙে বলল, ভেঙেছি। পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, কি দেখছ ওখানে? পুত্র বলল, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজ। পিতা বললেন, এই বীজের একটিকে ভাঙ। পুত্র ভেঙে বলল, ভেঙেছি। পিতা বললেন, কি দেখছ? পুত্র বললেন কিছুই না। পিতা বললেন, হে পুত্র, সেই যে সূক্ষ্ম-মূল যাকে তুমি আর দেখতে পাচ্ছ না, সেই মুলের উপরই এই বিরাট ন্যাগ্রোধ বৃক্ষটির অস্তিত্ব। হে পুত্র শ্রবণ কর, এই যে সকল অস্তিত্ব, এ-সকলও তেমনই এক সূক্ষ্ম মূলের উপর দণ্ডায়মান। এই মূলই হল সত্য। এই হল পরমাত্মা। হে শ্বেতকেতু (পুত্র) তুমিই সেই।'

উপনিষদ যখন সমস্ত কিছুর মূলে পরব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করতে চেষ্টা করে তখন প্রচলিত অর্থে সৃষ্টির অর্থে আমাদের কাছে ধাঁধার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। যাঁরা অন্তরতমের স্নিগ্ধ আলোতে উদ্ভাসিত হতে পারেন তাঁরা দেখেন সব কিছুতেই আনন্দ। ভেদাভেদ কিছু দেখেন না। এবং এই সৃষ্টি সম্পর্কেও আর

১) বঙ্কিম শূন্যতা (curved space) থেকে স্বতই বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে কথা কোয়ান্টাম ফিজিক্স বলছে। তবে 'কেউ সৃষ্টি করছে' একথা বলছে না।

২) এই চিন্তা অষ্টাদশ শতাব্দীর Deism এর চিন্তা। বর্তমানে সত্য নয়। আর আণবিক স্তরে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা নেই। তবে বৃহদায়তিক জগতে একটা rhythm আছে।

বিজ্ঞানের মতে Neutron field থেকে আবির্ভাবের মত স্বতই সৃষ্টি হয়েছে। তবে মরমিয়ারা এক মহামানস এখানে লক্ষ্য করেছেন।

কোন প্রশ্ন করা প্রয়োজন বোধ করেন না। আর যাঁরা সেই স্তরে যেতে পারেন না তারা মনে করেন সব কিছুই একটা বিরাট ফাঁকি। কিন্তু তবু সাধারণ বুদ্ধি কিছু থাকে, এবং এ প্রশ্ন থেকেই যায়–কবে, কিভাবে, কোথা থেকে। সুতারাং আনন্দস্বরূপের সন্ধান দিলেও.এ ধরনের প্রশ্নে উত্তর দেবার প্রয়াসও উপনিষদের মধ্যে আছে। বিশ্বসৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুনডক উপনিষদ বলেছে–'মাকড়সা যেমন নিজেরই অভ্যন্তর থেকে তন্তু বার করে, আবার তা অভ্যন্তরে লুকিয়ে নেয়, মৃত্তিকাতে যেমন গুল্ম তৈরী হয়, জীবন্ত দেহে যেমন কেশ প্রকাশ পায়, সেই অব্যক্ত থেকে এইভাবেই এই বিশ্বজগত প্রকাশ পরব্রহ্মের একটা সহজাত গুণ থেকে। কিন্তু এখানে সমস্যা হল এই যে, এ ধরনের বর্ণনাতে এটাই বোঝায় যে, কোথাও একটা মহাশূন্য ছিল যেখান থেকে বস্তুজগত দেখা দিয়েছে। যেন সেই মহাশূন্য বা দেশ(space) পরব্রহ্মণের বাইরে ছিল ; সেখানে দেখা দিয়েছে বস্তুজগত। যিনি অসীম তাঁর বাইরে কিছুই দেখা দিতে পারে না। সুতারাং এ ধরনের বর্ণনাও বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়।

মুনডক উপনিষদেই এই মহাজগতের আবির্ভাব সম্পর্কে বস্তুবিজ্ঞান ধরনের বর্ণনা দেবার চেষ্টাও আছে, যেমন বলা হয়েছে–'এই পরমাত্মা পরব্রহ্মণের সঙ্গে যা সমার্থবোধক, তা থেকেই এসেছে অন্তরীক্ষ, এই অন্তরীক্ষ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে মৃত্তিকা।' অন্তরীক্ষের মৌল উপাদান হল শব্দ। বায়ুতে আছে স্পর্শ, অগ্নিতে বর্ণ, জলের স্বাদ, এবং মৃত্তিকায় গন্ধ। এই সব মৌল উপাদানই বিভিন্ন হারে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে দেহ, মন এইসব।' বর্ণনাটা এমন যে.স্থূল সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হতে হতে সেই মূল কারণে মিশে যেতে পারে। বা সত্যিই মিশে গেছে। এবং অন্যপ্রকারে সূক্ষ্ম এইভাবে স্তরে স্তরে সূক্ষ্মতম থেকে স্থূল পর্যায়ে এসে বস্তুজগতে রূপ পেয়েছে। পরমাণবিক বিস্ফোরণ এবং পদার্থবিদ্যার পরমাণু বিশ্লেষণ ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক মানসকে এই দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। ধীরে ধীরে বিশ্বাস হয়েছে যে, অবস্তু থেকে বস্তু হতে পারে, এবং বস্তুও অবস্তু হতে পারে। এ শুধু শক্তির গতির একটা তারতম্য মাত্র।[১]

অত্যাধুনিক মহাকাশ গবেষকরা পদার্থবিদ্যা থেকেই এই রকম একটা ধারণা করছেন যে, কোন এক বিশেষ কেন্দ্র থেকে বিস্ফোরণের ফলেই এই বস্তুজগতের উৎপত্তি। বিস্ফোরণ যে ঘটেছিল তার প্রমাণ এই যে রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে এটা প্রমাণিত যে, এই মহাজগত কোন এক বিশেষ কেন্দ্র থেকে দ্রুতগতিতে বহির্মুখী ধাবমান।[২] বিস্ফোরণের শক্তিটুকু নিঃশেষিত হলে আবার তা কেন্দ্রাভিমুখী হবে। কিন্তু বিস্ফোরণ কোথা থেকে, কেমন জিনিস থেকে এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কোন হদিশ দিতে পারেন নি। সেই বিস্ফোরণের কেন্দ্রক বস্তু, না অবস্তু। বস্তু হলে তার মধ্যে ছিল বিপরীত শক্তি ক্রিয়াশীল, অবস্তু হলে ইচ্ছা। বিস্ফোরণের কেন্দ্র বস্তু হলে সেই বস্তুই

---

১) এই হল আইনষ্টাইনের $F=Mc^2$

২) এই সত্য ১৯৬৫ খ্রীঃ আমেরিকার নিউ জার্সির বেল লেবরেটারীতে প্রমাণিত হয়েছে।

মূল কারণ নয়। যা তার মধ্যে আবেগ সৃষ্টি করেছিল তাই মূল কারণ সুতারাং বস্তুগত ব্যাখ্যা মৌল নয়। তা হলে সাংখ্যের মত স্বীকার করতে হয় যে, কেন্দ্র ছিল বস্তু এবং শক্তি। এই দুইয়ের ক্রিয়ায় জগতের আবির্ভাব, প্রাণের আবির্ভাব। কিন্তু উপনিষদ এই দ্বৈত স্বীকার করে না। বরং এক দুর্জ্ঞেয় ইচ্ছার দিকেই তার অঙ্গুলি নির্দেশ। সেই ইচ্ছার স্বরূপকেই বুদ্ধি দ্বারা ধরা যায় না। সেখানেই ডুব দিতে হয় মনের গভীরতম প্রদেশে। এবং মহাকাশ বিজ্ঞানীরাও আজকাল তাই বলছেন। বলছেন যে, বুদ্ধি দ্বারা হবে না, গভীর এক মনকে প্রসারিত করে দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে এই সৃষ্টি রহস্যকে।[১] অবস্তু থেকে যে বস্তু এসেছে এটা সত্যিই বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার উপায় নেই। কারণ বুদ্ধি সর্বদাই প্রথম কারণ সম্পর্কে অনিসন্ধিৎসু। গাছ আগে না ফল আগে? গাছ ছাড়া ফল হতে পারে না, আবার ফল ছাড়া গাছ হতে পারে না? অনন্ত বৃত্তাকার অনুসন্ধিৎসার এই জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেও তা পাওয়া যাবে না। সুতারাং সৃষ্টি রহস্যের মূলেও বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা কখনই চূড়ান্ত তৃপ্তিদায়ক নয়। একে বুঝতে গেলে উপনিষদের সেই পরমাত্মন ও পরব্রহ্মণের পর্যায়েই যেতে হবে। পরমাত্মন থেকে অন্তরীক্ষ এ-কথার তাৎপর্য বস্তু-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় নেই। আন্তর চর্চার মধ্যেই হয়তো আছে।

বর্তমান বিজ্ঞান যে দিশেহারা পর্যায়ে আছে উপনিষদেও যে সেই ধরনের প্রশ্ন না ছিল, তা নয়। কিন্তু উপনিষদের মূল সুর তাকে অতিক্রম করে গেছে। আইনস্টাইন বলে গেছেন যে–বস্তুগুণহীন পরমাণুও সম্ভব যদি পরমাণুকে গতিহীন করে ফেলা যায়। কিনত্ত সেটা সম্ভব হয়নি। তাই বস্তুর অতীত শক্তির হাতেনাতে প্রমাণ মেলেনি। পদার্থবিদ্যার এইযে দিশেহারা পর্যায়, এই পর্যায়ে উপনিষদকারেরা বহুপূর্বেই এসেছিলেন। যেমন, উদ্দালক মনে করতেন যে, বস্তু অনন্ত অসংখ্যবার বিভক্ত করা হলেও বস্তুর মৌল উপাদান থেকেই যায়। কণাদ এবং সাংখ্যের তত্ত্বের মূল হয়তো এখানেই। কণাদের মতে বস্তুর পরমাণগুলি পরস্পর মিশে যায়, আবার পৃথক হয়ে যায়। বস্তুর মৌল উপাদানের মধ্যেই রয়েছে এই ধরনের একটা অস্থিরতা।[২] বর্তমান পদার্থবিদ্যায় Elementary particles আলোচনা প্রসঙ্গেও দেখা যাচ্ছে যে, particle anti-particle যখন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাতে দুইই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না, এদের স্থলে নতুন particle দেখা দেয়। আরও সূক্ষ্ম সেই particle গুলি। "When a particle collides with its anti-particle, both particles may be destroyed; energy in the form of lighter particles appears in their place.' আবার এর উল্টোও হতে পারে। যেমন 'When two high energy protons (এক ধরনের পরমাণু) meet, they are converted into an electrons and a positron. যদিও এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান করেছে যে বস্তুগুণহীন পরমাণু অক্ষয় (massless particles do not decay. Their infinite life times are due to the fact that there are no lighter particles into which they can decay.) তথাপি প্রমাণিত শাশ্বত সত্য হিসাবে

১) এই জন্য বিখ্যাত astropysicist নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ব্রায়ান যোশেকসন বিমশলণাত্মক বিজ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করে ধ্যানে আত্মমগ্ন হয়েছেন।

২) বর্তমান অব-আণবিক পর্যায়ে particleগুলির মধ্যে এই অস্থিরতার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

তা এখনও আমাদের হাতে আসেনি। হয়তো বিশ্লেষণী মনের সাহায্যে সেটাকে পাওয়া যাবেও না। কারণ এই ধরনের চিন্তা উপনিষদেও ছিল কিন্তু উপনিষদ তাকে বস্তুগ্রাহ্যতার ঊর্ধে তুলে, মহান করে, তবে সত্যের সন্ধান পেয়েছে। উপনিষদও এক সময় হবসের মত চিন্তা করেছিল যে, বস্তুর মধ্যেই আছে গতি এবং এই বস্তু ও গতিই জগত সৃষ্টির কারণ। কিন্তু তাতে রহস্যের তার আর সমাধান হয়নি। প্রাণ যদি বস্তু থেকেই এসে থাকে, তবু কিছুতেই তাকে বস্তু দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। তেমনি প্রাণ থেকে চেতনার বিকাশও সম্পূর্ণভাবে বোধগম্য নয়। তাই বস্তুগত ব্যাখ্যার দিকে না গিয়ে অনুভূতিজাত এক বোধের ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস করেছে উপনিষদ। যেমন উপনিষদেই আছে—'উহা পূর্ণ, ইহাও পূর্ণ। সেই পূর্ণ থেকেই পূর্ণের উৎপত্তি। এই পূর্ণ থেকে পূর্ণকে তুলে নিলে পূর্ণই থাকে। বস্তু ও গতি যদি অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার হয়, তবু গতির জন্য এইটুকুও অবশ্যই মনে করতে হবে যে, বস্তু ও গতির বাইরে আছে কোন স্থান যেখানে তা চলতে পারে। কারণ স্থান ছাড়া বস্তু কল্পনা করা যায় না। এবং সীমাছাড়া গতি কল্পনা করা যায় না।, ফলে 'দুই' অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে যায়। কিন্তু উপনিষদ কখনও দ্বৈত স্বীকার করেনি। সুতরাং উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা, তার পরব্রহ্মণ ও পরমাত্মনেরই মত একটা বাক্যাতীত ব্যাপার—অবাঙমানসগোচরম। বুদ্ধিবৃত্তিকে গভীর গহন এক অন্তরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সেই অনির্বচনীয়ের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে—এ-সবের কোন জবাবই কোনদিন পাওয়া যাবে না। সেই গভীর গহন অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছে যাকে বলা হয় যোগ—যে যোগের উদগাতা সম্ভবত আর্য নয় অনার্যরাই ছিলেন—আমার এ আলোচনার আরম্ভেই আমি সে কথা বলেছি। কিন্তু সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হবে আরো পরে। তার আগে আর একটি প্রশ্নেরও আলোচনা প্রয়োজন, অনুসন্ধিৎসু মানুষকে যে প্রশ্ন বিস্ময়বোধের প্রথম থেকেই সমান তালে ব্যাকুল করে তুলেছে। যদিও এ-সকল প্রশ্নের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই, কারণ-পরমাত্মন বা পরব্রহ্মণের স্বরূপ জানা গেলে সমস্ত প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যায়। তবুও আর্যচিন্তার ধারা এ ব্যাপারে কেমন ছিল,—সে কথাটা জানবার জন্যই সামান্য একটি আলোচনা। প্রশ্নটা হল ব্যক্তিসত্তাকে নিয়ে, সবই যদি পরব্রহ্মণ, সবই যদি পরমাত্মন, তাহলে ব্যক্তিসত্তার এই প্রকাশ বা বোধ কেন? এই ব্যক্তি সত্তার স্বরূপ তাহলে কি? ঈশ্বর সন্ধান করে এই ব্যক্তি-সত্তা। আবার ঈশ্বর বা ব্রহ্মণবোধের প্রধান অন্তরায়ও হল এই ব্যক্তিসত্তা। এটা কি?

উপনিষদ সমস্ত সীমিত বিষয়ের মধ্যে মানুষের ব্যক্তি-সত্তাকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছে। যদিও নিজে সে অসীম, তবু অসীমের অত্যন্ত নিকটে সে। কোথাও কোথাও উপনিষদে এই ব্যক্তিসত্তাকে মহাবিশ্বের একটা প্রতিচ্ছবি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সমস্ত সীমিত বিশ্বের মধ্যে রয়েছে অসীমে যাবার একটা প্রয়াস মাত্র। মানুষের মধ্যেও রয়েছে এই প্রয়াস। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে অগ্নি জল ও মৃত্তিকা দ্বারা জীবাত্মনের সৃষ্টি। কিন্তু এরই মধ্যে রয়েছে অসীমের এক অনুরণন।

সত্যের নানা বিন্দু এসে মিশেছে মানুষের মধ্যে। যেমন প্রাণ হল বায়ু,

মন আকাশ, এই ধরনের। এরই মধ্যে মিশেছে ঐশ্বরিক আনন্দময় চেতনা। এই আনন্দময় অনুভূতিতে এক অনির্বচনীয় মুহূর্তে সে অনন্তের স্বাদ অনুভব করে। সেই অনন্তই সীমিত আত্মা হয়ে দেহবন্ধনে আবদ্ধ।

মুণ্ডক উপনিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে ঃ এরা যেন দুটো পাখি একই ধরনের, পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। একই গাছে বসে আছে। একটু সুমিষ্ট ফল খাচ্ছে, আর একটি নিস্ক্রিয়। এই বিশ্ববৃক্ষে মানুষ বাস করছে ঈশ্বরেরই সঙ্গে। অকস্মাৎ কোন তিক্ত ফল খেয়ে ভক্ষণরত পাখি যখন যন্ত্রণায় কাতর হয়, নিজেকে অসহায় বোধ করে, সেই মুহূর্তে যখন নির্বিকার প্রশান্ত অপর পাখি তার নজরে পড়ে সেই প্রশান্তি লক্ষ্য করে তার দুঃখ যায়, চলে।' অর্থাৎ জীবাত্মা যখন অন্তরতম পরমাত্মার সুবিশাল স্নিগ্ধ প্রশান্তির সন্ধান পায়, তখন সে নিজের স্বরূপ বুঝতে পেরে সীমিত চেতনা হারিয়ে হয় তুরীয়। মানুষ যখন তার শুধুমাত্র প্রাণস্পন্দনে, তার মনের ক্রিয়ায়, তখন পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার স্বতন্ত্র সত্তা। কিন্তু যখন সে মহামানসে, তখন তার প্রশান্তি। যখন সে অবাঙ্মানসগোচরম আনন্দে তখন সে নিজেই অদ্বৈত সত্য। এ জন্যই উপনিষদে বলা হয়েছে 'যখন মানুষ আত্মস্বরূপের সন্ধান পায়,—তখন দুঃখই কি, আর বেদনাই বা কি! সবই আনন্দ।' এই আনন্দময় অদ্বৈত অনির্বচনীয়ের বাক্যে কোন ব্যাখ্যা চলে না।

কথায় এর ব্যাখ্যা চলে না বটে, তবে কতকগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করলে মানুষ নিজেই সেই আনন্দ স্বরূপ হতে পারে। সেই পদ্ধতিগুলোই হল কর্ম-পদ্ধতি। যেমন যে আকাঙ্ক্ষা সত্যের পথে পরিচালনা করে না, সেই আকাঙ্ক্ষার রেশ টেনে ধরতে হবে। আকাঙ্ক্ষার এ সত্যিকারের চরিত্র অনুধাবনের জন্য মানুষকে নিমগ্ন হতে হবে আত্মচিন্তাতে। আত্মচিন্তা থেকেই আসবে বোধ। সেই জন্যই কঠোপনিষদ বলেছে—'যার সত্যবোধ নেই, যে ব্যক্তি চিন্তাহীন এবং অপবিত্র, সে কখনই বস্তুর অতীত অমৃতলোকে পৌঁছুতে পারে না। পুনর্জন্মের বৃত্তে প্রবেশ করে। কিন্তু যাঁর বোধ আছে, যিনি চিন্তাশীল, এবং পবিত্র, তিনি সেই অবস্থাতে পৌঁছুতে পারেন, যেখান থেকে আর প্রত্যাবর্তন নেই।' [illegible]

মানুষকে চলতে হবে তার বিবেকের নির্দেশ অনুসরণ করে। কিন্তু যে বিচারবুদ্ধি ভ্রান্ত বিবেক উৎপাদন করে, সে বিবেকে হবে না, কারণ তা পশুর সহজাত প্রবৃত্তির মত। বিবেক হল তাই, যা মানুষকে নিঃস্বার্থ কর্মে প্রবৃত্ত করে। যা মানুষকে বুঝতে সাহায্য করবে যে, সমগ্র বাদ দিয়ে ব্যক্তির স্বার্থ বড় নয়। এই ব্যক্তি সেই সমগ্রেরই মধ্যে অবস্থিত মাত্র।

আত্মস্বার্থ ত্যাগও বড় জিনিষ। পাপ থেকে মুক্ত হতে গেলে আত্ম স্বার্থমুক্ত হতে হবে। কারণ তাই পাপ, যা অজ্ঞানতাকে রক্ষা করে। আত্ম অর্থাৎ ব্যক্তিগত আত্মচিন্তা মানুষকে বিশাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে, সত্য থেকে বিচ্যুত করে চলে তা পাপ। এই জন্য আত্মস্বার্থ ত্যাগ একটি বড় করণীয় কর্তব্য। পবিত্র ত্যাগই হল মোক্ষলাভের বড় উপায়। বস্তুত যিনি ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করেন, তিনিই বৃহৎকে লাভ করেন। দুঃখ বেদনা বলতে তার কিছু থাকে না। ঈশা উপনিষদ তাই বলেছে—'ত্যাগ করেই ভোগ করা যায়।

উপনিষদের মতে আন্তর পবিত্রতা বহিরাশ্রয়ী পবিত্রতা অপেক্ষা বড়। আন্তরিক পবিত্রতা এলেই মানুষ লোভ ত্যাগ করে, ঘৃণা ত্যাগ করে, চৌর্য ত্যাগ করে। উপনিষদ চৌর্য, হত্যা, লোভ প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করতে বলেছে। বলেছে—'ঘৃণা কোর না, ক্রোধ, লোভ ও ঈর্ষার বশবর্তী হয়ো না।' উপনিষদের মতে আত্মানুভব (অহংবোধ সম্পন্ন আত্মা নয়) আসে ভালবাসার মাধ্যমে। ভালবাসাই মনকে করতে পারে উদার, বিস্তৃত। এবং এই ভালবাসার অনুশীলনে মনের মধ্যে এমন বিশাল এক স্নিগ্ধতা জন্মলাভ করে যে, তাইই অনন্তস্বরূপে নিয়ে যায়। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, পুত্রের প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি যদি তাদের অন্তরের অভ্যন্তরস্থ অসীমের জন্য হয় তাহলে সে ভালবাসাও ক্ষুদ্র সীমাতে আবদ্ধ করে না কাউকে। ভালবাসা এমন এক কল্যাণধর্মী দ্যোতনা সৃষ্টি করে ভিতরে যে, তা অন্তরকে প্রসারিত করে দিয়ে দান করে অনন্ত-সান্নিধ্য। আর এই অনন্ত স্বরূপকে ভালবাসাই হল প্রকৃত ভালবাসা। ঈশ্বরকে ভালবাসার মূল্য সেই ভালবাসা নিজেই।[1]

নিরাসক্তিও বড় জিনিষ। সকলের জন্য আসক্তি, সকলের অভ্যন্তরের অনন্তের জন্য আসক্তিই হল প্রকৃত নিরাসক্তি।

পাশব কাম (ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা) উপনিষদের কাছে নিন্দনীয়। বহির্বিশ্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষাও দোষণীয়। কিন্তু সত্যের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি যে কাম তাই মূল লক্ষ্য। মানুষ যদি বিপরীত লিঙ্গের দেহ কামনা করে তবে সে হয় দুষ্ট চরিত্র। যদি সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে তখন হয় শিল্পী; ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করলে তখন হয় ঋষি। অবশ্য পিতৃ মাতৃ শ্রদ্ধা বা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা (সত্যবানের প্রতি সাবিত্রী) দোষণীয় নয়।

তপস্যাকেও উপনিষদ করণীয় কর্তব্য হিসাবে ধরেছে। অবশ্য এই তপস্যার অর্থ এই নয় যে উর্ধবাহু হয়ে দেহকে কষ্ট দিতে হবে এই তপস্যার অর্থ হল আত্মশক্তির প্রকাশে ব্যক্তিকে সাহায্য করা। তপস্যার কঠোরতা দেখা দিয়েছে অথর্ববেদ সংহিতার সময় থেকে। এই সময় থেকেই দেহকে নিয়ন্ত্রিত করে দেহোত্তরে পৌঁছুবার চেষ্টা প্রবল। যোগ যদিও কৃচ্ছ্রসাধনা নয়, তথাপি তার ইঙ্গিত আছে এখানেই। আর এই যোগের মাধ্যমেই দেহ থেকে দেহাতীত অনুভব করা সম্ভব। সুতরাং পূর্বেই যে বলেছি অনার্য সাধনার উত্তরাধিকার আছে আর্য সাধনায় তা সত্য।

দান, আর্জবম (সঠিক কর্ম) অহিংসা, সত্যবচন এবং অনাসক্তি (ব্যক্তি স্বার্থের প্রতি আকর্ষণের অভাব) এ-সবও অনুকরণীয় কর্তব্যের মর্যাদা লাভ করেছে উপনিষদে। আর সেই সঙ্গে বিশ্বাস। তাই তো নারায়ণীয় উপনিষদ বলেছে—'শ্রদ্ধা তপঃ' অর্থাৎ বিশ্বাসই হল তপস্যা।

সত্যকে লাভের জন্য কল্যাণকে লাভের জন্য, শুধু মাত্র মানসিক প্রস্তুতিই সৃষ্টি নয়। চাই দৈহিক প্রস্তুতিও। উপনিষদ তাই বলেছে পরিচ্ছন্নতার কথা, উপবাসের কথা, ইন্দ্রিয় জয়ের কথা, নির্জনতার কথা। দেহ যদি শুদ্ধ না হয় তাহলে তা বন্ধন হিসেবে আচ্ছন্ন করে রাখে অভ্যন্তরের পরমাত্মনকে। সত্যকে, পরব্রহ্মণকে লাভ করতে হলে চাই দেহশুদ্ধি।

১) বাইবেলে যিশু খ্রীষ্ট এই ধরনের ভালবাসার কথাই ব্যক্ত করেছেন।

তাইতো তৈত্তিরীয় উপনিষদ প্রার্থনা করেছে—'আমার দেহ উপযুক্ত হোক, আমার রসনা মধুর হোক, আমার শ্রুতি সূক্ষ্ম হোক'। কিন্তু দেহকে শুদ্ধ করার জন্য দেহকে কষ্ট দেওয়া বলতে যা বোঝায়—তা চায়নি কখনও উপনিষদ। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেছে, পরব্রহ্মণ তাদেরই জন্য যাঁরা ব্রহ্মচর্য পালন করেন। কিন্তু এ ব্রহ্মচর্য বলতে সংসার ত্যাগ বোঝায় না। গুরুগৃহে শিক্ষা লাভ করবার সময় যে প্রস্তুতি, তাকেই বলে ব্রহ্মচর্য। এর অর্থ নয় গার্হস্থ্য ধর্মকে অস্বীকার করা। জীবন পলাতক হতেও বলেনি কখনো উপনিষদ। ঈশা উপনিষদে তাই বলা হয়েছে 'একমাত্র কর্মের জন্য লোকে শতায়ু কামনা করতে পারে'। পার্থিব জগতকে বিষবৎ পরিত্যাগ করতে বলা হয় নি কোথাও, শুধু এইটুকু বলা হয়েছে যে, এই বস্তু জগতটাকে কেউ যেন না ভাবেন পৃথক একটা সত্তা। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যের ঊর্ধ্বেই সন্ধান করতে হবে অতীন্দ্রিয়ের।

উপনিষৎ সত্যানুভবের জন্য নৈতিক যে সব দায়িত্ব পালনের কথা বলেছে—দিব্য-জীবনের সহায়ক হতে পারে সেগুলিই! ইন্দ্রিয়শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে[১] অন্তরতর জগতের নির্দেশে উঠতে হবে স্বার্থপর ব্যক্তিসত্তার উর্ধে। সংযম, উদারতা ও দয়াকে এই জন্যই দেখানো হয়েছে বড় করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ধ্যান, দাক্ষিণ্য, যথার্থ কর্ম, অহিংসা ও সত্যবাদিতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে আহারেও বলা হয়েছে সুনির্বাচনের কথা, সেখানে লোভাতুর হিংসা থাকবে না, থাকবে না অযথা উত্তেজনা। স্নিগ্ধ আহারই মনকে করতে পারে স্নিগ্ধ ও শান্ত। সে জন্যই বলা হয়েছে-'আহার শুদ্ধৌ সত্যশুদ্ধি।'[২] তপের দ্বারা বলপূর্বক ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করার চাইতে মহতের স্পর্শানন্দে ক্ষুদ্রকে পরিত্যাগ করাই হল বড় কথা। যৌগিক পদ্ধতির মাধ্যমে আছে চিত্ত সংযোগ ও গভীরভাবে চিন্তার কথা।[৩] কঠোপনিষদে আছে-'বাক্যকে মনের মধ্যে, এবং মনকে বুদ্ধির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করাতে হবে।' তাকাতে হবে অন্তরের অন্তঃস্থলে সেই ঈশ্বর সাযুজ্য লাভের জন্য। কোন কিছু প্রত্যাশা থাকবে না-থাকবে শুধু সেই পরব্রহ্মণ হবার চেষ্টা। চতুরাশ্রমের অর্থই হল সংসারকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার না করা, আবার স্বীকারও না করা। কিন্তু ক্রমশ আত্মস্বার্থের উর্ধে এক পরম পবিত্র জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পবিত্রতা ও বিনয় অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন এ-জন্য।

সাধু সন্ত বা সন্ন্যাসী হিসেবে গৃহত্যাগী ও সমাজ পলাতকের মূল্য কি? কিংবা জীবনে ব্যর্থ হয়ে সন্ন্যাসী হবারও মূল্য নেই। তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী যাঁর আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আধ্যাত্মিক দর্শন মানুষের জন্যই উৎসর্গীকৃত। জীবনের সমস্ত শুভই অহংবোধের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। সামাজিক অনুশাসনের মূল লক্ষ্যই হল আত্মবিকাশে, যে বিকাশ সহায়ক হবে

১) ইচ্ছাশক্তি বা বিশ্লেষী মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। কূল কুণ্ডলিনীর উত্থান হতে আপনা আপনিই ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত হয়।

২) তবে লেখক মনে করেন যে খাদ্য দেহকে সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজনা তাই যথার্থ আহার। এখানে আংশিক আহারও অধ্যাত্ম সাধনার বিরুদ্ধে নয়।

৩) বাস্তব সহজ যোগে দেখা যায় কোন কিছু চিন্তা না করে মনকে দিগন্তের দিকে ঠেলে দিয়ে স্বাধীন ভাবে চলতে দিলে মনসংযোগ অপেক্ষাও বড় বল পাওয়া যায়।

আত্মনের স্বরূপ অনুধাবনে। ব্রাহ্মণ সম্পর্কে তাই বলা হয়েছে, পরমত্মানকে জানবার পর ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করতে হবে উত্তরাধিকারের জন্য, সঞ্চয়ের জন্য পার্থিব সমৃদ্ধির জন্য সকল আকাঙ্ক্ষা। পরিব্রাজকের ভূমিকা নিতে হবে তাঁকে।

পরমাত্মনের জ্ঞান হলে সংসার অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় বটে, তাই বলে অন্যায় কিছু নয়। সংসারের আশ্রমধর্ম সেই পরমাত্মনকে জানবার জন্য কয়েকটি ধাপ মাত্র। তাই সংসারকে ঘৃণা না করে বিবাহিত জীবনের গুণগান করা হয়েছে উপনিষদে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের মতে, কঠোর সংযমের জীবন হল বিবাহিত জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুতি। বিবাহ হল ধর্মীয় ঘটনা, এক ধরনের ঈশ্বর-সাধনা। এই জন্যই কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানই পরিপূর্ণ নয় যদি না তাতে থাকে স্ত্রীর কোন অংশ।

উপনিষদের মূল লক্ষ্য জ্ঞান। শুধুমাত্র কতকগুলি নৈতিক কর্তব্য পালনই নয়। কিন্তু এই নৈতিক কর্তব্যগুলি হল জ্ঞানেরই অনুসঙ্গ। এই দায়িত্বগুলি নির্দেশ অনুযায়ী পালন করা হলে অন্ধকার দূর হবার পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু এর যে উপযোগিতা কি, এই নৈতিক দায়িত্বগুলি পালন করে যিনি সে সম্পর্কে অবহিত না হয়েছেন, তাকে তা বুঝিয়ে বলা যাবে না। যদি সমস্ত নৈতিক দায়িত্ব যথাযথ পালন করা যায় মনকে তা এমন স্নিগ্ধ ব্যাপ্তিতে ভরে তুলে যে-ব্রহ্মণ তখন খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। কেউ যদি শুধুমাত্র নিজের অন্তরে বিশ্বজনের জন্য ভালবাসার আলো জ্বালতে পারে, তাহলে সে নিজেই দেখতে পাবে যে, এক অতীন্দ্রিয় আনন্দময় জগতের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে সে। বিনয় যে কী অপার স্নিগ্ধতা, বিনয়ী ছাড়া কেউ বুঝবেন না। সুতরাং উপনিষদের নৈতিকতা আত্মস্বরূপ সন্ধানের অপরিহার্য পাথেয়। মুনডক উপনিষদে বলা হয়েছে-'সত্য জ্ঞান শুধুমাত্র শাস্ত্রজ্ঞানে ধরেনা, বা বেশী পড়াশুনা দ্বারাই হয়না' সম্যক জ্ঞানের জন্য চাই সত্য জীবন, ধর্মীয় জীবন। এই জন্যই আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের আগে উপনিষদের ঋষিরা নৈতিক শৃঙ্খলা অর্জনের উপর জোর দিতেন বেশী। প্রশ্ন উপনিষদের শিপ্পলাদ তাঁর শিষ্যদের নৈতিক শৃঙ্খলার উপর জোর দিয়েছিলেন আগে। ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকাম জাবালকে তাঁর গুরু গভীর অরণ্যে গো-চারণে পাঠিয়েছিলেন-শুধুমাত্র নির্জনতার স্বাদ বোঝাবার জন্য, প্রকৃতির মহান ব্যাপ্তির সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য। যিনি দুষ্ট কার্য থেকে মুক্ত নন, যিনি স্থিতধী হতে পারেন নি, যাঁর হৃদয়ে শান্তি নেই,—তাঁর পক্ষে পরমাত্মনের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর।

কিন্তু নৈতিক দায়িত্বকে প্রাণহীন যান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি বলে ধরে নিলে নৈতিকতার অর্থই যাবে হারিয়ে। যেমন নৈতিক কর্তব্য দ্বারা কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্টই বলা হয়েছে-'যদি সেই পরমাত্মন সম্পর্কে অবহিত না হয়ে কেউ পুণ্য কাজও করেন, শেষ পর্যন্ত তা ক্ষয় প্রাপ্ত হবে। যখন পরমাত্মনকেই সত্য স্বরূপ জেনে কেউ পূজা করবেন, তখনই তিনি অধিকারী হবেন অক্ষয় স্বর্গের। কারণ যিনি যা আকাঙ্ক্ষা করেন তা এই পরমাত্মনের কাছ থেকেই লাভ করেন।' বৃহদারণ্যকের এই উক্তির অর্থ হল, কর্ম করলেই হবে না, সজ্ঞানে করতে হবে। কিন্তু

কতকগুলো কর্ম আছে যা নিজেরাই জ্ঞান স্বরূপ। যেমন ভালবাসা। হৃদয় উন্মোচিত করে দিয়ে কেউ যদি ভালবাসতে পারে তাহলে সেই ভালবাসাই তাকে দেবে পরমাত্মনের সন্ধান। এ-বাদে যে কোন ধরনের আনুষ্ঠানিক ধর্মানুষ্ঠানই অধ্যাত্মজীবনের উদ্দেশ্য মোটেই সিদ্ধ করতে পারে না। এই জন্যই অনুষ্ঠানসর্বস্ব যজ্ঞানুষ্ঠানের নিন্দা করেছে উপনিষদ। দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক নিয়েও পূজা করতে বারণ করেছে। কারণ এটা অর্থহীন পূজা। সেই আনন্দস্বরূপ কিছু দেন না,-প্রকৃত পূজারী সেই অনন্ত আনন্দসমুদ্রে হারিয়ে যান মাত্র। জ্ঞান ও কর্ম এই দুয়ের সাহায্যেই সেই আনন্দ সাগরে গিয়ে নিমজ্জিত হওয়া যায়। জ্ঞানের দ্বরা স্বরূপ অনুধাবন করে কর্মের দ্বারা সেখানে প্রবেশ করতে হবে। শুধুমাত্র জ্ঞানের দ্বারা বা কর্মের দ্বারা হবেনা। তাইতো বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে-'সেই অদৃশ্য স্পর্শাতীত, অনির্বচনীয়, অকল্পনীয় এর মধ্যে পূজারী যখন তাঁর স্থান খুঁজে পান-তখনই তিনি শান্তি লাভ করেন। কিন্তু যদি এই সম্পর্কে থাকে বিরতি, বিচ্ছেদ তাহলেই থাকে অশান্তি। এই অশান্তি বিশেষ করে তাঁদের যাঁরা নিজেদের জ্ঞানী বলে মনে করেন যিনি নৈতিক কর্ম করেন না। যেমন, নৈতিক কর্মের মধ্যে একটি হল বিনয়; কিন্তু যিনি জ্ঞান চর্চা করেন অথচ বিনয় চর্চা করেন না, তিনি প্রকৃত জ্ঞানী নন। এবং তখনই তিনি নিজেকে জ্ঞানী বলে জাহির করেন। প্রকৃত জ্ঞানী সর্বদাই বিনয়ী হন বলে-'কিছুই জানিনা আমি এই মাত্র জানি' এই ধরনের কথা বলেন। এই কথা বলেছিলেন সক্রেটিস। জ্ঞানের সামান্য আলো পেয়ে নিউটন বলেছিলেন, 'আমি কিছুই জানি না, জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়িয়েছি মাত্র।'

জ্ঞানী যখন নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত হন, তখন তিনি হন ধার্মিক। উপনিষদ তাই শুধুমাত্র জ্ঞান-সাধনা নয়। এটা বস্তুত পক্ষে একটা অধ্যাত্ম সাধনা, ঈশ্বর সন্ধানের প্রকৃষ্ট পন্থা। এবং এই পথে সর্বোচ্চকে লাভ করা সম্ভব হলে তখন ভাল মন্দ আর কোন কিছুরই বিচার থাকে না। নৈতিকতা হল কাষ্ঠ, অগ্নি জ্ঞান। অগ্নি কাষ্ঠকে আশ্রয় করেই থাকে কিন্তু যখন কাষ্ঠ পুড়ে শেষ হয়, তখন অগ্নিও থাকে না, কাষ্ঠও থাকে না। থাকে ভস্ম। এই ভস্ম হল ঈশ্বর। ঈশ্বরে উপনীত হলে তখন কাষ্ঠ ও অগ্নি কিছুই থাকে না। তাইতো কৌশীতকি উপনিষদে বলা হয়েছে- 'অনুভব যেমন বুদ্ধিবৃত্তিকে অতিক্রম করে যায়, তেমনই ধর্মীয় জীবন পাপ-পুণ্যের সীমানা পেরিয়ে যায়। এবং তখনই সেই মুক্ত আত্মাকে তৈত্তিরীয় উপনিষদের মতে, এই ধরনের চিন্তায় ক্লান্ত করতে পারে না যে, কেনই বা আমি ভাল কাজ করিনি, কেনই বা আমি পাপ কাজ করেছি। তিনি তখন যে অদ্ভুত আনন্দে উপস্থিত হন তা পাপ-পুণ্যের অতীত। কি করা হল, বা কি করা হল না তা নিয়ে তাঁর কোন যন্ত্রণা নেই। সেই আনন্দময় জগত কোন ক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত নয়।

এই যে নৈতিকতা ও জ্ঞানের সংমিশ্রণে উপনিষদে ধর্মীয় জীবনের কল্পনা, সেই ধর্মীয় জীবনের স্বরূপ উপনিষদকারদের কাছে কি ধরনের ছিল? ঈশ্বর সন্ধানে উপনিষদকারদের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সেই অধ্যাত্ম জীবন-চেতনা সম্পর্কেও জানা নিতান্ত প্রয়োজন।

উপনিষদের মধ্যে অধ্যাত্মতা হল মুলত জীবনের এক অভিজ্ঞতার ব্যাপার। এবং এই অধ্যাত্ম জীবনের জন্য তিনটি স্তর মানুষকে অনুসরণ করতেই হবে। যেমন-শ্রবণ (গুরুর উপদেশ শ্রবণ করা) মনন, (চিন্তা) এবং নিদিধ্যাসন (চিন্তামূলক জ্ঞান)। শ্রবণের এক বিশেষ মূল্য উপনিষদের জীবনে। তাইতো বলা হয়েছে যে-'তারা ধন্য যারা না দেখেও বিশ্বাস করেছে।' কিন্তু তাই বলে শুধুমাত্র শ্রবণের উপর বিশ্বাস কবে থাকলেই আধ্যাত্ম সাধনা সিদ্ধ হবে না। গুরুর উপদেশ বা ঐতিহ্যবাহিত সত্যকে কঠোর মনন দ্বারা বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। এই যে মনন দ্বারা অনুধাবন সেটা জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়।

একটা জিনিসকে বুঝলেই যে তার সত্যতা-অনুধাবন করা গেল, তা নয়। তার অন্তর্নিহিত সত্যের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে হবে। সেই উপলব্ধির জন্য বিচার বুদ্ধিরও উর্ধে এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। এই ক্ষেত্রেই নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন। এই নিবিড় ধ্যান মানুষের যুক্তিগ্রাহ্য ধারণাকে একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা দর্শনের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে, এবং এটা হলে তবেই ধর্ম-জীবনের সার্থকতা। বিচার বিশ্লেষণের বোধ নিদিধ্যাসন দ্বারা হয় অনুভূতি। অনুভূতি মানেই একাত্মতা। এবং এই একাত্মতাই হল পরমাত্মন-সাধনের সর্বশেষ পর্যায়। কিন্তু নিদিধ্যাসনকে সম্মোহ লাভ বা মুর্ছালাভের পথ বলে মনে করলে বিরাট ভুল হবে। উপনিষদ এ-ধরনের অবস্থাকে সব সময়ই নিন্দা করেছে। নিদিধ্যাসনের অর্থ হল লক্ষ্যে মনস্থির করা। মনের বিক্ষিপ্ততাকে এই নির্দিধ্যাসনই কেন্দ্রীভূত করে। এবং মন কেন্দ্রীভূত হলেই লক্ষ্য ভেদ করে সেই পরমাত্মনের সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব। বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা ধারণা হলে নিদিধ্যাসনের দ্বারা সে মহানুভূতি তৈরি হয় তারই সাহায্যে পূর্ণের মধ্যে অবগাহণ সম্ভব। পূজাব উপলক্ষ্য তখন আত্মচেতনার সঙ্গে এক হয়ে যায়। রাধা যেমন কৃষ্ণময় হয়েছিলেন, সেই রকম। কিন্তু উপনিষদ পূজাব উপলক্ষ্য হিসাবে কোন সীমিত দেবদেবীর বৃহত্তম আত্মনের পর্যায়ে তুলতে পারলে তবেই পূজার সার্থকতা। উপলক্ষ্য সীমিত হলে অসীমের স্বাদলাভ করা সম্ভব নয়।

উপনিষদের ধর্ম তাই কোন সীমায় সাধনা নয়, দ্বৈতের সাধনা নয়। উপনিষদের অভীষ্ট হল মানুষের সত্তাকে উত্তরণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। এটা বিশেষ রকম একটা পূজার পদ্ধতি বা নৈতিক-শৃঙ্খলা নয়, ধর্মীয় গোঁড়ামীও নয়। ঈশ্বরকে স্রষ্টা হিসেবে সীমিত করবার চেষ্টা নেই। স্রষ্টা মানেই সৃষ্টি করেন, বাইরে কোথাও, তাতে তার সীমাবদ্ধতা এসে যায়। ঈশ্বরকে একটা স্বাধীন ইচ্ছার উৎস হিসেবেও দেখেনি সে। কারণ সেক্ষেত্রে তিনি যা-কিছু করার অধিকারী হয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। কিন্তু অপর দিকে যদি প্রকৃতির নিয়মের দাস হয়ে পড়ি আমরা, বা কর্মফলই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে তাহলেও তিনি ছোট হয়ে যান। উপনিষদে ঈশ্বরের চিন্তা কোন তুলনার বাইরে। নিদিধ্যাসন সেই অতুলনীয়, অকল্পনীয় ও অনির্বচনীয়তে নিয়ে যাবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

উপনিষদেব ধর্ম নিদিধ্যাসন ও নৈতিকতার পর ঈশ্বরের যথার্থ

সত্যরূপের সাধনা। সেই জন্যই সাধারণত অধ্যাত্ম বলতে যে গোঁড়ামী ও অত্যাশ্চর্য ব্যাপার প্রতীয়মান, উপনিষদে তা নেই। উপনিষদের যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি, তা-হল আধ্যাত্মিক চেতনার উদ্বুদ্ধ। উপনিষদের ধ্যান হল আধ্যাত্মিক ভক্তি। ঈশ্বর এখানে পিতা, বন্ধু, সহায়ক, স্রষ্টা, বিশ্ববিধাতা; তিনি পুরুষোত্তম; কিন্তু তিনি বাইরে কোথাও থেকে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন না। তিনি আছেন সবারই মধ্যে অন্তর্যামী হয়ে। তাঁরই মধ্যে সব, আবার তিনিও সকলেরই মধ্যে। যেমন সূর্য। সূর্যের আলোর নিচেই শিশির বিন্দু, শিশির বিন্দুর উৎসও সূর্য। আবার এই সূর্য প্রত্যেকটি শিশির বিন্দুর মধ্যেই প্রতিবিম্বিত।

উপনিষদের পরমাত্ম কল্পনা বুদ্ধির সীমানার মধ্যে কল্পনার অতীত। অথচ সাধনায় তাঁর একটা প্রকাশ না হলে কখনই চলে না। তাই অনন্ত হয়েও তিনি ব্যক্তিরূপে ধরা দিয়েছেন। কিন্তু উপনিষদ তাঁর এই ব্যক্তিরূপকে কখনই সীমার মধ্যে দেখে নি। তার কাছে অনন্ত এবং ঈশ্বর এক। আমরা তাঁকে পরব্রহ্মণ বলি তাঁর সীমাতোরতা বোঝাতে, তাঁর দুজ্ঞেয়তা বোঝাতে, তাঁর সার্বিক বিস্তার বোঝাতে। আবার ধর্মীয় ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই তাঁকে কল্পনা করি ঈশ্বর রূপে। সেইজন্য যিনিই পরব্রহ্মণ, তিনিই মূর্তি হতে পারেন। শঙ্করাচার্য তাই বলেছেন-'সালগ্রাম ইভ বিষ্ণোঃ।' এই মূর্তি এবং পরব্রহ্মণ এক। অনন্তই ব্যক্তিরূপ, অনন্তই অনন্ত- সেইজন্য শঙ্করাচার্য বলেছেন-'মূর্তামূর্তম।' .

পরমাত্মনকে বা ব্রহ্মণকে বুঝতে হলেও অনুরাগ ছাড়া শুধুমাত্র বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা তা হয় না। সেইজনই অমূর্ত ধরা দিয়েছেন মূর্ত হয়ে। কিন্তু জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা নিয়ে সেই মূর্তিকে পূজা করলে মূর্তই আবার অমূর্ত হয়ে যায়। পূজার জন্য, আরাধনার জন্য ঈশ্বরের একটা কল্পনা চাই-যাঁর উপর নির্ভর করা যায়; বিশ্বাস করা যায় যে, জ্ঞান ভক্তির নিকট একদিন তিনি প্রকাশিত হবেন। তাইতো মুনডক উপনিষদ বলেছে-'এই পরমাত্মনকে অধ্যয়ণ, বিচার বা প্রচুর জ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায় না। যাঁর মধ্যে তিনি প্রকাশিত হতে চান শুধুমাত্র তিনিই তাঁর প্রকাশ অনুভব করেন।' এই ধরনের চিন্তাই পূজাজাতীয় চিন্তা। কিন্তু উপনিষদের পূজা জ্ঞান ভক্তি আরাধনার এক অপূর্ব সমন্বয়। সেটুকু না বুঝতে পারলে উপনিষদীয় জীবনের স্বরূপ বোঝা যাবে না।

যে পূজার মধ্যে দ্বৈত আছে সে পূজা উপনিষদের নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ব্যক্তির মধ্যে তার প্রকাশ-এ হল এক ধরনের দ্বৈত ভাব। আসল সত্য হল মানুষ এবং ঈশ্বর এক। এই বোধের জন্যই চাই অনুশীলন ও চর্চা। নিদিধ্যাসন সে উদ্দেশ্যই পূর্ণ করে। আত্মসমহিত ধর্মের ভাব যত বৃদ্ধি পাবে ততই আমরা উচ্চকোটির অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ করতে পারব। ততই আমরা প্রচলিত পূজা পদ্ধতি পরিত্যাগ করে অন্তরের মধ্যে পূর্ণতার স্বাদ অনুভব করব। এইভাবে উপনিষদের যে অধ্যাত্মজীবনের কল্পনা সেই কল্পনারও উর্ধে উঠা সম্ভব।

ভীতি থেকেই অধ্যাত্মচিন্তার উদ্ভব। কিন্তু অধ্যাত্মচিন্তার পথ এগিয়ে যায়, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে অনন্ত সান্নিধ্যে, এবং শেষ পর্যন্ত তা

তৃরীয়তে গিয়ে-চূড়ান্ত সিদ্ধি লাভ করে-সেখানে মানুষ ও ঈশ্বর পরস্পরের মধ্যে বিগলিত হয়ে যায়। কিন্তু যতক্ষণ না এই তৃরীয় পর্যায়ে গিয়ে সত্তা পরমাত্মনের সঙ্গে মিলিত হচ্চে ততক্ষণ কর্ম ও জীবনের আবশ্যকতা অপরিহার্য।

যাঁরা উচ্চ মার্গে বিচরণ করতে পারেন না, তারা অধ্যাত্মজীবনে সীমিতের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? উপনিষদকারেরা যে এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অচেতন ছিলেন, তা নয়। কিন্তু সীমাবদ্ধতা দেখে তাঁরা ক্ষান্ত হননি, তাকে অসীমের দিকে পরিচালিত করবার চেষ্টা করেছেন। তাই সীমিত আরাধনা তাঁদের কাছে পূর্ণ অধ্যাত্মজীবনের ক্ষেত্রে একটা পদক্ষেপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কোন কিছুকেই পূজা না করার চাইতে সীমিতকে পূজা করাও ভাল। তাতে পূর্ণ সত্যের পরিচয় না থাকতে পারে, কিন্তু সত্যহীনতা অপেক্ষা অর্ধসত্যও ভাল। কারণ তা পূর্ণেরই অংশ মাত্র। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে-'কেউ যদি পরব্রহ্মণকে নির্ভরস্থল হিসেবে পূজা করতে চান করুন, তিনি নির্ভরতা লাভ করবেন। কেউ যদি মহত্ব হিসেবে পরপ্রহ্মণের পূজা করতে চান, তিনি মহৎ হবেন। কেউ যদি মহামানস হিসেবে পরব্রহ্মণপূজা করেন তিনি মানসের সঙ্গে একাত্ম হবেন। আবার কেউ যদি পরব্রহ্মণকে পরব্রহ্মণ হিসেবেই আরাধনা করে তিনি পরব্রহ্মণত্বই প্রাপ্ত হবেন।' ঈশ্বরকে যে যেরূপে সাধনা করে সেইরূপেই লাভ করে। এতে পূর্ণতার প্রসাদ লাভ করা না গেলেও আংশিক শক্তি লাভ করা যায়। যদিও পরমাত্মনের স্বরূপ অনুধাবন ছাড়া ধর্ম-চিন্তার কোন সুস্থ পরিণতি নেই। এ জন্যই বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেছে-'কেউ যদি কোন দেবতাকে পূজা করে ভাবেন যে, তিনি এবং দেবতা পৃথক, তাহলে তিনি সত্য কাকে বলে জানেন না।' সীমার মধ্যে অসীমকে ফুটাতে হবে এবং নিজেকে সেই অসীমের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, তবেই অধ্যাত্মজীবন যাপনের সার্থকতা। উপনিষদ সেই অনন্ত অসীম পরমাত্মন বা পরব্রহ্মণ ছাড়া তৃপ্ত নয়।

সাধারণ-জীবন নিয়েই মানুষ তৃপ্ত থাকতে পারে। প্রকৃতির ধর্ম অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করতে পারে। কিন্তু তা না করে মানুষ কেন অধ্যাত্মজীবনের দিকে আকৃষ্ট হয়? এর একটা প্রধান কারণ মৃত্যু, আর একটা কারণ দুঃখ, যন্ত্রনা। আমাদের এ সীমিত জীবনের মধ্যেও একটা আনন্দ আছে, তাই আমরা কেউ মরতে চাই না। মৃত্যুকে বড় ভয় পাই। কিন্তু তবু মরতেই হয়। তাই এই মৃত্যুর পরও আর কিছু আছে কিনা সে-কথাটা জানবার জন্যই মানুষের সত্য সন্ধান। সত্য সন্ধানের প্রথম পর্যায়ে ছিল জীবনের ঊর্ধে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী কোন দেবতার কল্পনা। কিন্তু সেই কল্পনা বুদ্ধিবৃত্তিকে তৃপ্তি দিতে পারেনি বলেই এসেছে সর্বেশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদ ইত্যাদি। অবশেষে অন্তরের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে পরমাত্মন। এ ব্যক্তি-জীবনের শেষে মানুষ কি সেই পরমাত্মনে মিশে যায়? এই জগতের আনন্দের মধ্যেও আছে দুঃখ বেদনা, যন্ত্রনা। মৃত্যুর পরে কি সেই যন্ত্রনা নিঃশেষিত হয়ে যায়? এই পরমাত্মনে যখন আমরা মিশে যাই তখন কি কোন স্বতন্ত্র সত্তা থাকে? যদি না থেকে তাহলে আমাদের কি হয়? আমাদের অস্তিত্ব কি বিলীন হয়ে যায় মহাশূন্যে? এই সব প্রশ্ন থেকেই আধ্যাত্মজীবন।

উপনিষদের যে আধ্যাত্মজীবন, সেই আধ্যাত্মজীবনের লক্ষ্যে উপনিষদকারেরা কি রেখেছেন? কিসের জন্য এই আধ্যাত্ম সাধনা। তাঁরা কি পেতে চান? এই সব প্রশ্নের জবাবই হচ্ছে আধ্যাত্মজীবনের সুস্থ পরিণতি।

উপনিষদ মৃত্যুর পরে আত্মা অসীম শূন্যে, অর্থহীনতার মধ্যে বিলীন হয়ে যায় এ-ধরনের চিন্তাকে কখনও প্রশ্রয় দেয় না। মৃত্যু মানেই মহাশূন্যতা নয়। সীমিত জীবন থেকে অনন্ত জীবনের মধ্যে মিশে যাওয়া। মুন্ডক উপনিষদে তাই বলা হয়েছে-'স্রোতস্বিনী যেমন নাম ও আকৃতি হারিয়ে সমুদ্রে মিশে যায়, তেমনই জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত্যুর পর নাম আকৃতি মুক্ত হয়ে সেই সকলের অতীত ঐশ্বরিক সত্তার মধ্যে মিশে যান।' কিন্তু মৃত্যুর পর ব্যক্তিসত্তার স্বতন্ত্র কোন চিন্তাধারা বা অস্তিত্ববোধ থাকে না। এবং সে-ধরনের কোন অমৃতত্ব লাভ করা কখনই সম্ভব নয়।

প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে রয়েছে সত্যরূপী অনন্ত। মানুষের সীমিত দেহের শেষে সেই আচ্ছাদিত অসীম অসীমেরই অঙ্গীভূত হয়ে যায়। যে আধ্যাত্মিক মূল্য আমরা পৃথিবীতে আশা করি অথচ পরিপূর্ণভাবে পাই না, সেই পরিপূর্ণ আধ্যাত্মতা আমরা পাই যখন পরমাত্মনের মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করি। উপনিষদের মতে মৃত্যুর পরে জীবনসমুদ্রের তরঙ্গাহত হয়ে নির্মম মরুভূমির উপকূলে ছিটকে পড়বে না। আধ্যাত্মজীবনের সার্থকতা লাভ হলে আমরা দেহাবসানের পর লাভ করব পরিপূর্ণ বিকাশ। কেউ যদি মনে করেন যে পরব্রহ্মণ হল অনস্তি। তাহলে জ্ঞানের দ্বারা আহরিত এ বোধের জন্য মৃত্যুর পর তিনি তার ব্যক্তিসত্তার ধ্বংস আশা করতে পারেন। কিন্তু উপনিষদ পরমাত্মার এই ধরনের অবলুপ্তিতে বিশ্বাসী নয়। উপনিষদের মতে আধ্যাত্মসাধনার সার্থকতা মানুষকে নিয়ে যায় তুরীয় অবস্থাতে, আনন্দমে। আনন্দস্বরূপ একটা বোধ মাত্র, তার ব্যাখ্যা চলে না। উপনিষদও স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। এতে কারো ধারণা হয়েছে মুক্তি মানে ঈশ্বর প্রতিমতা, আবার কারো মতে ঈশ্বরে একাত্মতা। তবে সমগ্র উপনিষদের শিক্ষাতে একত্বের কথাই গুরুত্ব পেয়েছে সর্বত্র। মুনডক উপনিষদ মানুষের অভীষ্ট হিসাবে লক্ষ্য রেখেছে পরব্রহ্ম। তাই বলেছে—'প্রণব হল ধনু। আত্মা হল শায়ক। পরব্রহ্মণ হল লক্ষ্য। আত্মস্থ ব্যক্তি এতে শর সংযোজনা করবেন। যিনি শর নিক্ষেপ করবেন, শরের মত তিনিও একাত্ম হবেন লক্ষ্যের সঙ্গে, অর্থাৎ পরব্রহ্মণের সঙ্গে।' পরমাত্ম পরব্রহ্মময় হবে—শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। মুনডক উপনিষদ বলেছে—'এসবই সেই সর্বোচ্চ অক্ষয় পরব্রহ্মণের সঙ্গে এক হয়ে যাবে'—সর্ব একীভবন্তি। প্রশ্ন উপনিষদ বলেছে—'সার্থক আধ্যাত্ম জীবন যাপনকারী মানুষ—সর্বোচ্চ অক্ষয় পরমাত্মনের সঙ্গে এক হয়ে যান। তিনিই সবকিছু হয়ে যান—স সর্বজ্ঞ সর্বো ভবতি। সব কিছুর মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হন—সর্বম এবাবিসন্তি।' মুনডক উপনিষদ বলেছে—সেই পরমাত্মনকে লাভ করবার পর দার্শনিকেরা তাঁদের জ্ঞানে তৃপ্ত হয়ে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে, পূর্ণ প্রশান্তিতে সর্বত্র পরমাত্মন হয়ে, চিরস্থৈর্যে সকল কিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট হন।'

মৃত্যুর পর আধ্যাত্ম সাধনার এই যে পরিণতি, যাকে বলা হয়েছে মোক্ষ, যা থেকে স্বতন্ত্র সত্তায় আর কখনও ফিরে আসা সম্ভব নয়, তা বোধহয় স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার পর্যায়, বা অতিবোধ্য শান্তির পর্যায়। যাজ্ঞবল্ক

মৈত্রেয়ীকে এইভাবে সেই অবস্থার কথা বর্ণনা করেছিলেন, যেমন—'জলে নিক্ষিপ্ত লবণের পিণ্ড যেমন গলে যায়, আর তাকে সংগ্রহ করা যায় না, এবং জলের সর্বত্রই লবণাক্ত হয়ে যায়, তেমনই পরমাত্মাও সেই নিঃশেষ অসীম পূর্ণ জ্ঞানের মধ্যে মিশে যায়। মৃত্যুর পর আর কোন চেতনা থাকে না।'

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনে বললেন, 'মৃত্যুর পর কোন চেতনা থাকে না আপনার এই উক্তি আমাকে বিভ্রান্ত করেছে।'

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'আমি বিভ্রান্তিকর কিছুই বলিনি। এ-কথা অনুধাবনযোগ্য। যেখানে দ্বৈত আছে সেখানে একে অপরকে দেখতে পায়, ঘ্রাণ নিতে পারে, পরস্পর কথা বলতে পারে, একে, অপরকে শুনতে পায়, একে অপরের সম্পর্কে চিন্তা ও ধারণা করতে পারে। কিন্তু যেখানে সব কিছুই পরমাত্মনে মিশে গেছে, কে কাকে দেখবে? কে কার ঘ্রাণ নেবে? কে কার সঙ্গে কথা বলবে? কে কার সম্পর্কে ধারণা বা চিন্তা করবে? কার মাধ্যমে সে তার ধারণা করবে, যাঁর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব দর্শন হয়? কার মাধ্যমে সে সেই ধারণা সৃষ্টিকারীকে ধারণা করবে?'

এই সব উক্তি থেকে এই প্রমাণ হয় যে, পরমাত্মস্বরূপ জ্ঞান হলে ধর্মীয় জীবনযাপনকারী মানুষ বুদ্ধির অগোচর এক অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে। সেখানে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সেই তৃতীয় অবস্থা, পরব্রহ্মণের অবস্থা বা আনন্দময়তার অবস্থা অবাঙমানসগোচরম—যে সম্পর্কে ইতিমধ্যে বহুবার আলোচনা করেছি আমরা। সেই অবস্থা সাধারণত মানুষ যে শূন্যতার অবস্থা বলে কল্পনা করে, তা নয়।

এই অবাঙমানসগোচরমের পাশাপাশি ধর্মীয় আভাব আর একটি অবস্থার কল্পনাও আছে উপনিষদে। যেমন সেখানে সে বুদ্ধির অগম্য অবাঙমানসগোচর পরমাত্মন বা পরব্রহ্মে লীন হয়ে যাচ্ছে না, স্বকীয়তা কিছুটা রেখে অমরত্ব লাভ করেছে, এরকম ধারণাও অবাঙমানসগোচরমের মত বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। বিশেষ করে অদ্বৈত যদি লক্ষ্য হয় তাহলে স্বতন্ত্র সত্তার সঙ্গে তার কোন সহ-অবস্থান সম্ভব নয়। কিন্তু উপনিষদে এ-ধরনের চিন্তাও আছে। যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—'এই সমস্ত লোক অতিক্রম করে—যথাইচ্ছা ভোজ্য ও আকৃতি গ্রহণ করে সে (পরমাত্মা) বসে বসে গান করে।' কিন্তু এই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেও সে ঈশ্বর-প্রতিমতা বোধ করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে এমন বর্ণনা আছে যাতে মনে হয় যে অমরত্ব সম্পর্কে এই ধরনের ধারণা ছিল যে, অমরত্ব হল দেবলোকে উন্নীত হওয়া। মুনডক উপনিষদে ঈশ্বরের সান্নিধ্য হিসেবে এর বর্ণনা আছে। কোথাও বা আছে, যেমন তৈত্তিরীয়তে, ঈশ্বর প্রতিমতা বোধ। এ-থেকে এইটুকু প্রমাণ হয় যে অধ্যাত্মজীবনের সিদ্ধি হিসেবে যে অমৃত লোকের কল্পনা করেছিলেন উপনিষদকারেরা তাতেও নির্বিকল্প পরব্রহ্মণ বা পরমাত্মনই হোক, কিংবা স্বতন্ত্র সত্তা-সাদৃশ্য অমর আত্মনই হোক, কোথাও শূন্যতার কল্পনা নেই। পরমাত্মন বা পরব্রহ্মণ হল আনন্দস্বরূপ। স্বতন্ত্র আত্মার যে অমরত্ব তাতেও আছে স্বেচ্ছাক্রিয়া। সুতরাং মৃত্যু নাস্তিতে ঠেলে দেয় না মানুষকে। অধ্যাত্ম জীবন-যাপন করতে করতে যে মানুষ যথার্থই সত্যের সন্ধান পেয়েছে সে

মুক্ত। সে সেই আনন্দের সঙ্গে লীন।

তবে উপনিষদের অনেক বক্তব্য অস্পষ্ট বলে সেই অনন্ত সত্তা সম্পর্কে নানা মত দেখা দিয়েছে। যেমন বৌদ্ধরা মনে করেন যে মৃত্যুতে ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায় নাস্তিতে। কোন কোন বৈদান্তিকের মতে মৃত্যুতে মানুষের স্বতন্ত্র আত্মা সেই সর্বোচ্চ আত্মার মধ্যে ডুবে যায়। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে সেই অনন্ত সত্তায় ডুবে যাবার অর্থ হল শাশ্বত চিন্তা, প্রেম ও আনন্দের অস্তিত্বে গিয়ে পৌঁছানো। মৃত্যু মানেই ধ্বংস নয়। আর এই অনন্ত সত্তার সঙ্গে মিশে যাবার অর্থ হল জন্ম ও মৃত্যুর বৃত্ত থেকে চিরকালের জন্য অব্যাহতি লাভ—যার নাম মোক্ষ।

কিন্তু এই মোক্ষ বা আনন্দসত্তায় মিশে যেতে পারেন তাঁরাই, যারা পরমাত্মানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এই সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন এসে যায়, যারা পরমাত্মানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন না, তাদের পরিণতি কি?

উপনিষদের মতে পরমাত্মানের স্বরূপ-বোধের জন্য চেষ্টাই হল অধ্যাত্মজীবন। পরমাত্মানের স্বরূপ না জানাটাই হল অজ্ঞতা, পাপ। এ অজ্ঞতা আসে তখনই যখন আমরা আমাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে যথার্থই স্বতন্ত্র বলে ভাবি। আর এই বোধ থেকেই পাপের জন্ম। ভ্রান্তি বলে তাকেই, যাতে 'অহং' সার্বিক সেই সত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকেই চূড়ান্ত বলে চিন্তা করে। দুর্বল দৃষ্টির উৎপাদনই হল পাপ যা থেকে আত্মস্বার্থপর অহংবোধের জন্ম হয়। এবং মানুষ নিজের ব্যক্তিসত্তাকে বলি দিতে রাজি না হয়।

কিন্তু এই অজ্ঞতা অসত্য বলে স্থায়ী হয় না। একদিন না একদিন তাকে সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ণতা লাভ করতেই হবে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ তার সংগ্রাম চলবেই। সুখ-দুঃখের অভিঘাতসম্পন্ন এ জীবনের সংগ্রাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়। এই জন্যই মুণ্ডক উপনিষদ বলেছে—'সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয়।' মিথ্যা যে তৃপ্তিদায়ক নয়, শান্তির কারণ নয়, বর্তমান বস্তুসর্বস্ব দুনিয়ার অশান্তি তা প্রমাণ করছে। মানুষ বস্তুর সম্পদের সবকিছু পেয়েও পরিতৃপ্তি হতে পারছে না।

কঠোপনিষদের মতে 'সত্যের পথ ক্ষুরের মুখের ধারের মত, এর উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া বড় কষ্টকর। কিন্তু এ দুরূহ পথের উপর দিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে সত্যে পৌঁছুতে হবে, কারণ সেখানে পৌঁছনো না পর্যন্ত যাত্রার বিরাম নেই। দুঃখ যন্ত্রনার অভিঘাতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে অহংবোধকে নিঃশেষ করতে পারলে তবেই সেখানে যাওয়া যায়। সুতরাং অজ্ঞতারূপী পাপ বেদনাদায়ক বটে, তবে তা চিরন্তন নরকের মধ্যে ঠেলে দেয় না, যে ধারণা খ্রীষ্টানদের মধ্যে আছে। মুসলমানদের মধ্যেও আছে। সত্যে পৌঁছুবার জন্য বেদনা তো একটু উপলব্ধি করতে হবেই। মিথ্যা হল পাখির ডিমের মত, ভেতরে জীবনের বীজকে লুকিয়ে রাখে। সেই আবরণ ভেদ করে, অর্থাৎ বেদনা-ভেদ করে যখন ডিম থেকে পাখি বেরোয় তখনই সে সত্যসূর্যের আলো দেখতে পায়। এই সত্য বা কল্যাণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ এক জিনিস নয়। সত্য সুখকর নয়। কিন্তু পরিণামে আনন্দময়। সুখ মানুষকে অন্ধকারে আবদ্ধ করে।

সত্যকে পেতে হয় দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়েই। দুঃখই হল সত্যলাভের শর্ত। অজ্ঞানতার পাপবোধ থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য যত বেশী সংগ্রাম, আত্ম (অহং) বলিদান ততই মুক্তির আনন্দ। অধ্যাত্ম জগতে যত লাভ বস্তুজগতে ততই ক্ষতি। এই জন্যই ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেছে যে 'মানুষ যথার্থই বলি বিশেষ। জীবন হল অনিঃশেষ বলিদান যতক্ষণ না সত্যের মধ্যে সে বিলীন হতে পারছে।'

এই সীমার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের জন্য কি ধরনের অধ্যাত্মজীবন প্রয়োজন? আর এই অধ্যাত্মজীবনেরও কি কোন ক্ষমতা আছে যে তা মুক্তির পথে মানুষকে পরিচালিত করতে পারে? এই প্রসঙ্গই উপনিষদকারেরা একটি বড় রকমের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, যার নাম কর্ম। মানুষের মুক্তি বা বন্ধন নির্ভর করে তার কর্মের উপর। যে যেমন কর্ম করবে তেমন ফল লাভ করবে। কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান কর্মের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। ভাল বীজে ভাল ফল হয়, খারাপ বীজে খারাপ। এ হল ঋত্ নিয়ম। ঋগ্বেদে যাকে ঋত হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। কর্মের প্রভাব মানুষের সচেতন মনেই যে থাকে শুধু তা নয়। পৌনপৌনিক কর্মের প্রভাব মানুষের সূক্ষ্ম মনের মধ্যে গিয়ে জমা হতে হতে তার মধ্যে তার অজ্ঞাতেই একটা চরিত্র সৃষ্টি করে। সেই চরিত্র সচেতন মনের অজ্ঞাতে থেকেই মানুষকে তার প্রভাব অনুযায়ী পুনরায় কর্মে প্রবৃত্তি করায়। কোন কর্ম যদি ইন্দ্রিয়সুখ সৃষ্টি করে, তার প্রবণতা মানুষের সূক্ষ্মমানসে স্থায়ী আসন গেড়ে বসতে হয়। এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে সে সেখানে বসে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ বস্তুত তার কর্মেরই ফলভোগী। তার ভাগ্য তার নিজেরই সৃষ্টি। যেমন সৃষ্টি করবে, তেমনই ভোগ করবে। বস্তুত যাগযজ্ঞ করে কর্মফল এড়ানো যায় না।

মানুষের বস্তুদেহের মৃত্যু হলেও তার অভ্যাস সূক্ষ্ম দেহে বাস করে। কর্মফল ভোগের জন্য পুনরায় তাঁকে দেহ ধারণ করতেই হয়। মানুষ প্রত্যেকেই যে যার নিজের নিয়ন্তা। নিজের ইচ্ছাতেই সে পরিচালিত। সেই ইচ্ছা যদি কল্যাণ কামনা না করে, অর্থাৎ নিজের যথার্থ স্থান সম্পর্কে চিন্তা করে মোক্ষ লাভ না করে, তবে তাকে অজ্ঞতার খেসারত হিসাবে সীমার মধ্যে বন্দী থাকতে হবে এবং ইচ্ছা পূরনের জন্য কাজ করতে হবে। ফলে দৈহিক মৃত্যু ঘটলেও যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপের সন্ধান পায়নি, তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে কর্মফল ভোগের জন্য। কিন্তু জীবনের সঙ্গে সহজাত হয়ে আছে সত্যের অনুসন্ধিৎসা কিংবা সত্য হল জীবনের মূল—যতক্ষণ না সেই সত্য বা মূলের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ জন্ম-মৃত্যু বৃত্তের হাত থেকে মুক্তি নেই। কর্মফলের প্রভাব থেকে মুক্তি পেলে তবেই তার দীর্ঘ ক্লান্তিকর অভিযাত্রা শেষ।

কিন্তু কর্মের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কিভাবে? কর্মফল যদি চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে যে একবার খারাপ কাজ করবে, তার আর অব্যাহতি কোথায়? কারণ খারাপ স্বভাবতই কর্মফল হিসাবে আরও খারাপের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে, এবং এইভাবে পাপের হাত থেকে তার মুক্তি নেই। কিন্তু বস্তুত তা হয় না। মানুষ ভুল করলেও, তা শোধরানোর জন্য ভাল করতেও চেষ্টা করে। দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ চেষ্টা দ্বারা সাধুসন্তের মত

ব্যবহার করে। এ থেকেই মনে হয় যে কর্মফলই সব নয়। মানুষের ভিতরকার শাশ্বত সত্য মানুষের কর্মদ্বারা ফলভোগী হয় না। তাই কর্মফলের বাইরে সেই সত্য যখন কিছু আশা করে, তখন মানুষ কর্মফলের বাইরে কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারে। এবং এটা একদিন না একদিন হতেই হবে। কারণ সত্যই প্রকাশমান তাকে আচ্ছন্ন করে রাখবার কোন উপায় নেই।

কর্মফলের দ্বারা আচ্ছন্ন আত্মার মুক্তির উপায় হিসেবে বলা হয়েছে যে, নিষ্কাম কর্মই তাকে মুক্তি দিতে পারে। ফলের আশা না করে যে কর্ম, তা কর্ম হলেও ফলত কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সমাজকল্যাণ ধরনের কাজ তাই কর্মফলের হাত থেকে মুক্তি পাবার প্রকৃষ্ট উপায়। এই যে নিষ্কাম কর্মের প্রেরণা, পাপকর্মফলে আচ্ছন্ন মানুষকে এ-বোধ কে দিতে পারে? নিশ্চয়ই কর্মফল দ্বারা স্পর্শিত নয় এমন কিছু তার মধ্যে আছে? সেই কিছুই হল সত্য। পরমাত্মন। সেই পরমাত্মনের সহজাত ধর্মই হল প্রকাশিত হওয়া। সুতরাং অহংকারের আবরণ কর্মফল হিসেবে তাকে আবদ্ধ রাখতে পারে না। কর্ম এবং তার ফল মানুষের নিম্নবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারে, মানুষের নিম্নবৃত্তি কর্মফলের অধীন। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে অধ্যাত্মতা যা পরমত্মনের আলোর মত তা কর্মফলের দ্বারা স্পর্শিত না হওয়াতে মানুষ কখন অনন্তপাপের মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে পারে না। মানুষের মুক্তি তার অবধারিত পরিণতি। মানুষের ব্যক্তিসত্তা যখন অন্তরতম সেই সত্যের আলোকে নিজের স্বরূপ যথার্থ অনুভব করতে পারবে, তখনই তার সকল পাপ ও কর্মফল ঘুচে যাবে। এবং সে জন্ম-মৃত্যু-বৃত্তের বাইরে পরমাত্মনের মধ্যে অবগাহন করবে। ছান্দোগ্য উপনিষদ তাই বলেছে—যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপ না জেনে, বা সত্য আকাঙ্খা কি না বুঝতে পেরে এ পৃথিবী ত্যাগ করে সর্বত্রই তার জীবন সঙ্কুচিত; কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপ ও যথার্থ আকাঙ্খা সম্পর্কে জানতে পেরে এই পৃথিবী ত্যাগ করে, সর্বলোকেই তার জীবন বাধাবন্ধহীন।

কর্ম মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে এ ধরনের একটা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই উপনিষদে কিন্তু আর একটি চিন্তা এসে গেছে, যে চিন্তা বেদ সংহিতার যুগে তেমন ছিল না। কর্ম তৈরী করে একটা প্রবণতা। সেই প্রবণতা কখনও বস্তুমুখী, কখনও মুক্তিমুখী। যে কর্মের প্রবণতা মানুষকে সত্যের দিকে নিয়ে যায় সত্যস্বরূপ জানতে দেয় তার ভবিষ্যৎ স্পষ্ট। সত্য জানলে মানুষের আর ভবিষ্যৎ নেই, অতীতও স্তব্ধ। এক চির বর্তমান অবস্থার মধ্যে তার স্থিতি। এ অবস্থাই পরমাত্মনের অবস্থা, পরব্রহ্মণের অবস্থা। কিন্তু যে প্রবণতা বস্তুমুখী করে, সে প্রবণতার পরিণতি কোথায়? মানুষের অন্তরতম হল পরমাত্মন। সেখানে একদিন সব কিছুর পরিণতি হবেই। কিন্তু পরমাত্মনের স্বরূপ না জানলে মানুষের ব্যক্তিসত্তা সেই পরিণতি লাভ করবে কি ভাবে? এবং যতক্ষণ সেই পরিণতি তার লাভ না হচ্ছে, মানুষের গতি হবে কি? মানুষ সবাই যে পরমার্থের সাধনা করে, তাতো নয়। অজ্ঞানতার মধ্যই অধিকাংশ ডুবে আছে। তাহলে মৃত্যুই কি তাদের পরিসমাপ্তি হবে? কিন্তু যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পরমাত্মন—অজ্ঞানতার মধ্যে দিয়ে মানুষ সেখানে যাবে

করে? সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে মৃত্যুর পরই সব শেষ হয়ে যায় না— অজ্ঞানতা আচ্ছন্ন করে রাখে আত্মাকে। পরমাত্মানের অনুভূতির জন্য তাকে চেষ্টা করতেই হবে। তাহলে? মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এ দেহ অবসানেও একটা ভবিষ্যৎ জীবন আছে মানুষের। উপনিষদ সেই ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়াপাত ঘটিয়েছে। সেই ভবিষ্যৎ হল, মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত পুনরায় জন্ম নিতেই হবে মানুষকে এবং সেই পরমাত্মানের সাধনা করে নিঃশর্ত হয়ে বিলীন হতে হবে। সুতরাং উপনিষদে এসেছে পুনর্জন্মে বিশ্বাসের ধারা।

পুনর্জন্মবাদ যে উপনিষদের পূর্বে অনুপস্থিত ছিল তা নয়। ব্রহ্মণ গ্রন্থে এ ধারণা আছে। শতপথ ব্রহ্মণ এ ধরনের চিন্তা লক্ষ্য করা যায়। সেখানে আছে যে, যাঁর সত্যজ্ঞান আছে, এবং যিনি দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি মৃত্যুর পর জন্ম নেন অমরত্বলাভের জন্য। কিন্তু যাদের সত্যজ্ঞান নেই, দায়িত্ব পালনও করেনি তারা, বার বার জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুর কবলিত হবার জন্য। কিন্তু ব্রাহ্মনের এই নতুন মৃত্যুহীন জন্ম ও মৃত্যুকবলিত জন্ম সবই হল পরলোকে, ইহজগতে নয়। উপনিষদ কিন্তু পুনর্জন্ম বলতে এ পৃথিবীতেই ফিরে আসার কথা বলেছে। অবশ্য কখনও কখনও শতপথ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের চিন্তা পাশাপাশি মিশে গেছে, যেমন—ভাল ও মন্দ কর্মের ফল হিসেবে আত্মা যতক্ষণ না পরমাত্মন জ্ঞানলাভ করে মুক্তি পাচ্ছে, ততক্ষণ পরলোকে কর্মফল ভোগ করে আবার জন্মগ্রহণ করে। পুণ্যবান স্বর্গে সুখ ভোগ করে, পুণ্যক্ষয়ে আবার আসে পৃথিবীতে, পাপী পাপ ভোগ করে আবার জন্মগ্রহণ করে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—'দেহ ভস্মীভূত হবার পর আত্মা উজ্জ্বল আকারে ঊর্ধলোকে যাত্রা করে।[১] কিন্তু সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে তিনলোক অতিক্রম করে ফিরে আসে নতুন অস্তিত্বে।'

মৃত্যুর পর পরমাত্মনস্বরূপ লাভ না করা পর্যন্ত আছে আত্মার অস্তিত্ব, উপনিষদ এটা স্বীকার করে। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে 'আমি যেন সেই শুভ্র দন্তহীন আগ্রাসী বাসস্থানে না যাই। কঠোপনিষদ স্পষ্টই বলেছে—'শস্যকণার মত মরণহীন মানুষের মৃত্যু হয় এবং শস্যকণার মতই পুনর্জন্ম লাভ করে। মৃত্যুই শেষ নয়। মৃত্যু নতুন জীবনের তোরণ। যারা পরমাত্মনের জ্ঞানলাভ করেন, তাদের কাছে এটা অনন্ত জীবনের তোরণ। মৃত্যু নবজীবনের তোরণ হলেও সেই জীবনের চরিত্র নির্ভর করবে মানুষের কর্মফলের উপর। ছান্দোগ্য উপনিষদেই আছে—'যারা ভাল কাজ করেছেন তাঁরা শীঘ্রই ভাল জন্মলাভ করবেন, যেমন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হবেন। কিন্তু যারা খারাপ কাজ করবেন তারা খারাপ জন্ম লাভ করবেন, যেমন—শূয়র, কুকুর, চণ্ডাল, এই ধরনের।'

কিন্তু এই প্রসঙ্গেই একটা বড় প্রশ্ন জাগে, খারাপ কাজের ফলে যদি পশুজগতে জন্ম হয়, তখন আত্মা পরিচালিত হবে স্বভাব দ্বারা, মনন বা বুদ্ধি দ্বারা নয়। সেইক্ষেত্রে ভাল বলতে যা বোঝায়, তা তাদের পক্ষে করা

১) আত্মা উজ্জ্বল আকারের নয় ধূম্রাকারে আকাশ ভ্রমন করে যোগে এখন দেখা যায়। অতিবানে বিজ্ঞানীরাও এ কথার সন্ধান পেয়েছেন।

সম্ভব নয়। স্বভাবতই কর্মফল হিসাবে সেই পশু জীবনেই তাদের ফিরে যেতে হবে। তাহলে পরমাত্মনের মধ্যে মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? কিংবা আবার সেই পশুদেহে আবদ্ধ আত্মা ক্রমবিকাশের পথে মানব জীবন প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় চেষ্টা করবে তার সত্য-স্বরূপে ফিরে যেতে? আত্মা পদস্খলনের জন্য পশু জীবন প্রাপ্ত হলেও সেই স্বভাব পশুজীবনের মধ্যেই তাকে দেবে অসীমের প্রতি একটা আকৃতি, সেই জন্যই ক্রমবিকাশ। এই ক্রমবিকাশের কথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্বীকার করে। সেই জন্যই ডারউইনের ক্রমবিকাশের কথা। হিন্দুরাও এই ক্রমবিকাশ স্বীকার করে বলেই মানবজীবনের পূর্বে বহুযোনি পার হতে হয়েছে বলে মনে করে। উপনিষদ এক জীবন ও আরেক জীবনের মধ্যে সম্পর্কের সূত্র সচেতন চেতনার মধ্যে খুঁজেনি, খুঁজেছে মূল্য সংরক্ষণের মধ্যে যাকে বিজ্ঞানে বলা হয় conservation of value.

আর্তভাগ যাজ্ঞবল্ককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'দেহের মৃত্যুর পর আত্মা কি বেঁচে থাকে? কারণ মৃত্যুর পর যদি জীবনীশক্তি অগ্নিতে চলে যায়, নিশ্বাস বাতাস, দৃষ্টি সূর্যে, মন চন্দ্রে, শ্রবণ মহাশূন্যে, দেহ মৃত্তিকায়, আত্মা অন্তরীক্ষে, লোমরাজি লতাগুল্মে, কেশ বৃক্ষে এবং রক্ত ও বীর্য জলে, তাহলে মানুষের আর কি থাকে?' এর উত্তরে উভয়েই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, 'সত্যসত্যই ভাল কাজের জন্য কেউ ভাল হন এবং মন্দ কাজের জন্য মন্দ।' অর্থাৎ তারা বলতে চেয়েছিলেন যে, সমস্ত কিছু সৃষ্টির মৌল উপাদানে মিশে গেলেও থেকে যায় তার মানসিক ক্রিয়াজাত প্রবণতা। মৃত্যুকে অতিক্রম করেও তা বেঁচে থাকে।

যাজ্ঞবল্কের আলোচনাতে পশুজীবন সম্পর্কে কোন বক্তব্য নেই। (যদিও পরবর্তীকালে ছান্দোগ্য, কৌশীতকি প্রভৃতি উপনিষদে মানবাত্মার পশুদেহে প্রবেশের কথা উল্লেখ আছে। সম্ভবত এই বিশ্বাস এ-দেশীয় আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকেই আর্যদের মধ্যে এসেছিল—কারণ তারা বিশ্বাস করত যে মানব আত্মা পশুদেহে প্রবেশ করতে পারে। এবং এই থেকেই সমগ্র জীবন সম্পর্কে আর্যদের মনেও একটা শ্রদ্ধাবোধ জাগরিত হয়েছিল।) সুতরাং মানসিক ক্রিয়াজাত কর্মফলের জন্য পশুদেহে মানব আত্মার প্রবেশের কথা তিনি বলেন নি—যে-কথা পরবর্তীকালে ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে।

কর্মফলরূপে মানসিক প্রবণতার সংরক্ষণ জাতীয় ধারণা সম্ভবত বৈদিক ঋষিদের পরলোকে আত্মার পুরস্কার ও শান্তিলাভের ধারণা থেকেই এসেছে। কিন্তু এ-সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করতে গিয়ে জটিলতাও এসেছে উপনিষদকারদের মনে। মৃত্যুর পরে এইজন্য আত্মার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পথের কথা আলোচিত হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আছে এই ধরনের উক্তি—'মানুষের জন্য দুটো পথের কথা আমি শুনেছি—একটি নিয়ে যায় পিতৃলোকে, আর একটি দেবলোকে। দ্যৌ এবং পৃথ্বীর মধ্যবর্তী সকল প্রাণীকেই সেই পথে পরিভ্রমণ করতে হয়।' কর্ম অনুযায়ী এই দুই পথে মৃত্যুর পর আত্মা অগ্রসর হয়। দেবযান, যাকে আর্কিমার্গ বা আলোর পথও বলা হয় সেই পথে আত্মা অগ্নির নানা অধ্যায় পার হয়ে সত্যলোকে গিয়ে পৌঁছয়। আর পিতৃযান বা ধূম্রমার্গ বা অন্ধকারের পথে আত্মা চন্দ্রলোকে গিয়ে পৌছয়। পিতৃযানে যারা যায়, তারা তাদের সৎকর্মের ফল ভোগ শেষে

আবার পৃথিবীতে ফিরে এসে জন্ম নেয়। আত্মার আর একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ আছে যা নাকি নিরানন্দ এক জগতে আত্মাকে নিয়ে যায়। এ জগত পোকামাকড়, পতঙ্গ প্রভৃতির আত্মায় পরিপূর্ণ। অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায় যে, পুণ্যবানেরা অর্থাৎ পরমাত্মন সম্পর্কে জ্ঞানী লোকেরা মৃত্যুর পর আনন্দলোকে চলে যান আর ফেরেন না। সংসারী ব্যক্তি যারা পরমাত্মনের জ্ঞানলাভ করেনি, তারা পিতৃযান থেকে কর্মভোগের পর আবার ফিরে আসে। আর পাপীরা নিরানন্দ অন্ধকার জগতে অর্থাৎ পশুজগতে প্রবেশ করে। অর্থাৎ পশুদেহ প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু পরলোকের এই কল্পনায় উপনিষদকারীদের মধ্যে চিন্তার অনেক প্রভেদ আছে। যেমন—কঠোপনিষদের মতে পরমাত্মন সম্পর্কে ধারণাসম্পন্ন মানুষের মৃত্যুর পর দেবযানে যাবার প্রয়োজন নেই। দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা পরব্রহ্মণত্ব লাভ করেন। বৃহদারণ্যকেও এই ধরনের ধারণা আছে। দেবযানে তাঁরাই যান যারা এই পৃথিবীতে পরমাত্মনের স্বরূপ বোঝেন নি। অথচ যাবা তা বুঝবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এই পথে তাঁরা ক্রমমুক্তি লাভ করেন। এইজন্য একে কর্মমুক্তিও বলে।

মৃত্যুব পর আত্মার নবজন্মের ধারা বোঝানোর জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেছে—'মানুষের জ্ঞান, কর্ম ও প্রাক্তন অভিজ্ঞতা তাকে হাত ধরে নিয়ে যায়। শুঁয়ো পোকা যেমন এক ঘাসেব ডগা থেকে আর এক ঘাসের ডগাতে কিলবিল করে এগিয়ে যায়, তেমনি মানুষ দেহত্যাগ করবার পর নতুন অস্তিত্বের দিকে এগিয়ে চলে।' আরও বলা হয়েছে—'স্বর্ণকার যেমন একখণ্ড স্বর্ণপিণ্ড নিয়ে তাঁকে আর এক রূপ দেয়, আবও গ্রহণযোগ্য রূপ, সেই রকম দেহত্যাগ কববাব পর আত্মা নতুন ও গ্রহণীয় আকৃতি গ্রহণ কবে—যা নাকি এই পৃথিবীর পক্ষে উপযোগী।' 'ভাস্কর যেমন এক মূর্তি থেক মসল্লা নিয়ে খোদাই করে আব এক মূর্তি, নতুন এবং আবও সুন্দর; আত্মাও তেমনই দেহত্যাগের পর এবং অজ্ঞানতা দূর হবার পর, নিজেব জন্য ভিন্ন দেহ তৈরি কবে, আরও নতুন ও সুন্দর, যেমন, পিতৃ, গন্ধর্ব, দেবতা, প্রজাপতি, ব্রহ্মা অথবা অন্যান্য অস্তিত্ব।' কৌশীতকি উপনিষদে আছে—'মৃত্যুর পব আত্মা দেহের জীবনীশক্তি আহরণ করে (সূক্ষ্মদেহে) কর্মফল অনুযায়ী অন্যদেহে চলে যায়। এই সূক্ষ্মদেহের মধ্যে থাকে তার কর্মলব্ধ প্রবণতা। আবার এমন কথাও বৃহদারণ্যকেই আছে, যেমন, এক মহা অস্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়, মৃত্যুর পরে আবার সেখানেই চলে যায়।'

মৃত্যুর পর আত্মার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে উপনিষদকারদের কল্পনা তাঁদের পরমাত্মন বা পরব্রহ্মণ কল্পনার মত সুস্থ নয়। কিন্তু এ-থেকে একটি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আত্মার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এবং তাঁবা বিশ্বাস করতেন যে, দেহেব মৃত্যুর পরও কিছু থেকে যায়। এবং কর্ম সম্পর্কে তাঁদের ধারণাই তাঁদের এ-বিশ্বাসকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিল। যৌন প্রক্রিয়া আত্মা সৃষ্টি করতে পারে না। সেই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র আত্মার জন্য একটি পরিবেশ তৈরী কবে, আত্মা সেই পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করে নতুন জীবন তৈরী করে। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হল এই যে, আত্মাই যদি কর্মফলের জন্য নতুন জীবন নেয়,

তাহলে নিত্য নতুন জীবনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কি করে? তার জবাব এই যে, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই ক্রমবিকাশের পথে চলেছে, তাতে প্রাথমিক স্তরের জীবন যখন উন্নীত হয় আত্ম-সম্পন্ন চেতনার স্তরে, তখন কি তার পক্ষে এসে মানুষের যৌন প্রক্রিয়ায় নতুন অস্তিত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব? আত্মা যতক্ষণ না তা নিজের স্বরূপ অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরব্রহ্মণের স্বরূপ উপলব্ধি করছে, ততক্ষণ তার মুক্তি নেই। ততক্ষণ তার ধ্বংসও নেই। ধ্বংস কোন জিনিসই হয় না, শুধু স্বতন্ত্র অস্তিত্বে হারিয়ে মহাঅস্তিত্বে এক হয়ে যায়। যতক্ষণ আত্মজ্ঞান লাভ করে সেই মহা-অস্তিত্বে সে মিশে যেতে না পারছে তার মৃত্যু নেই। দেহান্তর ঘটতে পারে কিন্তু আত্মার বিলোপ ঘটে না। আত্মার জন্য থাকে পরমাত্মনের অনুভবের প্রয়োজনে ভবিষ্যৎ জীবন–যতক্ষণ না দেশ ও কালের সীমার ঊর্ধ্বে সে যেতে পারছে।

কিন্তু এই যে পরমাত্মনের স্বরূপ তা জানবে কে? মন, বুদ্ধি, বা বুদ্ধির অতীত কোন কিছু? মন বুদ্ধি সবই সীমিত। সীমিতকে দিয়ে অসীমকে জানা যায় না। সে-কথা পূর্বেই বলেছি। তথাপি মন বা বুদ্ধি অর্থহীন নয়, সেই অসীমকে জানবার বড় রকমের সহায়ক তারা। সেইজন্য উপনিষদের সত্যসন্ধানের হাতিয়াররূপে মানুষের মন ও বুদ্ধি বলে যে জিনিষ রয়েছে সে সম্পর্কেও উপনিষদকারদের চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের পরিচিত হবার প্রয়োজন আছে।

উপনিষদ সত্যসন্ধানে দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি সব কিছুরই মূল্যায়ন করেছে। মানুষের ধারণা যে-সকল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হতে পারে তার বিচার করেছে। প্রশ্ন উপনিষদে দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ দেহযন্ত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।, হৃদযন্ত্র, স্নায়ু প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানের সকল মাধ্যমে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানার জন্য দেহ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতেও পরাঙ্মুখ হয়নি। ইন্দ্রিয় বহির্জগত সম্পর্কে ধারণার উল্লেখযোগ্য মাধ্যমে বটে, কিন্তু বিচারের পর দেখা গেছে যে, সেই মাধ্যমগুলো অপর কোন একটা কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে অর্থহীন। যেমন দেহের ইন্দ্রিয় সক্রিয় বটে, তবে তাদের যদি মন পরিচালনা না করে, তাঁদের সকল অনুরণন অর্থহীন। ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রিত মনের দ্বারা। মন যদি অনুভব না করে ইন্দ্রিয়ের কাজ বিনা অনুভূতিতেই থেকে যায়। গভীর অভিনিবেশ সহকারে অর্জুন যখন পাখির চোখ লক্ষ্য করেছিলেন তখন তার ইন্দ্রিয়ের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হারিয়ে গিয়েছিল। মন যদি গভীরভাবে নিবিষ্ট থাকে অন্য কিছুর উপর, তাহলে চোখের উপর দিয়ে দৃশ্য দৃশ্যান্তর চলে গেলেও তা দেখা যায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মন যদি না থাকে ইন্দ্রিয়ের আবেদন অর্থহীন। কিন্তু এই মনও সর্বেসর্বা নয়। মনের ক্রিয়ার মূল্যায়ণ করে বুদ্ধি। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা, ধারণা, অন্তর্দৃষ্টি, সিদ্ধান্ত, কল্পনা, অনুভব, স্মৃতি, ইচ্ছা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, এ-সবই হল বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু বুদ্ধিও সব নয়। প্রাণ, মন, বুদ্ধি, এ সকলের ঊর্ধ্বে হল পরমাত্মন। সকলেরই মূল পরিচালক পরমাত্মন। কিন্তু এই আত্মন কোন সীমিত দেহের মধ্যে আবদ্ধ নয়। সীমিত দেহের মধ্যেও সে আছে বটে, কিন্তু আছে দেহাতীত, কালাতীত, স্থানাতীত হয়ে সার্বিক অস্তিতে।

এই পরমাত্মনের স্বরূপ উপলব্ধি করাই মুক্তিকামী মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে গেলে অনুভূতি ছাড়া অন্য কোন মাধ্যম নেই বটে, তথাপি উপনিষদ বিচার বিশ্লেষণ না করে এই অনুভূতির উপর নির্ভর করেনি। সমগ্র দেহ মন বুদ্ধির প্রচেষ্টা দ্বারা এই অনুভূতিক পরমাত্মনের অনুভবের জন্য তৈরী করে বলেই সেই অনির্বচনীয় অবাঙমানসগোচর অমৃত অস্তিতে জীবন-মরণের বৃত্ত অতিক্রম করতে সমর্থ হয়।

কিন্তু মানুষের মন বা বুদ্ধি তুলনাহীন কোন জিনিসকে অনুধাবন করতে পারে না। অতুলনীয়ের জন্য যে চিরন্তন বোধের উন্মেষ প্রয়োজন তারই নাম পরমাত্মন। কিন্তু সেই পরমাত্মন সম্পর্কে সহস্রবার উক্তি করলেও সে সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয় কি? ধরি ধরি, বুঝি বুঝি করেও স্পষ্ট বোঝা যায় না। বিচার বিশ্লেষণে এটা কখনও হবারও নয়। কিন্তু তার বলে উপনিষদ যে ব্যর্থতা স্বীকার করেছিল তা নয়। এই দেহধারী মানুষ যাতে সীমিত দেহের মধ্যেই তার স্বাদ লাভ করতে পারে, সেজন্য বিচারবিশ্লেষণ বাদ দিয়ে ভিন্ন পন্থার উদ্ভাবন করতেও সে ক্ষান্ত হয় নি।

উপনিষদকারেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইন্দ্রিয় মন বা বুদ্ধি জ্ঞানের মাধ্যমে হলেও চূড়ান্ত জ্ঞানের পথে অন্তরায়। সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভের জন্য তাই প্রয়োজন ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সব কিছুর সক্রিয়তাকে একটি বিশেষ পর্যায়ে এনে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। এই নিষ্ক্রিয় করে দেবার পদ্ধতির নামই হল যোগ। যোগ অর্থই বিযোগ। বহির্জগত থেকে ইন্দ্রিয়সকলকে বিচ্ছিন্ন করে অন্তরের গভীরতম অস্তিত্বের মধ্যে মিশে যাওয়া। অসত্য বিযোগ করে সত্যে যুক্ত হওয়ার নামই যোগ।

যদিও যোগের পূর্ণ বিকাশ উপনিষদে নয়, পরে, তথাপি তার বীজ রোপিত হয়েছিল উপনিষদেই। উপনিষদকারেরা যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, মন দ্বারা তাকে পাওয়া যাবে না, সত্যকে জানা যাবে না, তখনই তারা এই সত্যলাভের জন্য ইন্দ্রিয়নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মুক্তির স্বাদ বুঝতে হলে নিজেদের মুক্ত হতে হবে। সেই মুক্ত হবার পথনির্দেশই হল যোগ। ইন্দ্রিয়জ্ঞান থাকলে মুক্ত হওয়া যায় না। যোগ সেই ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখিতাকে নিষ্ক্রিয় করে দেবার উপায়। উপনিষদ জানতো যে, ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকলে মুক্তি সম্ভব নয়। তাইতো কঠোপনিষদে আছে এমনতর বর্ণনা—'পর্বতপৃষ্ঠে বৃষ্টির জল পড়লে তা যেমন নিচে চতুর্দিকে গড়িয়ে পড়ে, তেমনি যে ব্যক্তি বিভিন্ন গুণের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করে, চতুর্দিকে সে সেই গুণের পিছনেই ধাবমান হয়। নির্মল জলবিন্দু নির্মল জলে পড়লে যেমন জলই থেকে যায় তেমনি যিনি জানেন (পরমাত্মনের স্বরূপ) তার আত্মা পরমাত্মাই থেকে যায়।'

কঠোপনিষদ পরমাত্মনের মধ্যে আত্মার প্রবেশের জন্য যে পথ নির্দেশ করেছে তা এই রকম—'সত্যসন্ধানীকে অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হতে হবে। বাক্যকে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে অনুভবে, অনুভবকে চিন্তাতে, চিন্তাকে সার্বিক চেতনায়। এইভাবে এগুলেই আমরা অনন্তের গভীর প্রশান্তি সম্পর্কে সচেতন হতে পারব।' এই উপনিষদেই আরো বলা হয়েছে—'যখন জ্ঞানের পাঁচটি উপাদান মনের সঙ্গে হবে স্থির, বুদ্ধিবৃত্তি নিষ্ক্রিয়, একমাত্র তখনই আমরা

সর্বোত্তম পর্যায়ে যেতে পারব।' কৌশীতকি উপনিষদে প্রতরদনের কথা আছে যিনি সাম্য ধ্যান নামে এক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন। যাকে আন্তর বলে বলা হয়, অর্থাৎ অন্তরম অগ্নিহোত্রম। প্রতরদনের উপদেশ হল—ব্যক্তিকে তার ইন্দ্রিয় ও আবেগের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে হবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এমন উপদেশ আছে, যাতে নির্মন্থিত করে সম্মোহ লাভ করা যায়। অর্থাৎ যোগের জন্য যে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, ন্যাস, প্রাণায়াম, আসন ইত্যাদি। এই সব পূর্ণমাত্রায় না হলেও উপনিষদ-এর যুগেই এ সম্পর্কে চিন্তা এবং প্রাথমিক অনুশীলন আরম্ভ হয়েছিল।

অতীন্দ্রিয় লোকের অনুভব লাভের জন্য যোগের যে এক অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা আছে একথা আজ প্রত্যেককেই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই যোগ পদ্ধতি কার? উপনিষদ যোগের সূচনা করলেও শেষ পর্যন্ত মনঃসংযোগকেই সেই অনির্বচনীয় সত্তার স্বরূপ লাভের জন্য বেশী মূল্য দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই অতীন্দ্রিয়ের সর্বাপেক্ষা বড় মাধ্যমেই হয়েছে যোগ। এই যোগ আর্যরা ভারতে আসবার পর দীর্ঘদিন অনুসৃত হয়নি। সম্ভবত দেহের ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে অতীন্দ্রিয়ের স্বাদলাভের এ খবর তাঁদের কাছে অজ্ঞাতই ছিল। সেই খবরের সন্ধান তাঁরা পান ভারতবর্ষে এসে অনার্যদের কাছ থেকে। অবিশ্বাস ও অজ্ঞতাবশত অনার্য অধ্যাত্ম-সাধনাকে তাঁরা প্রথম দিকে গ্রহণ করেন নি, কিন্তু পরে যখন মূল্য অনুধাবন করতে পেরেছেন তখনই তা গ্রহণ করে নিজের অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করেছেন। আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বেই হরপ্পা মহেন-জো-দড়োতে গড়ে ওঠা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া নানাভঙ্গীর যোগাসন বিশিষ্ট মূর্তি (যা আমরা আমাদের আলোচনার প্রথমেই দেখেছি।) এ কথাই প্রমাণ করে যে, দেহের মধ্যেই দেহাতীতের স্বাদলাভের চাবিকাঠি ছিল অনার্যদেরই হাতে। আর্য দার্শনিক চিন্তা সেই সোনার চাবি দিয়ে দুর্গমের দরজা খুলে দিয়ে কঠিনকে করেছে সহজ। এই ভারতবর্ষের জল হাওয়া মাটিতে আছে অতীন্দ্রিয়ের চিরন্তনী প্রকাশ। তাই আর্য অনার্য কিছু নেই। এই সনাতন ধর্মের দেশে যেই অধিবাসী হোক না কেন—সত্যের সন্ধান একদিন তার লাভ হবেই। আর্য-অনার্য এখানে তৈরী করেছে হিন্দু সংস্কৃতি। সমগ্র মানবজাতির সংমিশ্রণে এখানেই তৈরী হবে সত্যিকারের ধর্ম। মহান আত্মনের অপরূপ অভিলাষ এখানে পরব্রহ্মণের ব্যাপ্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেই সীমার মুক্তি এবং অসীমের অস্তি। এখানেই অনন্ত ঈশ্বর সন্ধান ও ঈশ্বর হওয়া। আত্মনের প্রাণস্পন্দনে সীমিত হওয়া থেকেই এখানে তার মুক্তির সাধনা,—ঐতিহাসিক কালেরও বহু পূর্ব থেকে। হরপ্পা মহেন-জো-দড়োতে পাওয়া গেছে যে মুক্তি সাধনার নিদর্শন তা আর্য-সাধনায় আরও উন্নত হয়ে আজো এগিয়ে চলেছে অসীম হওয়ার প্রয়াসে। এ প্রয়াস চিরকালের, শাশ্বত, চিরন্তন। অনন্ত এক সত্যার্থি ক্রমশ তাঁর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে। যেটুকু ঘটেছে, তা হয়ে আছে ইতিহাস, যেটুকু ঘটেনি, তাও রচনা করবে ইতিহাস। এ অনন্তের শেষ নেই। আমাদের এ আলোচনা তাতে বিন্দুর চাইতেও ক্ষুদ্র। আরো রয়েছে সমুদ্র সদৃশ ; সামনে অনন্ত।

